অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার

কেসবুক

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার
কেসবুক

সম্পাদনা
মার্ক লি হান্টার

অনুবাদ
ইরাজ আহমেদ

অনুবাদ পর্যালোচনা
শিবব্রত বর্মন

:Fojo
Linnaeus University

MRDI

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা কর্তৃক ২০১২ সালে প্রকাশিত
৭, প্লেস দু ফন্তেনোয়া ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স

ইউনেসকো ২০১২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

978-984-35-4823-8

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

প্রথম অধ্যায় ১৫
নথিবদ্ধ হলেও বিস্মৃত নয়

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫
আমাদের পায়ের নিচে মাটি:
সামাজিক ঘটনা অনুসন্ধান

তৃতীয় অধ্যায় ৬৩
পৃথিবীকে কি বাঁচানো সম্ভব?
পরিবেশ অনুসন্ধান

চতুর্থ অধ্যায় ৮৭
দায়িত্বে কে?
সুশাসনের সংকট অনুসন্ধান

পঞ্চম অধ্যায় ১১১
বিশ্বায়নের স্থানীয় অবয়ব

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৩৭
অর্থের গতিপথ অনুসন্ধান:
প্রতারণা ও অফশোর ফান্ড

সপ্তম অধ্যায় ১৬১
পাচারকারী এবং নিপীড়কের দল

অষ্টম অধ্যায় ১৮৫
পাতানো খেলা:
খেলা নিয়ে অনুসন্ধান

নবম অধ্যায় ২০১
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ভূমিকা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করলেও অনুসন্ধানের নেপথ্যে প্রতিবেদকের যে অক্লান্ত শ্রম আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লুকিয়ে থাকে, তা খুব একটা জানা হয়ে ওঠে না। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পেছনের গল্পটা হয়তো আরও রোমাঞ্চকর; কিন্তু তা পড়ে থাকে প্রতিবেদকের স্মৃতি আর ডায়েরির পাতায়। অনুসন্ধান চারদিকে আলো ছড়ালেও এসব অজানা গল্প পড়ে থাকে প্রদীপের নিচে অন্ধকার হয়ে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কেসবুক এমন একটি প্রকাশনা, যার পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে বিশ্বসেরা কিছু অনুসন্ধানের পেছনে থাকা অজানা গল্প, আছে অনুসন্ধান পরিকল্পনা ও কৌশলের কথা।

মার্ক লি হান্টার সম্পাদিত এই বইয়ে স্থান পেয়েছে আমেরিকা-কানাডা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কথা। আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা কীভাবে অনুসন্ধান করেছেন চরম প্রতিকূল পরিবেশে, সেসবের বর্ণনা উঠে এসেছে। মানব পাচার অনুসন্ধানে কখনো সাংবাদিক নিজেই পাচার হয়ে পাড়ি দিয়েছেন আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমি। কখনো নারী পাচারকারীদের পেছনে ছুটেছেন মিথ্যা বিয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনে। আমেরিকায় শিক্ষার নামে অনিয়ম-দুর্নীতি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি জানা গেছে জর্দানে দুর্নীতি অনিয়মের কারণে কেমন করে নির্যাতন-বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন নারীরা। নদী সুরক্ষার নামে সরকারি অর্থ অপচয় করে কীভাবে ভারতে প্রধান নদ-নদীগুলো পরিণত হয় আবর্জনার ভাগাড়ে, কোন ক্ষমতায় জাত রক্ষার নামে গণপিটুনি, হত্যা ও ধর্ষণের নির্দেশ দেয় উত্তর ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ফিলিপাইনে দরিদ্র মানুষের প্রাণরক্ষার ওষুধ কীভাবে চলে যায় রাজনীতিকদের হাতের মুঠোয়– এমন সব অনুসন্ধানের গল্প আছে এই বইয়ে। রাজনীতি-অর্থনীতি থেকে পরিবেশ-জলবায়ু বা অর্থ পাচার থেকে অবৈধ অভিবাসন, স্বাস্থ্য খাত থেকে আধুনিক দাসপ্রথা অথবা আফ্রিকার সাজানো দুর্ভিক্ষ; এমনকি ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতি কীভাবে আফ্রিকার ফুটবল ধ্বংস করছে– অনুসন্ধানের এমন অজানা গল্পগুলোই তুলে আনা হয়েছে।

কখনো প্রতিবেদকের নিজের ভাষ্যে অনুসন্ধানের লোমহর্ষ কাহিনি, কখনো সম্পাদকের মুখে প্রতিবেদনের মূলকথা আবার কখনো পত্রিকার পাতায় কোনো অনুসন্ধানের পর্যালোচনা থেকে জানতে পারবেন প্রতিবেদনের আড়ালে লুকোনো গল্প। প্রতিটি গল্পের শেষে পরিশিষ্ট থেকে জানা যায় অনুসন্ধানে কী পরিকল্পনা, কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন সেরা সাংবাদিকেরা। কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, গোপনে নোট রেখেছেন, কীভাবে ক্যামেরা লুকিয়ে ছবি তুলে এনেছেন, সেসবের বর্ণনা আছে এখানে। প্রতিবেদক নিজেই জানিয়েছেন, বড় বড় অনুসন্ধানে তথ্যের উৎস এবং অর্থায়ন হয় কীভাবে, কীভাবে এক দেশের সাংবাদিক যৌথভাবে কাজ করে অন্য দেশের সাংবাদিকের সঙ্গে। সহজে গল্পকথায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শিখতে চাইলে বইটি নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়ে উঠবে। কেবল সাংবাদিকদের কাছেই নয়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা যে কত রোমাঞ্চকর হতে পারে, তা জানতে সব শ্রেণির পাঠকের কাছেই এই বই সুখপাঠ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কেসবুক ইউনেসকোর সাংবাদিকতা-বিষয়ক সিরিজের একটি প্রকাশনা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ম্যানুয়াল স্টোরি-বেজড এনকোয়ারির বাংলা অনুবাদ স্টোরিনির্ভর অনুসন্ধান প্রকাশের পর বইটি পাঠকনন্দিত হওয়ায় একই সিরিজের প্রকাশনাটি অনুবাদের উদ্যোগ নেয় এমআরডিআই ও ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট। আশা করি বইটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিকাশে কিছুটা হলেও অবদান রাখবে। ইউনেসকোর এই জনপ্রিয় প্রকাশনা ওপেন অ্যাক্সেস নীতি অনুসরণ করে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ইরাজ আহমেদ। অনুবাদের পর পাণ্ডুলিপিটি পর্যালোচনা করেছেন শিবব্রত বর্মন। দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। অনুবাদে সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ পার্থ প্রতিম দাসকে। মূল বই গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কেসবুক-এর কপিরাইট ইউনেসকোর। তবে এর বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনার দায়দায়িত্ব এমআরডিআইয়ের।

বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কেসবুক প্রকাশনা বিষয়ে কয়েকটি কথা

ইয়ানিস কার্কলিন্স
যোগাযোগ ও তথ্যবিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক, ইউনেসকো

গণতন্ত্রে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে পারে গণমাধ্যম। আর এই কারণে পৃথিবীজুড়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভিত শক্তিশালী করার যেকোনো উদ্যোগকে ইউনেসকো সমর্থন জানায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো ক্ষমতাসীন কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অজান্তে সত্য ঘটনা আর পরিস্থিতির আড়ালে লুকিয়ে ফেলা বিষয়কে উন্মোচন করা ও চোখের আড়ালে চলে যাওয়া সব তথ্য এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা। এভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথ্যের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

২০০৯ সালে ইউনেসকো কর্তৃক প্রকাশিত 'স্টোরি বেইজড এনকোয়ারি: আ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' বইটি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও রুশ ফেডারেশনে সাংবাদিকতাবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে গৃহীত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমরা সানন্দে পেশ করছি 'বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কেসবুক'।

এই কেসবুক ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থনা করা হয়েছে, যাতে এটি প্রশিক্ষণের পরিপূরক উপকরণের খোরাক হয়ে ওঠে। আমরা আশা করি, এই বই বিশ্বব্যাপী প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় উৎকৃষ্ট চর্চা এবং নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এই বইয়ে বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলের ২০টির বেশি সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন স্থান পেয়েছে। এগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র, যার মধ্যে ইউনেসকোর বিশেষ আগ্রহের বিষয়গুলোও আছে, যেমন তথ্যের স্বাধীনতা, সুশাসন, সামাজিক ও আইনি বিষয়, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও জেন্ডার। প্রতিবেদনগুলো তৈরি করতে সাংবাদিকেরা কীভাবে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন, সেসব ব্যাখ্যাও সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সাংবাদিকদের অনেকে গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। তাদের প্রতিবেদনগুলো এ নেটওয়ার্কে বিকশিত অত্যাধুনিক কৌশল এবং উচ্চ মানের সাক্ষ্য বহন করছে।

মার্ক লি হান্টার এবং অন্য যারা এই গ্রন্থ রচনায় অবদান রেখেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি, তাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালকে সমৃদ্ধ করেছে, যা সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী, সাংবাদিকতার প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকদের শেখার সুযোগ তৈরি করবে। এই ম্যানুয়াল ইউনেসকোর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

আজকের পৃথিবীতে 'কমিউনিকেশন ইকোসিস্টেমের' বিস্তার লাভের এই সময়ে মানুষের কল্যাণে সাংবাদিকতাকে আরও বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে হবে। এই আলোকে বইটিতে সন্নিবেশিত বিশ্বাসযোগ্য নানা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আগামী বছরগুলোতে পেশাদার সাংবাদিকতার গুরুত্ব বিষয়ে মানুষের অব্যাহত উপলব্ধি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

ভূমিকা
বইটি কেন লেখা এবং কীভাবে ব্যবহার করবেন

মার্ক লি হান্টার

১. কেন-এর চেয়ে কীভাবে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ

আমি যখন ফ্রসে দু প্রেসে ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকতার স্নাতকোত্তর ক্লাসে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নিয়ে আসি, দেখেছি শিক্ষার্থীরা শিশুর মতো আচরণ করে। তারা সেই সব অদ্ভুত হিরোকে দেখে বিস্মিত হয়, যারা গোপন সব তথ্য ফাঁস করেছেন এবং জীবনে অনেক শত্রু তৈরি করেছেন। শিক্ষার্থীরা একটি প্রশ্নই বারবার করে, 'আপনারা এ রকম কাজ করতে ভয় পাননি?' শেষে আমি তাদের বলি, *এদের দেখে এত মুগ্ধ হওয়া বন্ধ করো। কারণ, এতে করে তারা পরোক্ষভাবে নিজেরাই নিজেদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, তাদের মতো আমরা হতে পারব না। সাংবাদিকেরা দুঃসাহসী কাজ কেন করেছেন, এই প্রশ্ন না করে বরং কীভাবে করেছেন, এই প্রশ্নটা করো। তাতে এ রকম সাহসিকতার কাজ তুমিও করতে সক্ষম হবে।*

একদিক থেকে দেখলে কাজটা আমি ঠিক করি না : অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় কেন কথাটা এত স্বতঃসিদ্ধ গণ্য করা যায় না। আমি মানুষকে বলি, আমরা কাজটা করি পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে, পাশাপাশি নিজেদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটাতে। কিন্তু পৃথিবী যেভাবে চলা উচিত বলে আমরা প্রমাণ করতে চাই, পৃথিবী সেভাবে চলে না সব সময়। সে চলে তার নিজের নিয়মেই। এ রকম অবস্থায় আমরা ভরসা রাখতে পারি এই ভেবে যে, আমরা কী ছিলাম, আমরা কী করেছি, আমরা কীভাবে বেঁচেছি এবং মৃত্যুবরণ করেছি, সেগুলোর একটা যথাযথ বিবরণী রেখে যেতে চাই। আমরা মানুষকে বলতে পারি, যে স্টোরি বলা হচ্ছে তাতে কারা ছিল, আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, এ রকম ঘটেছিল, তা সব সময় যে সঠিক ও ন্যায্য, তা না হলেও বলতে পারি। একবার এক ব্যক্তিকে এ কথাই বলেছিলাম, যার কথা আমি লিখছিলাম বিস্তারিতভাবে, তাকে আরও বলেছিলামঃ আমার প্রতিবেদন প্রমাণ করবে, আপনি সঠিক ছিলেন, কিন্তু তাতেও আপনার জীবনের সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না। তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে?' সেই ব্যক্তি জীবনে আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তবু অন্তত কাউকে পাশে পেয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন। পরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে আমাদের দুজনকে বিস্মিত করে তিনি তার চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন। তবে এ রকম ঘটনাই যে ঘটবে সব সময়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি না। এটা আপনারাও পারবেন না। কেবল একটা প্রতিজ্ঞাই করতে পারবেন, স্টোরিটা আপনারা বলবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এটুকুই কি যথেষ্ট? হয়তো না। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস না করেন একটি সত্য স্টোরি প্রকাশ করাটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে আপনার জীবনে অন্য কিছু করা উচিত। হয় আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, স্টোরি প্রকাশ করাটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা কাজটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি আপনি বিশ্বাস না করেন, কারও কথাই যথার্থ মনে হবে না। বইটি এ ধরনের সত্য স্টোরি বলার জন্যই আপনাকে সাহায্য করবে।

২. বইটি কীভাবে কাজে লাগাবেন

সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের এক কর্মশালায় পড়াতে গিয়ে প্রথম এই সংকলনের ভাবনা মাথায় আসে। ইউনেসকোর সহায়তায় ২০০৯ সালে প্রকাশিত 'স্টোরি বেইজড এনকোয়ারি: আ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' বইটি থেকে পাঠদান করার সময় অংশগ্রহণকারীদের মনে নতুন ভাবনার উদয় হয়: সঠিকভাবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেখার জন্য একটি আদর্শ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন কেমন হয়, তা তাদের জানা প্রয়োজন। আমি তাদের জন্য সঙ্গে করে কয়েকটি নমুনা নিয়ে গিয়েছিলাম; সেগুলোর বেশির ভাগ ছিল নিজের এবং একটি ফরাসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে আমার ছাত্রদের তৈরি করা। সেই লেখাগুলো অবশ্যই সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। (যেহেতু প্রশিক্ষকদের মেধাস্বত্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।) কিন্তু শিক্ষার্থীরা সেটুকুতে সন্তুষ্ট ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা জানতে চাইছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকেরা কীভাবে কাজ করছেন। তারাও কি তথ্য সংগ্রহে একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে সেসব সমস্যার সমাধান করছেন কীভাবে? তাদের কাজে কি জনগণ সাড়া দিচ্ছেন, নাকি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে? অংশগ্রহণকারীরা আরও জানতে চায়, বিশ্বের অন্য সাংবাদিকেরা কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যকে স্টোরিতে পরিণত করেন?

এই বই তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে এবং বিশ্বের প্রত্যেক রিপোর্টারের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে যে তারাও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নবজাগরণে অবদান রাখতে সক্ষম। বিষয়টা একটা আন্দোলনের মতো এবং যারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা করেন, তারা এতে যোগ দিতে পারবেন। (তবে অনেক চর্চাকারী আছেন যারা নিজস্ব পথ অনুসরণ করতে চান। অবশ্যই তারা সেটা করতে পারেন।) এই আন্দোলনের অংশীদারেরা এই বইয়ের কাজে বড় অবদান রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন নিয়ে আমি বিশদ বলব।

এই সংকলন তৈরি করার ক্ষেত্রে উপাদান সংগ্রহের জন্য 'গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক (জিআইজেএন) কে গুরুত্ব দিয়েছি। আমি নিজেও এই সংস্থার একজন গর্বিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তথ্য সংগ্রহ এবং স্টোরি বলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো আমার মনে হয়েছে সেরা। আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, এই সংকলনের রিপোর্টারদের নিজ নিজ ধারণা তৈরির পদ্ধতি, গবেষণা, উপকরণ গোছানো এবং স্টোরি গঠনের কৌশল অর্থাৎ অনুসন্ধানমূলক কাজের মূল ভিত্তিগুলো তুলে ধরতে উৎসাহিত করা। আপনি যদি না জানেন কী খুঁজছেন, তাহলে সেটা আপনি খুঁজে পাবেন না। (যেমনটা ফ্রান্সের এডউই প্লেনেল বলেছেন।) আপনি যদি না জানেন কোথায় এবং কীভাবে সন্ধান করতে হবে, তাহলে ধারণা সঠিক থাকার পরেও আপনি বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন না। আপনি যদি সংগৃহীত উপাত্ত যথাযথভাবে গোছাতে না পারেন, তাহলে সেগুলোর সামান্যই আপনি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। মনে রাখতে হবে, একটি ভালো স্টোরি উপস্থাপন করতে না পারলে পুরো আয়োজনটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

কাজ করার জন্য আমরা প্রথমে প্রিন্ট মিডিয়াকে বেছে নিই। এই মাধ্যমে কাজ করার সুবিধা বেশি; একটা কলম আর নোটবই হলেই কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। আর আপনি যদি প্রিন্ট মিডিয়ায় ভালো স্টোরি লিখতে পারেন, তাহলে ভিডিও মাধ্যম বা বেতারের জন্য ভালো লেখার সম্ভাবনা বাড়বে।

জিআইজেএন এবং সাংবাদিকতা-বিষয়ক অন্যান্য সংগঠনের কাছ থেকে এ-সংক্রান্ত লেখা যখন চাইলাম, তখন গবেষণা এবং লেখার কৌশলকে সমন্বিত করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে 'স্টোরি বেইজড এনকোয়ারি' প্রধান আন্তর্জাতিক ম্যানুয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম এবং ভালো লাগল যে, যারা কাজ পাঠালেন, তাদের কেউ কেউ জানালেন, তারা স্টোরি বেইজড এনকোয়ারি বইটি ব্যবহার করছেন। তবে এই সংকলন এটাও প্রমাণ করে যে, এর বাইরে আরও পদ্ধতির অস্তিত্ব রয়েছে, যেগুলোর এখনো নাম দেওয়া হয়নি। এই বইয়ে অবদান রাখা সব ব্যক্তিই একটু আগে আলোচনা করা সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের সমাধান খুঁজে বের করতে হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে একজন পেশাদার অনুসন্ধানী রিপোর্টার একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পরবর্তী কয়েক দশকেও কোনো পদ্ধতি অনুসরণের চর্চা সাংবাদিকদের মধ্যে খুব বেশি ছিল না। সময় বদলেছে। বর্তমান প্রজন্মের অনুসন্ধানী রিপোর্টাররা এখন তাদের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের হাতে পরিকল্পিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় তুলে দিতে পারছেন।

এই বইয়ের প্রতিটি নিবন্ধের পরিশিষ্টে সেই জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে। (আমার ভুল হতে পারে, তবু মনে হয় পেশাদারি দক্ষতা তুলে ধরা এমন পরিপূর্ণ অনুসন্ধানী রিপোর্টের অন্য কোনো সংকলন আমার চোখে পড়েনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সংকলনগ্রন্থে অবদান রাখা অনেককে চিনি বহুদিন ধরে। কিন্তু তারা এত ভালো কাজ কীভাবে করলেন– ভেবে বিস্মিত হই।)

এই বইয়ে অবদান রাখা সাংবাদিকদের মধ্যে অনেককে তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরেকটু বিশদভাবে বোঝানোর জন্য আমি একটি প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিলাম। এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, সেই প্রশ্নপত্রের কিছু অংশ আমি আমেরিকার 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটরস (আইআরই)' সংগঠনের বার্ষিক পুরস্কারের আবেদন ফরমে প্রতিযোগীদের কাছে পাঠানো প্রশ্ন থেকে নিয়ে ব্যবহার করেছি। তবে আইআরই-এর পক্ষ থেকে করা হয়নি এমন কিছু প্রশ্নও আমি এই বইয়ে অবদান রাখা ব্যক্তিদের করেছিলাম। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, তারা কীভাবে তাদের তথ্যগুলোকে সংগঠিত করেন এবং কীভাবে লেখেন।

সাংবাদিকতা বিষয়ে আমি বহু শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেছি। তাদের মধ্যে আমি এমন একজনকেও পাইনি, যিনি নিজে থেকে কোনো একটি সফল অনুসন্ধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আমি এমন অনেককেই পেয়েছি, যারা প্রাপ্ত ডেটা বা উপাত্তের যথাযথ ব্যবহার করে একটি ভালো স্টোরি লিখতে পারেননি। পেশায় নতুনেরা মনে করেন, কোনো গোপন বিষয় খুঁজে বের করাই হচ্ছে অনুসন্ধানের শেষ কথা, বাকিটা এমনি এমনি হয়ে যায়। আর পেশাদারদের কাছে মূল কাজটা হচ্ছে, সংগৃহীত মালমসলার যথাযথ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে কাজটা সফলভাবে শেষ করা। এই বইয়ে পেশাদার সাংবাদিকেরা আপনাদের জানাবেন, তারা কীভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছেন।

বইটিতে সংকলিত সব কটি প্রতিবেদনের শুরুতে আমি একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছি। সেখানে আমার চোখে রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি সংকলিত করার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে গবেষণা পদ্ধতি এবং লেখার কৌশলের বিভিন্ন ধরন তুলে ধরে এমন স্টোরিকেই আমি এখানে রাখার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন খাতে অনুসন্ধান। স্টোরি বাছাই বা সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে দেখেছি, ব্যক্তিগত বা দলগত উদ্যোগে একই বিষয় নিয়ে একাধিক স্টোরি করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মানব পাচার বিষয়ের কথা।

তবে বিষয় এক হলেও সমস্যার বিভিন্ন দিক সেখানে উঠে এসেছে। আবার দেখা গেছে, স্টোরি করার ক্ষেত্রে কেউ কেউ একই কৌশল, যেমন আর্কাইভ তথ্য, ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কাজে। কেউ শেষে এসে রিপোর্টের যবনিকা টানতে একধরনের নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। আমি এই কাকতালীয় বিষয়টা কাজে লাগিয়েছি এটা দেখানোর জন্য যে, একই বিষয়ে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে পন্থা বিভিন্ন হতে পারে।

আমি কিছু কিছু প্রতিবেদনের ব্যাকরণ সংশোধন করেছি। ইংরেজি একটি বৈশ্বিক ভাষা হলেও সব জায়গায় তা একইভাবে ব্যবহৃত হবে এমন কোনো কথা নেই। লেখায় এমন অনেক উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার ছিল, যা আমি বুঝতে না পেরে কিছুটা পরিবর্তন করেছি। আরেকটি সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত আমি এখানে অনুসরণ করেছি, তা হচ্ছে প্রতিবেদক যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বাদ দেওয়া। এ কাজ আমি সেই সংশ্লিষ্ট নামগুলোর ক্ষেত্রে করেছি, যারা প্রতিবেদনটি যে দেশে প্রকাশিত হয়েছে, শুধু সেখানেই বসবাস করেন এবং যাদের নাম নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা যায়নি অথবা তারা যে ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত, তা এক বছরের বেশি সময় আগে ঘটেছিল। আমি মনে করি যে ভুল কেউ সংশোধন করার চেষ্টা করেছে, সেই ভুলের জন্য তার বারবার শাস্তি হওয়া উচিত নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ওয়েবসাইট থেকে একজন ফরাসি উগ্র ডানপন্থী কর্মীর নাম সরিয়ে ফেলেছি, যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আমাকে জানিয়েছেন, তার জীবনের গতিপথ তিনি কতটা পাল্টে ফেলেছেন। আমি এই সংকলনেও কয়েকজন ব্যক্তি এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে একই বদান্যতা দেখাতে চেয়েছি। একইভাবে রিপোর্ট থেকে আমি ফোন নম্বরও সরিয়ে ফেলেছি। কারণ, সেই নম্বরগুলোর মালিকানা বদল হতে পারে; হয়তো একজন নিরপরাধ মানুষ কোনো অপরাধীর ফোন নম্বরটি এখন ব্যবহার করছেন!

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় শৈল্পিক কৌশলের ব্যবহার থাকা উচিত, নাকি সেটি করা হলে তা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আরও সস্তা এবং একধরনের বিনোদনে পরিণত করবে– এই প্রশ্ন নিয়ে অনুশীলনকারী এবং বুদ্ধিজীবী মহলে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। আমি বহুদিন ধরে মনে করি, স্টোরি বলার ক্ষেত্রে শৈল্পিক কৌশল ব্যবহারের বিষয়টা পেশায় মনোযোগী সাংবাদিকেরা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেন না। পরিবর্তে তারা এই কৌশলকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে পারেন। আমি মনে করি, মানসম্পন্ন লেখার জন্য টম উলফের 'দ্য নিউ জার্নালিজম' সংকলনটি প্রতিবেদন রচনার ইতিহাসে সেরা কাজ।

উলফের বইটিকে একটি মাপকাঠি ভাবার কারণ আছে। ষাট ও সত্তরের দশকে সাংবাদিকতায় নিউ জার্নালিজম ও ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম উৎকৃষ্ট লিখনশৈলী হিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির যুগে এই দুটি লিখনশৈলী পুনরুজ্জীবিত হলেও এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুবই কম। এই দুটি শৈলী বা কৌশল যমজ সন্তানের মতো হলেও তাদের নিজেদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল এবং খুব সপ্রতিভ প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো এই দুই ধারা একে অপরের কাছ থেকে কৌশল ধার করত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিউ জার্নালিজম ওই সময়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর্দা উন্মোচন করা সেই বিখ্যাত প্রতিবেদক কার্ল বার্নস্টেইনও এর বাইরে ছিলেন না, যিনি নারী লেখক জেসিকা মিটফোর্ডের ভক্ত ছিলেন। এখানে একটি বিষয়

পরিষ্কারভাবে বলা যায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদকেরা ফিচার লেখকদেরও বাধ্য করেছিলেন লেখার বিষয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানে যেতে। সত্তরের দশকে আমেরিকায় সফল ফিচার লেখকদের প্রায় সবাই লেখার ক্ষেত্রে এই দুটি শৈলী ব্যবহার করতেন। তখন দুটি পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ছিল বাজারে এবং এই কৌশল ব্যবহার করে তাদের খ্যাতি বেড়েছিল। এই প্রবণতার ঢেউ দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রায় তিন দশক পরেও নিউ জার্নালিজমের প্রভাব দেখা যায় ডেক্লান হিল, স্টিফেন গ্রে আর পেত্রা বার্তোশেভিজের মতো অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কাজে। তারা সবাই এই সংকলনে লিখেছেন।

তবে শুধু এ ধরনের স্টোরি এই সংকলনে জায়গা দিতে গিয়ে দৈনন্দিন খবর লেখার কাঠামো অবলম্বন করা কাজগুলো বাদ পড়ে যায়। (উলফের সংকলনে কম শক্তিশালী স্টোরিগুলো এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করে লেখা।) অ্যান্ড্রু জেনিংসের স্টোরিটাও বাদ দিতে পারতাম, যার ক্রীড়াবিষয়ক কাজ এতটাই আলাদা যে তা স্বতন্ত্র একটি ধারা তৈরি করেছে। জেনিংস ভয়ানক এবং ভয়ানক কৌতুকময়। কিন্তু গ্লসি ম্যাগাজিনের আভিজাত্য তার অপছন্দ। তার চোখে আভিজাত্য হচ্ছে দুর্নীতির গায়ে সেঁটে রাখা মুখোশমাত্র।

এ ধরনের ব্যতিক্রমগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি বিশেষত্বেরই বহিঃপ্রকাশ, যা সার্বিকভাবে ফিচার লেখা এবং বিশেষভাবে 'নিউ জার্নালিজম' থেকে এটিকে আলাদা করে রেখেছে। এখানে মূল পার্থক্যটা নন্দনতত্ত্বে নয়, বরং রিপোর্ট লেখার পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যে। নিউ জার্নালিজমের মূল কথাই হচ্ছে নিবিড় পর্যবেক্ষণ। একজন রিপোর্টার যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন, তাকে সে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং নতুন তথ্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট সময় অবস্থান করতে হবে। ষাটের দশকে ফিচার লেখার ক্ষেত্রে এটাই মৌলিক একটি কাঠামো হলেও তা উলফের প্রদর্শিত পদ্ধতির মতো মৌলিক ছিল না। তবে দ্বিতীয় আরেকটি সত্যিকার উদ্ভাবনী উপাদান ছিল এতে; যেমন, কোনো বিষয়ে একজন প্রতিবেদকের ব্যাখ্যা এবং প্রতিক্রিয়াকেও উৎস-উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা। হান্টার এস থমসনের কাজে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়: কোনো প্রতিবেদনে অন্য কারও আকর্ষণীয় উক্তি ব্যবহারের চেয়ে তিনি নিজেই উক্তি করে তা প্রতিবেদনে ব্যবহার করতেন। এতে করে কখনো কোনো অলীক কল্পনাও উক্তির আকারে সংবাদের উৎস-উপাদান হয়ে যায়।

তবে তখনই বিপত্তি ঘটে যখন প্রতিবেদকের সংবেদনশীলতা উৎস-উপাদানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো প্রতিবেদকের অহংবোধ থেকে এ রকমটা ঘটতে পারে। আবার কখনো প্রতিবেদক কোনো স্টোরি এবং তার সঙ্গে যুক্ত বেদনায় এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি চিৎকার করতে থাকেন এবং তাতে করে ফ্রেমের পেছনের কান্নার আওয়াজগুলো ঢাকা পড়ে যায়। তবে কারণ যা-ই হোক না কেন, এ ধরনের আবেগ একটি অনুসন্ধানী স্টোরিকে হত্যা করে। বেশির ভাগ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মুখ্য বিষয় হচ্ছে অন্য মানুষের দুঃখ-বেদনার কাহিনি। সেখানে পাঠক, দর্শক আর কষ্ট ভোগকারী ব্যক্তির মাঝখানে নিজের সংবেদনশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে লেখক নিজেই নিজের চতুরতার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন অথবা নিজেকে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল দেখাতে চাইছেন। যেকোনো অনুসন্ধানে প্রতিবেদক বিষয়ের চেয়ে সব সময় কম গুরুত্ব বহন করবেন এবং বিষয়টাকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবেন। এর ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে, বিষয়টাই অনুসন্ধানের যোগ্য নয়।

অনুসন্ধানের মূল বিষয় পর্যবেক্ষণ নয়, বলা যায় একধরনের আগ্রাসন। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক অনুমান করে নেন যতই ধৈর্যসহকারে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হোক না কেন, অনুসন্ধানের বিষয়টি কখনোই নিজে থেকে প্রকাশিত হবে না। বিষয়ের উন্মোচন ঘটাতে হবে এর বহিরঙ্গ দখল করে এবং কার্যকরভাবে এর অন্তরালের সব তথ্য লুণ্ঠন করে। পাশাপাশি বিষয়ের গভীরে থাকা মূল্যবান তথ্যসম্ভারের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। বেশির ভাগ সংগঠনের যেকোনো অপকর্মের সাক্ষ্য বহন করে তার নথিপত্র। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হচ্ছে সেই নথিপত্র হাত করা।

এমনও ঘটতে পারে, সাবজেক্ট ভুলে তার নিশানা ছড়িয়ে রেখে গেছে, আর তার ফেলে যাওয়া নিশানা ধরে আপনি হয়তো পৌঁছে গেছেন সেখানে। হতে পারে সাবজেক্টের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো ব্যক্তি হয়তো অপেক্ষা করছেন একজন ভালো শ্রোতার জন্য, যিনি এসে বিষয়টা শুনবেন এবং সাবজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখবেন। (বিষয়টা *এরিন ব্রকোভিচ* সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের মতো এবং এটি বাস্তব একটি বিষয়। প্রত্যেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে জীবনে এ রকম ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। এখানে ভাগ্যের কিছু নেই। কারণ, তথ্যের উৎস আপনাকে যতটা না খুঁজছে, আপনি তার চেয়ে বেশি খুঁজছেন তাকে।) হয়তো কোনো সাবজেক্ট কারও চোখে এত উদ্ধত আর বিপজ্জনক যে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য রেখে যায়। এ রকম অজস্র পরিস্থিতি থাকতে পারে, তবে সবই নির্ভর করছে একটি বিষয়ের ওপর: বেশির ভাগ গোপন বিষয় গোপন থাকার কারণ কেউ জোরদারভাবে তা অনুসন্ধান করেনি, অথবা কেউ সেটা শুনতেই চায়নি।

উলফ যে সংকটটা দেখতে পান, তা হচ্ছে তথ্য বা সংবাদের উৎসের সঙ্গে নতুন সাংবাদিকেরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন। তবে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের অবশ্য এই সমস্যা নেই। তথ্যের জন্য সোর্স বা উৎসের কাজের ক্ষেত্র, পরিবেশ এবং তার মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করার চেষ্টা কোনো বন্ধুসুলভ কাজ নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হয় তার সাবজেক্টকে ভয় পান, অথবা সাবজেক্টকে সন্ত্রস্ত

করে তোলেন। দুপক্ষই ভয়ের পৃথক পৃথক বহিঃপ্রকাশ ঘটান, আর সেটা করুণা ও অনুশোচনা থেকে শুরু করে প্রবল শত্রুতা পর্যন্ত। টম উলফের মতো একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক যদি আপনাকে এসে প্রশ্ন করেন, 'বিষয়টা কী বলুন তো', আপনার মনে হয়তো আত্মপ্রসাদ জাগবে, কিন্তু অচেনা কেউ যদি আপনার কাছে এসে এযাবৎকাল গোপন থাকা সব তথ্য বা নথিপত্র আচমকা দেখিয়ে আপনাকে বলেন, 'এগুলোই তো ঘটেছে, তাই না?' তাহলে তা মোটেই আর আমোদের বিষয় থাকে না। অনুসন্ধানী সাংবাদিক সাধারণত এটাই করে থাকেন।

এই দু ধরনের সাংবাদিকতার লক্ষ্যের ভিন্নতাকে সহজে তুলে ধরা যায়। উলফ এবং তার সহকর্মীরা চান দুনিয়াটাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে, আরেকজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক চান দুনিয়াটার আচার-আচরণ বদলে দিতে।

'নিউ জার্নালিজম' আর অনুসন্ধানী রিপোর্টিং– এই দুয়ের মধ্যেই মেধাবী উপাদান আছে। কাজে নামার আগে আপনি জানতে পারেন না কোন উপাদান আপনার মাঝে কতটুকু আছে। ফ্রসে দু প্রেসে ইনস্টিটিউটে ১২ বছর ধরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান করার সময় আমি লক্ষ করেছি, প্রতিবছরই একজন ছাত্র পাওয়া যায় যে চমৎকার এক প্রতিভা। অবশিষ্টদের পাঁচজনে একজন যথেষ্ট মেধাবী। ওই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন আমি পাই, যারা চেষ্টা করলে কাজটা যথাযথভাবে করতে পারেন আর এদের মধ্যে একজন থাকেন, যিনি বিষয়টাই বুঝতে অক্ষম। কখনো ওই একজনকে বোঝাতে না পারাটা আমারই অক্ষমতা। কিন্তু কখনো শিক্ষার্থীরাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের মেধার জায়গাটাকে নিজের মধ্যে বিকশিত হতে দিতে চান না।

তবে আপনার ভেতরে যত প্রতিভাই থাকুক না কেন, এ কাজে আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন না যদি কাজটাকে ভালোবাসতে না পারেন। যদি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে ভালোবাসতে না পারেন, তাহলেও একজন ভালো সাংবাদিক হয়ে ওঠার অন্য পন্থা রয়েছে। আপনি সাংবাদিকতার অন্য শাখায়ও কাজ করতে পারেন। আর আপনি যদি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে ভালোবাসেন, তাহলে লক্ষ করে দেখবেন, এই সংকলনে যারা অবদান রেখেছেন, তারা প্রত্যেকে এমন এক একটি এলাকাকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে তারা কাজ করতে আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ। ধরা যাক, আপনি নথিপত্রের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পছন্দ করেন না। এ রকম কাজ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তাহলে এমন কাউকে সঙ্গী করে নিন যে বা যারা এই কাজটা করতে পারবেন। তাহলে পাশাপাশি আপনার পছন্দের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন।

৩. আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

আমি নিজে দীর্ঘকাল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকে কাজ করছি। কিন্তু তারপরেও এই সংকলনের কাজ করতে গিয়ে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, এখনো স্বাধীন প্রতিবেদকেরা অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন। (আমি অবশ্য 'স্বাধীন' শব্দটার চেয়ে 'ফ্রিল্যান্স' শব্দটা ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী। কারণ, এই শব্দের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভাড়াটে সৈনিকদের গন্ধ লেগে আছে। আর আমি মনে করি না যে, একজন স্বাধীন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক শুধু টাকার জন্য কাজ করেন।) মিডিয়া শিল্পের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাওয়ার ফলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুশীলনকারীদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরেও এই সংকলনে যারা অবদান রেখেছেন, তারা তাদের কাজ করে চলেছেন। তারা এবং *হারপারস* বা *লো মদের* মতো একরোখা কিছু ফরাসি কাগজ কখনোই আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয়। এই ঘরানার কাজ করতে আসা প্রতিবেদকেরা অর্থ আয়ের দিকে খুব একটা মনোযোগী হন না। অন্যান্য কাজ যেমন পড়ানো বা নিয়মিত পত্রিকার অ্যাসাইনমেন্ট করে তারা রোজগারের পথ খোলা রাখেন। তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক প্রতিবেদক শুধুই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কাজ করেন। তবে কখনো অনুসন্ধানের কাজটা করা কখনোই না করার চেয়ে ভালো। (বহু বেতনভুক প্রতিবেদক এই কাজ করেন না।)

আমার নিজের উপলব্ধি হচ্ছে, এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য বড় ধরনের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াটা কঠিন। (তবে *মায়ামি হেরাল্ড*-এর মতো দু-একটি ব্যতিক্রমী কাগজ তো আছেই।) বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করার সমস্যার প্রধান একটি কারণ হচ্ছে, তারা একান্ত এবং সর্বব্যাপিতার টানাপোড়েনের মধ্যে এখনো রফা করতে পারেনি। একান্ত বা এক্সক্লুসিভ হলে প্রতিবেদনের মূল্য বাড়ে। আর সর্বব্যাপী হলে এই সংযুক্ত দুনিয়ায় একটা খবরের মূল্য তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিবেদনের কার্যকারিতা এবং পাঠকের কাছে সেটার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় সেটাকে নিজেদের মালিকানায় রেখে দিতে চায়। তারা রিপোর্টটি কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোনো চ্যানেলে প্রকাশ করতে দিতে চায় না।

২০০১ সালে কোপেনহেগেনে 'গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক'-এর প্রথম বৈঠকের পর আরেকটি মডেল আকার পেতে শুরু করেছে। এই নেটওয়ার্ক না থাকলে আমার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হতো না। এই মডেল যে এখনো সচলভাবে টিকে আছে, তা-ই নয়, ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর।

যে সময়ে 'গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক' যাত্রা শুরু করে, তা প্রতিবেদকদের জন্য অনুকূল ছিল না। তখন সংবাদপত্রশিল্পে পুঁজি প্রত্যাহারের সময় চলছে। চাকরি হারাচ্ছেন রিপোর্টাররা, সংবাদ সংগ্রহের বাজেটেও চলছে কাটছাঁট। 'ওইসিডি'ভুক্ত ৩৮টি দেশে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছিল। সংবাদমাধ্যমে মালিকানার আগ্রাসন আরও সংহত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে। (বিশেষভাবে বলা যায়, খবর বা প্রতিবেদন আটকে দেওয়ার বিষয়টার সঙ্গে মালিকদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে।) সাধারণ মানুষের একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, কমসংখ্যক মানুষ এখন সংবাদপত্র কেনে অথবা খবর দেখে এবং এরাই জরিপকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বলে যে, সংবাদমাধ্যম সত্য কথা বলছে না। ৯/১১ এর ঘটনা ঘটার পর আমেরিকা ও তার বন্ধুদেশগুলোর সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর বিপুল চাপ এসেছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অভিনন্দিত করার জন্য। কিন্তু সেই যুদ্ধ সঠিক ছিল কি না, যুদ্ধের কারণটা সঠিক ছিল কি না অথবা ন্যায্য পন্থায় যুদ্ধ লড়া হচ্ছে কি না– এসব প্রশ্ন কোথাও উত্থাপনই করা হয়নি। ২০০৫ সালে অ্যামস্টারডামে জিআইজেএন-এর তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় এসব নিয়ে রিপোর্টারদের বিষণ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই হতাশা ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে আবার আত্মবিশ্বাস জায়গা করে নিয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে পূর্ব ইউরোপের কিছু তরুণ সাংবাদিকের সাহস, উদ্যম আর পেশাদারি মনোভাবের জন্য। তাদের মধ্যে রয়েছেন রোমানিয়ার সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের স্তেফান ক্যান্ডিয়া ও পল ক্রিস্টিয়ান রাদু অথবা বুলগেরিয়ার আলেক্সেনিয়া দিমিত্রোভা। উপাত্তনির্ভর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ডেনমার্কের নিলস মুলভাড ও তার সহকর্মীদের কাজও এই পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। যেমন করেছে হল্যান্ডের হ্যাংক ফন এস ও তার সহকর্মী এবং লন্ডনে নবগঠিত সংগঠন সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের একদল তরুণ সাংবাদিক। নাইট ফাউন্ডেশন এবং ওপেন সোসাইটি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতারাও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ ধরনের কাজের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আম্মানে আরব রিপোর্টার্স ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ও বলকান অঞ্চলে অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের নাম। এদের পাশাপাশি ডেনমার্কের স্কুপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটি এবং সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম তাদের লক্ষ্য এবং কৌশল পুনরায় বিশ্লেষণ করা এবং নিজেদের উদ্দেশ্য আবার ঝালিয়ে নেওয়ার কাজ করছে।

অন্যান্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জিআইজেএন অনুঘটকের কাজ করছে। এই সংস্থার সদস্যরা স্টোরি বিবৃত করা, গবেষণা এবং সহযোগিতাকে সম্প্রসারণ করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির নব কৌশলের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের এই কাজের মাধ্যমে দুর্নীতি বিষয়ে আন্তর্দেশীয় অনুসন্ধানে যুগান্তকারী ফল পাওয়া গেছে। জিআইজেএন সদস্যরাই ছিলেন উইকিলিকসের প্রথম দর্শক এবং সমর্থক। মূলধারার গণমাধ্যমের সঙ্গে তাদের যৌথ উদ্যোগ ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী।

অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও অন্যান্য সামাজিক শক্তি; বিশেষ করে এনজিও সংস্থার মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি গত কয়েক বছরে একটি আকার পেতে শুরু করেছে। এখানে দৃষ্টান্তমূলক বিষয়টির নাম হচ্ছে ট্রাফিগুরার ঘটনা। এখানে তেলশিল্পের একজন দুর্নীতিবাজের কর্মকাণ্ড শনাক্ত এবং উন্মোচন করে গ্রিনপিসের সঙ্গে হল্যান্ড, নরওয়ে ও ইংল্যান্ডের একটি সাংবাদিক মোর্চা। (এই স্টোরি গঠনবিন্যাস ও প্রভাবিত করার সক্ষমতার দিক থেকে একটি পাঠ্যবই অথবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণাপত্রের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে বলে আমার ধারণা। আমার বিবেচনায় এই স্টোরি অনুধাবনের জন্য আরও বেশি জায়গা প্রয়োজন।) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য এখন পর্যন্ত লেখা সেরা তাত্ত্বিক বই *দ্য জার্নালিজম অব আউটরেজ* (১৯৯১)-এ জটিল বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। বইতে বলা হয়েছে, একজন বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদকের জন্য জনগণের ক্ষোভ অথবা সমর্থক জোটের বাইরে অবস্থান করা সম্ভব নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা ও তাদের মিত্রদের প্রয়োজন পড়ার আগেই এখন এই জোটগুলো গঠন করা হচ্ছে। এই উদ্ভাবন অনেক আগে থেকে দরকারের খাতায় জরুরি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত সংবাদপত্রশিল্প বড় ধরনের সংকটে আছে। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ওয়াটারগেট যুগের পর আরও উদ্যমী অবস্থানে পৌঁছায়নি, এ কথা বলা যাবে না। এই ঘরানার সাংবাদিকতার বিস্তারের পেছনে এর সম্প্রসারিত ক্ষেত্র ও কৌশল ভূমিকা পালন করেছে। এই বইয়ে সেই উপাদানগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

এই সংকলন আরও কিছু অসমাপ্ত বনিয়াদি কাজকে চিহ্নিত করেছে, যেগুলো করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে যে কাজটি, তা হচ্ছে অনুবাদ। আমি নিজেও আগে এই প্রয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। (আমি একা নই, এই অনুবাদকাজের অভাবের

দিকটি নানা প্রসঙ্গে উঠে আসছিল এবং সংকলনে যারা অবদান রেখেছেন, তারাও এ বিষয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।) বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান না থাকায় অনুবাদকাজে সক্ষমতার অভাবে কিছু কিছু বিষয়ের ভেতরে আমি প্রবেশই করতে পারিনি। কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অনুবাদ করা লেখায় আমাকে গুরুতর পুনর্লিখনের কাজটি করতে হয়েছে। এ ধরনের সমস্যার সমাধানে বড় ধরনের সংগঠনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। ডেনমার্কের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম সাপোর্ট ফাউন্ডেশন, স্কুপ খুব কমসংখ্যক সংগঠনের একটি; যারা এই সমস্যা নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। তারা তাদের নেটওয়ার্কের সেরা কাজগুলোর প্রথম শ্রেণির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিকে আরও কার্যকর করতে এ ধরনের সংগঠনের সপ্রতিভ অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কোনো নির্দিষ্ট স্টোরি এবং মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এখনকার চেয়ে অনেক বড় আকৃতির পাঠক বা দর্শক থাকা উচিত। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে কীভাবে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়টা মিডিয়া শিল্পের না জানা থাকার মানে কিন্তু এই নয় যে, মাধ্যমটি সহজাতভাবে অলাভজনক ও নীরস। সাধারণ মানুষ যদি একবার জানতে পারে, ভালো স্টোরি কোথায় এবং কীভাবে মিলবে, তাহলেই স্টোরি আকর্ষণীয় ও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সংবাদের খরা মৌসুমে খবরের কাঁচামালসহ আমাদের সোর্স বা সূত্র তৈরি করতে হবে। (এ ধরনের সূত্র নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে এনজিও খাতে। আমি এখানে ব্যবহারের জন্য এনজিও খাত থেকে কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু সেগুলো এখানে ব্যবহার করার উপযোগী করে লিখিত না থাকায় ব্যবহার করা যায়নি। সাংবাদিকদের এ ধরনের বিষয় নিয়ে রিপোর্ট আরও বেশি লেখা উচিত।)

আমি কয়েকজন মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা এই প্রকল্পের বাইরেও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। জন ফ্লিন্ট পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং পরিমার্জনার ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছেন। *রিডার্স ডাইজেস্ট* পত্রিকায় কাজ করার সময় তিনি আমার সম্পাদক ছিলেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। প্রথমত, সব তথ্য জানার আগেই একটি স্টোরি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, স্টোরিটি আমি যা ভাবছি, তার অর্ধেক শব্দে বলা সম্ভব। আন্তন হারবার আমাকে কিছু চমৎকার আফ্রিকান রিপোর্ট কোথায় পাওয়া যাবে, সেগুলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। লুক সেঙ্গার্স এই সংকলনের জন্য আমাকে ইমানুয়েল মায়াহ'র *টিয়ার্স অব আফ্রিকান মাইগ্রেন্টস* বইটির সন্ধান দিয়েছিলেন এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণাকাজে সহায়তা করেছেন। ' ফ্রসে দু প্রেসে' ইনস্টিটিউটে আমার সাবেক এক সহযাত্রী সেসিল ফ্লেশোঁ সংকলনের পুরো কাজ তার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে গুছিয়ে দিয়েছেন। সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের মার্ক শাপিরো, স্কুপ-এর হেনরিখ কাফহোলজ, এআরআইজে-এর রানা সেবাগ, ইউরোপিয়ান ফান্ড ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম-এর ব্রিগিট আলফটার, ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস-এর ডেভিড কাপলান, গেভিন ম্যাকফেইডেন, পল রাদু এবং ড্রু সুলিভান ভালো স্টোরির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার কঠিন কাজটা করে দিয়েছেন। সোফি জুলিয়ান জিআইজেএন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে থেকেই আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনিও এই প্রকল্পে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আইএনএসইএডি ইনোভেশন সেন্টারের যেসব সহকর্মী আমাকে কাজে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম লুক এন. ফন ওয়াসেনহোভ আমাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সক্ষমতা তৈরির বিষয়টাকে তারা বিবেচনা করছেন একটি ভালো উদ্যোগ হিসেবে। গণমাধ্যমের পাল্টে যাওয়া অবয়ব এবং পাশাপাশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিকে কীভাবে একটি কার্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, সে পরিকল্পনা তৈরিতে লুক আমাকে সহায়তা করেছেন। আমার এবং ইউনেসকোর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই অ্যান বারকাটকে 'স্টোরি বেইজড এনকোয়ারি' তে তার উদ্ভাবিত স্পষ্ট ভাষাশৈলী আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংকলনকে সফল করতে এর বড় ভূমিকা রয়েছে। সব শেষে বলা যায়, এই প্রকল্প ইউনেসকোর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন অ্যান্ড মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট শাখার জিয়ানহং হুর সহায়তা ছাড়া আলোর মুখ দেখত না। আমি মনে করি, সংকলনের সফলতা আরও স্বচ্ছ ও সত্যনির্ভর পৃথিবী বিনির্মাণে তাকে এবং তার সহকর্মীদের সহায়তা করবে। আশা করি, এই সংকলন আপনাকে আপনার ভালোবাসার জগতে বাঁচতে এবং অন্য কারও জীবনকে ইতিবাচকভাবে পাল্টে দিতে সাহায্য করবে।

মার্ক লি হান্টার
জুলাই ২০১২

নথিবদ্ধ

১

প্রথম অধ্যায়

নথিবদ্ধ কিন্তু বিস্মৃত নয়

গরম খবর বা স্কুপ তৈরিতে আর্কাইভের ব্যবহার:
লাইব্রেরিতে বসে, লাইব্রেরির মাধ্যমে এবং লাইব্রেরি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের কৌশল

১.
ক্ষিপ্ত শ্বেতাঙ্গ: রন পলের গোঁড়ামিপূর্ণ অতীত জীবন

জেমস কার্চিক

ভূমিকা

অনেক প্রতিবেদক মনে করেন, কোনো তথ্য লাইব্রেরিতে থাকলেই তা পুরোনো হয়ে যায়। এটি ভুল ধারণা। মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রন পলের নিউজলেটার নিয়ে জেমস কার্চিকের বিবরণ এমন তোলপাড় তুলেছে, যা বাগানের ঝকঝকে একটি পাথরখণ্ডকে উল্টে দিয়ে নিচে কিলবিল করা পোকামাকড়কে উন্মোচন করে দিয়েছে। সেই গড়বড়ে অজানা জীবনের গল্প ছিল এমন এক গরম খবর, যার সন্ধান তার প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মীরা তখনো পাননি। রিপোর্টের লক্ষ্য যে ব্যক্তি, তার মিত্রদের চিহ্নিত করলে ভুলভাবে মনে হতে পারে, এটি সঙ্গ দোষে সাধিত অপকর্ম। তবে এ ক্ষেত্রে কাজটা যৌক্তিক। কারণ, সঙ্গীসাথীরাও এ ক্ষেত্রে একই অপকর্মে শামিল ছিলেন। লেখনশৈলীর বিচারে কার্চিকের দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলো ছিল কোনো চরমপন্থী লেখা পাঠ করার মতোই উত্তেজনাপূর্ণ, যা অপ্রতিরোধ্য বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়ার অনুভূতি দেয়। যেসব প্রতিবেদক চরমপন্থীদের নিয়ে গবেষণা করেন, এসব লেখার লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, সাক্ষাতের সময় এবং সাক্ষাতের পরে তারা আর্কাইভভিত্তিক গবেষণায় ভালো ফল পাবেন।

নিউ রিপাবলিক (ইউএস) থেকে
৮ জানুয়ারি, ২০০৮

আপনি যদি বুশ প্রশাসনের একজন সমালোচক হয়ে থাকেন, তাহলে গত ছয় মাসে রন পলের কোনো না কোনো মন্তব্য আপনার কাছে যে আবেদন তৈরি করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। পল নিজেকে উদারপন্থী হিসেবেই চিহ্নিত করতে পছন্দ করেন। কিন্তু এ বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থিতার প্রচারের সূচনা হলে তিনি মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন উভয় শিবির থেকে অনুদান ও প্রশংসা– দুই-ই কুড়িয়েছেন। যুদ্ধবিরোধী রক্ষণশীল মহল, অসন্তুষ্ট কেন্দ্রবাদী এবং উদারনৈতিক তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরা– সবাই তার পেছনে জড়ো হয়েছিলেন। তারা সবাই পলের প্রশংসা করে বলেছিলেন, তার মাঝে আমেরিকার পুরোনো দিনের রাজনীতিকদের বৈশিষ্ট্য আছে। তখন রাজনীতিকেরা এতটা ভোঁতা-মুখ ছিলেন না এবং আমেরিকার সরকারও তখন দেশের ভেতরে ও বাইরে এত উচ্চাভিলাষী ছিল না। নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের রক্ষণশীল লেখক ক্রিস্টোফার ক্যালডওয়েল লিখেছেন, 'পল সাংবিধানিক নীতির ক্ষেত্রে খুবই সুদৃঢ়।' *দ্য নেশন* পত্রিকা তার ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরোধিতা করা নিয়ে লিখেছে। সাবেক টিএনআর সম্পাদক এন্ড্রু সুলিভান পলকে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি (জিওপি) মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করেন, এবিসি টেলিভিশনের জ্যাক ট্যাপার তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে প্রকৃত স্পষ্টভাষী প্রার্থী বলে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি অভিজাত ব্যাংকারদের কাগজ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, যাকে পল তেমন পছন্দ করেন না, তারাও রিপাবলিকান দলের অন্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের কাছে পলের জন্য সমর্থন চেয়েছেন। বেশির ভাগ ভোটার নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে তার নামও শোনেননি। কিন্তু পল এক দশক ধরে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘ সময় ধরে পলের যুদ্ধবিরোধী নীতি যথেষ্ট প্রশংসিত।

ব্লগের যুগ শুরু হওয়ার আগে নিউজলেটার মাধ্যমটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মহলের আলাপ-আলোচনায় বড় জায়গা দখল করে ছিল। মূলধারার রাজনৈতিক ম্যাগাজিনগুলো তাদের নিজস্ব মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় কট্টর রক্ষণশীলেরা আশ্রয় নেন নিউজলেটারে। এই মাধ্যমগুলো বেশির ভাগ সময় আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং খাতে ষড়যন্ত্র, বিশ্ব সরকার গঠনে ত্রিপক্ষীয় কমিশন পরিকল্পনা আর আসন্ন আর্মাগেডন

বা বিশ্বের শেষ যুদ্ধ বিষয়ে অসংলগ্ন ও সন্দেহপূর্ণ লেখালেখিতে ভর্তি ছিল। তবে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। তাদের পাঠকও ছিল মনোযোগী এবং বিস্তৃত। আর এই তালিকায় রন পলের নাম ছিল প্রথমেই।

পলের নিউজলেটারগুলো ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হতো। যেমন রন পল ফ্রিডম রিপোর্ট, রন পল পলিটিক্যাল রিপোর্ট, রন পল সারভাইভাল রিপোর্ট। ১৯৭৮ সাল থেকেই এই লেখাগুলো প্রতি মাসে একটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। (ব্যক্তিগত জীবনে পল নারী ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং পেশায় ছিলেন আমেরিকার বিমানবাহিনীর শল্যচিকিৎসক। তিনি কংগ্রেসম্যান নির্বাচিত হন ১৯৭৬ সালে।) কিছু সময়ের জন্য পলের নিউজলেটারগুলো 'রেশনাল ইকোনমিকস অ্যান্ড এডুকেশন' নামে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৭৬ সালে পল এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে নিউজলেটারগুলো প্রকাশ পেতে থাকে 'রন পল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' নামে অধুনালুপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। রন পলের প্রচার মুখপাত্রের মাধ্যমে জানা যায়, পল এই প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র একটি অংশের মালিক ছিলেন।

১৯৮৪ সালে 'ফ্রিডম রিপোর্ট'-এর পাঠকসংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। তখন একপর্যায়ে রন পল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস 'রন পল ইনভেস্টমেন্ট লেটার' নামে একটি মাসিক প্রকাশনার কাজ শুরু করে। ফ্রিডম রিপোর্টের আর্কাইভে পুরোনো সংখ্যা দেখার সুযোগ ছিল ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু আমি এই নিউজলেটারের আরও পুরোনো সংখ্যা দেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। ১৯৯৬ সালে একটি বিতর্কিত লেখার বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল। চার্লস 'লেফটি' মরিস নামে একজন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী পলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি পলের নিউজলেটারে প্রকাশিত একটি লেখার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে মন্তব্য করা হয়েছিল, "মতামত জরিপে বারবার দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ বিচক্ষণ রাজনৈতিক মতামত ধারণ করে।" আরও উদ্ধৃত করা হয়, "আপনি যদি কোনো কিশোর কৃষ্ণাঙ্গ ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন, তাহলে তো জানেনই তারা কত দ্রুত অকুস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম। আর এদেরকেই সুরক্ষা দেন অর্ধশিক্ষিতের আদর্শ দৃষ্টান্ত বারবারা জর্ডান। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ এবং একজন নারী বলে সব সমালোচনা থেকে রক্ষা পেয়ে যান।" তখন পলের প্রচার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, মরিস নিউজলেটারকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। পরে, ২০০১ সালে পল দাবি করেন, বিতর্কিত লেখাটি অন্য কেউ লিখেছেন। (কিছু নিউজলেটারে প্রকৃত লেখকের নাম থাকত না।) গত বছর টাইমস ম্যাগাজিনে ক্যালডওয়েল লেখেন, পলের ব্যাখ্যা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। তার মতে, "লেখার শৈলীও পলের নিজস্ব ধরনের মতো নয়।"

১৯৯৯ সালের আগের নিউজলেটার খুঁজে বের করাটা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমি কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় ও উইসকনসিন হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটির গ্রন্থাগারে পুরোনো নিউজলেটারের সন্ধান পেয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষে সেখানে লেখকের নিজ নামে ছাপানো লেখা এত কম ছিল যে বুঝে ওঠা মুশকিল কোন নির্দিষ্ট লেখাটি পলের! নিউজলেটারের প্রথম দিকের কিছু সংখ্যায় পলের স্বাক্ষর থাকলেও পরের বিপুলসংখ্যক সংস্করণে অনেক লেখাই চোখে পড়েছে, যেখানে লেখককের নাম বাই লাইন ব্যবহার করা হয়নি। তবে জটিল দিকটা হচ্ছে, নাম ছাড়া অনেক লেখাই লেখা হয়েছে উত্তম পুরুষে; যা পাঠ করলে সেগুলো পলের নিজের লেখা বলেই ধারণা জন্মায়।

কিন্তু লেখাগুলো যারাই লিখে থাকুক না কেন, নিউজলেটারে সব লেখাই ছাপা হয়েছে পলের নামের ব্যানারের নিচে। (একটি বিশেষ সংখ্যা নিউজলেটারে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা গেছে, একটি লেখায় অন্য এক লেখকের নাম ছাপা হয়েছে।) আর তাতে করে মনে হয়, লেখাগুলো পলের লেখা এবং তার মতামতই সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

পুরোনো নথি ঘেঁটে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ষড়যন্ত্র নিয়ে অতিমাত্রায় মেতে থাকা, ডানপন্থী মিলিশিয়া আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা, কৃষ্ণাঙ্গ, ইহুদি আর সমকামীদের বিরুদ্ধে অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত ধ্যানধারণা। নিউজলেটারগুলো বলে দেয়, রন পলকে তার সমর্থকেরা যতই একজন সাদাসিধা যুদ্ধবিরোধী মানুষ বলে মনে করুক না কেন, তিনি আসলে আমেরিকার রাজনীতির নোংরা এবং পুরোনো কিছু রেওয়াজের দৃঢ় অনুসারীদের একজন। আসলে পলের দর্শন বোঝার জন্য আমার কাছে সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে অ্যালাবামার অবার্নে লুডভিগ ফন মিসেজ ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটকে আমেরিকার অন্যতম থিংক ট্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর নামকরণ করা হয়েছে অস্ট্রিয়ার এক উদারপন্থী অর্থনীতিবিদের নামানুসারে। কিন্তু এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন লিউ রকওয়েল নামের এক ব্যক্তি, যিনি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রন পলের কংগ্রেশনাল চিফ অব স্টাফ হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। তিনি এখানে বিভিন্ন সেমিনারে পাঠদান করেছেন এবং একজন বিশিষ্ট পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ইনস্টিটিউট থেকে তার গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি বেশ জটিল। এর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত গড়ে উঠেছিল প্রয়াত মারি রথবার্ড নামের একজন ইহুদি অভিবাসীর কাজ এবং চিন্তার ওপর ভিত্তি করে। মারি পোল্যান্ডে জন্ম নেওয়া একজন ইহুদি, যিনি নিজেকে 'অ্যানার্কোক্যাপিটালিস্ট' হিসেবে

পরিচয় দিতেন। মুরির চোখে রাষ্ট্র 'একটি অপরাধী চক্র' ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এ ইনস্টিটিউটের একটি বিশ্ববীক্ষা বিশেষভাবে অস্বস্তিকর– আমেরিকান গৃহযুদ্ধে হেরে যাওয়া দাস প্রথার সমর্থক পক্ষ কনফেডারেসির সঙ্গে এর যোগসাজশ আছে।

এই ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্য থমাস জে উডস জুনিয়র ছিলেন লিগ অব সাউথের মতো একটি বিচ্ছিন্নতাকামী গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। পাশাপাশি তিনি ২০০৪ সালে 'দ্য পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট গাইড টু আমেরিকান হিস্ট্রি' নামের একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইকে সংশোধনবাদী এবং দাস প্রথার সময়কার কনফেডারেট সরকারের মনোভাবের কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া হয়। পল উৎসাহী হয়ে এই বইয়ের মলাট-ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এই বই রাজনৈতিকভাবে সঠিক স্মৃতির গর্ত থেকে ইতিহাসকে উদ্ধার করেছে"। এই ইনস্টিটিউটের আরেক জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্য এবং লেখক থমাস ডি লোরেঞ্জো 'দ্য রিয়েল লিংকন: আ নিউ লুক অ্যাট আব্রাহাম লিংকন, হিজ অ্যাজেন্ডা অ্যান্ড অ্যান আননেসেসারি ওয়ার' নামের আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে তৎকালীন দক্ষিণ অংশের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বইতে তিনি লিংকনকে ঘিরে গড়ে ওঠা ভক্তকুলকেও আক্রমণ করেছেন। গত মাসে পল এমএসএনবিসি চ্যানেলে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে গৃহযুদ্ধ আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না, (পল নিজে বিশ্বাস করেন, ছিল না।) সে বিষয়ে কথা বলার সময় এই বইকে অনুমোদন করেন। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পল ওই আলোচনা সভাতেও কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির আগাম রিভিউ করতে গিয়ে রকওয়েল সমর্থকদের উদ্দেশে লেখেন, "আমরা বিচ্ছিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করব এবং কীভাবে ওই কারণগুলোকে প্রচার করা যায় তা দেখব।"

পলের নিউজলেটারে এভাবেই বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদের সাধারণ ধারণার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯২ সালে সারভাইভাল রিপোর্ট নামে নিউজলেটারে লেখা হয়েছে, "মুক্ত সমাজে বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে আরও বদ্ধমূল করা প্রয়োজন।" সেখানে আরও লেখা হয়, "সরকারের ছোট ছোট অংশের ঢিলেঢালাভাবে একসঙ্গে থাকার যে ভাবনা, তার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনকে আমাদেরও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।"

পলসহ আরও যারা ভন মিসেজ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত, তারা হয়তো নিজেদেরকে উদারনৈতিক বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একধরনের ডানপন্থী উদারপন্থাকে মেলে ধরছেন, যা আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে বিপর্যয়কর বাঁকবদল বলে মনে করা হয়। অথচ ওই সময়ে একটি নির্যাতক ফেডালের সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন রাজ্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

ওয়াশিংটনের একজন খ্যাতিমান উদারপন্থী আমাকে বলেছেন, "এই দেশে অনেক উদারনৈতিক মানুষ আছেন, যারা ফন মিসেজের বইয়ের অনুরক্ত। তারা এই আকর্ষণেই ইনস্টিটিউটে যান এবং সেখানে তাদের শেখানো হয় কনফেডারেট সরকার ব্যবস্থাকে পক্ষাবলম্বন হচ্ছে উদারনৈতিক চিন্তাধারার অংশ।"

নব্য কনফেডারেটদের সঙ্গে পলের জোট বাঁধার বিষয়টা বর্ণবাদ বিষয়ে তার নিউজলেটারের দৃষ্টিভঙ্গিকেও ব্যাখ্যা করে। ১৯৯২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত রন পল পলিটিক্যাল রিপোর্ট সে বছর লস অ্যাঞ্জেলেসে দাঙ্গা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছে, "দাঙ্গা শুরু হওয়ার তিন দিন পর যখন কৃষ্ণাঙ্গদের কল্যাণ ভাতার চেক নেওয়ার তারিখ সামনে চলে এলো, তখনই এলএ তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল।" নিউজলেটারে এই দাঙ্গার পেছনের কারণ হিসেবে সরকার এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়কে দায়ী করে বলা হয়, "কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের 'নাগরিক অধিকার', কোটা ব্যবস্থা, চাকরিতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ সুবিধা, সরকারি চুক্তির খারিজ সুবিধা, নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিভাগ, কৃষ্ণাঙ্গ আমলাতন্ত্র, কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র, স্কুলে কৃষ্ণাঙ্গদের পাঠ্যসূচি পড়ানো, কৃষ্ণাঙ্গদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান, কৃষ্ণাঙ্গ উপস্থাপক এবং বিষয় নিয়ে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলে জনসমক্ষে তাকে হেয় করার মতো বিষয়গুলোই দাঙ্গার পেছনের কারণ।" সেখানে নিম্ন শ্রেণির কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের লেনদেনের জন্য 'চেকিং অ্যাকাউন্ট' প্রয়োজন বলে যেসব গণমাধ্যম বিশ্বাস করে, তাদেরও অভিযুক্ত করা হয়। না বললে অন্যায় হবে, নিউজলেটারে লস অ্যাঞ্জেলেসের এশীয় ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করা হয়েছে; কারণ, রাজনৈতিক যথার্থতা প্রতিরোধ করা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর মুরোদ তাদের আছে। সেখানে বলা হয়েছে, "কোরিয়ানরা প্রকৃত আমেরিকানদের মতো আচরণ করে; কারণ, তারা এখন পর্যন্ত আমাদের নষ্ট উদারপন্থী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়নি, যে সংস্কৃতি বলে যে কৃষ্ণাঙ্গরা মেজাজ দেখালে মুখ ফিরিয়ে ইংল্যান্ডের কথা ভাবতে থাকো।"

পলের প্রকাশনাগুলোর একটি হলো জাতিগত সন্ত্রাসবাদের ওপর বিশেষ সংখ্যা। এ ধরনের প্রকাশনা তাদের জন্য নতুন নয়। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে তার ইনভেস্টমেন্ট লেটার নামক নিউজলেটারে 'হোয়াট টু এক্সপেক্ট ফ্রম নাইনটিন নাইনটিজ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি লেখায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, "জাতিগত সন্ত্রাস আমাদের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, কল্যাণ ভাতা পাওয়া বেশির ভাগ কৃষ্ণাঙ্গই বিশ্বাস করে, শ্বেতাঙ্গদের সম্পদ চুরি করাটা ন্যায়সংগত।" ঠিক দুই মাস পর আরেকটি নিউজলেটারে জাতিগত যুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে "দ্য কামিং রেস ওয়ার" শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়। সেখানে পাঠকদের উপদেশ দিয়ে বলা হয়, "আপনি যদি

একটি বড় শহরের বাসিন্দা হন এবং সেই শহর ত্যাগ করার অবস্থায় থাকেন, তাহলে তা-ই করুন। যদি তা না করতে পারেন, তাহলে গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগ এবং আশ্রয়ের জন্য জায়গা ক্রয় করে চলে যান।"

১৯৯১ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটন ডিসির অ্যাডামস মরগান মহল্লায় সংঘটিত একটি জাতিগত সংঘাত নিয়ে এক লেখার শিরোনাম করা হয় "অ্যানিমেলস টেকওভার দ্য ডিসি জু"। অর্থাৎ ওয়াশিংটনের চিড়িয়াখানা বন্য প্রাণীরা দখল করে নিয়েছে। ওই নিউজলেটারে আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখা হয়, "এই সংঘাত ১৯৯০ দশকে জাতিগত যুদ্ধের প্রথম নমুনা"। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে নিউজলেটারে আরেকটি লেখায় শহরাঞ্চলে সংঘটিত অপরাধ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "আমি আমার পরিবারের সব সদস্যকে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুকের ব্যবহার শেখার তাগাদা দিয়েছি; কারণ, জন্তুগুলো এগিয়ে আসছে।" আন্দাজ করা কঠিন নয়, এই রচনার লেখকও পল। সে বছর আরেকটি নিউজলেটার একটি বাস্কেটবল ম্যাচের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছে, "কালোরা উদ্‌যাপনের জন্য শিকাগোর রাস্তায় উপচে পড়েছে। কীভাবে তারা উদ্‌যাপন করল! আর কীভাবেই-বা করবে? তারা দোকানপাটের জানালা ভেঙে লুটতরাজ চালায়।" উদারপন্থীদের মধ্যে যারা কৃষ্ণাঙ্গ অপরাধ এবং কল্যাণ ভাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া থেকে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাকে নিরস্ত করেছে, ওই নিউজলেটারে তাদের প্রতি কটুবাক্য নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে আরও লেখা হয়, "বিচারকের রায়, বাস্কেটবল খেলা অথবা সংগীত– এই সবকিছুই কৃষ্ণাঙ্গ-ক্রোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে বলে মনে হয়।"

জাতিগত বিষয়ে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিউজলেটারের বিদেশ নীতির ওপরও প্রভাব ফেলেছে। বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরণকে এই নিউজলেটারে বলা হয়েছে "সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ"। এই ঘটনাকে সেখানে "ওই মহাদেশটির সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে নেলসন ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার এক মাস আগে একটি লেখায় "দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত নির্মূলের জন্য ধ্বংসযজ্ঞ আসন্ন" এ বার্তা দিয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের বিরুদ্ধে পলের নিউজলেটার ক্রোধ উগরে দিয়েছে তীব্র ভাষায়। নাগরিক অধিকার আদায়ের এই নেতাকে উপর্যুপরি আক্রমণ করা হয়েছে এই নিউজলেটারে। তার নামে 'সাধারণ ছুটি' চালুর যৌক্তিকতা নিয়েও এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। (একটি নিউজলেটার ১৯৯০ সালে এই অনুমোদনকে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের কুখ্যাত কাজ বলেও মন্তব্য করেছে। বলা হয়েছে, "আমরা এই দিনকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য ঘৃণা দিবস বলতে পারি।") ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে নিউজলেটারে মার্টিন লুথার কিংকে "এক্স-রেটেড মার্টিন লুথার কিং" তকমা দিয়ে বলা হয়, মানুষটি পুরুষছিনাল। তিনি নিজের অবৈধ প্রেমিকাকে মারধর করেন, অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের যৌনকর্মের জন্য প্রলুব্ধ করেন এবং আরেক নাগরিক অধিকারকর্মী রালফ অ্যাবারন্যাথির কাছে এদের সরবরাহ করেন। যেসব সক্রিয় কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী মার্টিন লুথার কিংয়ের নামানুসারে নিউইয়র্ক শহরের নাম পাল্টে দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিল, নিউজলেটারে তাদের উপহাস করে বলা হয়, "'ওয়েলফারিয়া', 'জুভ্যালি', 'রেপটাউন', 'ডার্টবার্গ', 'লেজিওপলিস' এই নামগুলো তারা ভালো বিকল্প হিসেবে ভাবতে পারে।"

একই বছর তারা লুথার কিংকে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলে, "এই মানুষটা চাপিয়ে দেওয়া পৃথক্‌করণের মন্দ দিককে চাপিয়ে দেওয়া একত্রীকরণের মন্দ দিক দিয়ে স্থানান্তর করার জন্য দায়ী।"

মার্টিন লুথার কিংকে কটুবাক্যের চাবুকে ছিন্নভিন্ন করার সময় তারা কিন্তু কুখ্যাত কু ক্লাক্স ক্লান সংগঠনের নিন্দিত ব্যক্তি ডেভিড ডিউকের জন্য ভালো ভালো বাক্য রচনা করেছে। "দ্য ডিউকস ভিক্টরি" শিরোনামে একটি লেখায় তারা ১৯৯০ সালে লুইজিয়ানা রাজ্যে সিনেটে ডিউকের ৪৪ শতাংশ ভোট পাওয়ার ঘটনাকে তার বিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছে, "ডিউক নির্বাচনে হেরে গেছেন, কিন্তু প্রশাসনের শরীরে ভীতিকর জ্বলন্ত দাগ রেখে গেছেন।" ১৯৯১ সালে একটি নিউজলেটারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, "গভর্নর নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরেও ডিউকের যে বিশিষ্টতার প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়েছে, তা কি সরকারবিরোধী বড় শক্তির জন্য ইতিবাচক?" লেখার উপসংহারে বলা হয়েছে, "সরকার-বিরোধী, কর-বিরোধী, অপরাধ-বিরোধী, কল্যাণ ভাতা নেওয়া অকর্মণ্য ব্যক্তি-বিরোধী, জাতি বিশেষাধিকার-বিরোধী, বৈদেশিক অনধিকার হস্তক্ষেপ-বিরোধী ডিউকের যেসব বার্তা আছে, সেগুলোকে আমাদের প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করে অবিচলিত মুক্তির সনদের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে।" ডিউক সরাসরি কোনো প্রার্থীকে সমর্থন না দিলেও আমার মনে হয়, এই ব্যক্তি তার ওয়েবসাইটে রন পল বিষয়ে তথ্য দিয়ে রাখবে।

কৃষ্ণাঙ্গদের মতো সমকামীরাও পলের নিউজলেটার থেকে অসংখ্য বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য হজম করেছে। রন পলের নিউজলেটারে প্রকাশিত লেখায় প্রায়শ তারই পুরোনো সহকর্মী ড্যানেমায়ারের বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ড্যানেমায়ার এইডসে আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গরোধ করে রাখার বিষয়ে সমর্থন দিয়েছিল। নিউজলেটারে সমকামী গ্রুপের সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ডেনিমেয়ারের প্রশংসা করা হয়। ১৯৯০ সালে একটি নিউজলেটারে সমকামীদের একটি পত্রিকার রিপোর্টারকে উল্লেখ করে

লেখা হয়, "তার কাছে নিশ্চিতভাবে চূর্ণ করার জন্য কুঠার থাকলেও নরম কবজি দিয়ে তো কাজটা করা যায় না।" নিউজলেটারের আরেকজন লেখক, ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেটা পল নিজে, একটি লেখায় হেট ক্রাইম-সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর করা এবং সমকামিতার পক্ষে কথা বলে এমন গ্রুপের নেতাদের হোয়াইট হাউসে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের সমালোচনা করেন। লেখায় আরও বলা হয়, "সমকামিতার বিষয়ে গোপনীয়তা এখন হারিয়ে গেছে। সমাজটা তখনই সুন্দর ছিল, যখন সামাজিক চাপ তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড গোপন রাখতে বাধ্য করত।" কিন্তু যখন 'কনজারভেটিভ ইয়াং আমেরিকানস ফর ফ্রিডম' নামে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক কর্মী মারভিন লিবম্যান নিজেই ঘোষণা দিলেন যে তিনি একজন সমকামী, তখন পলের আরেকটি নিউজলেটার ন্যাশনাল রিভিউতে অনুনয় করে লেখা হলো, "গোপনীয়তা ফিরিয়ে আনুন"।

আশ্চর্যের ব্যাপার, একটি লেখায় সামরিক বাহিনীতে সমকামিতা-সংক্রান্ত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কিছুটা সমর্থনের সুর লক্ষ করা গেছে। তবে শেষে এই মতামত দেওয়া হয়েছে যে, "কেউ যদি সমকামিতার বিষয়টা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তদের কাছ থেকে শারীরিকভাবে দূরে রাখতে হবে।"

পলের নিউজলেটার এইডস রোগ নিয়েও অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সময়। প্রকাশিত লেখায় এইডসকে বলা হয়েছে, "ঘুষ দিয়ে প্রচার এবং সমকামী মহলের প্রভাব বাড়ানোর মাধ্যমে এই রোগকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে।" তারা এভাবে সমকামী মানুষদের এলোপাতাড়ি এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। ১৯৯০ সালে একটি নিউজলেটারে প্রায় অনুমোদনের ভঙ্গিতে "আ ওয়েলনোন লিবারেটেরিয়ান এডিটর" শীর্ষক একটি লেখায় বলা হয়েছে, "গোটা ম্যানহাটনের দেয়ালে দেয়ালে যে সতর্কতামূলক স্টিকার সাঁটা হয়েছে, সেখানে লেখা আছে নীরবতা = মৃত্যু। কিন্তু এখানে কি পায়ুকাম = মৃত্যু লেখা উচিত ছিল না?" লেখায় পাঠকদের রক্তদান এড়িয়ে চলার জন্য সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, "সমকামীরা রক্ত সরবরাহকেই বিষাক্ত করে তোলার চেষ্টা করছে।" ১৯৯০ সালে একটি নিউজলেটারে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, "এইডসে আক্রান্তদের অধিকার বিষয়ে শুনতে শুনতে অসুস্থ হয়ে পড়া একমাত্র ব্যক্তি কি আমিই?" একই বছর খ্রিস্টানদের অধিকার রক্ষাবিষয়ক মূলধারার বাইরের একটি পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, "এইডস রোগীদের রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, কেননা এই রোগ থুতু থেকে ছড়াতে পারে।" অথচ এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। এইডস রোগ সংক্রমণের বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন তত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা 'সারভাইভিং দ্য এইডস প্লেগ' নামে একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন করেছে পলের নিউজলেটার। সেখানে এইডস রোগে আক্রান্তদের সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যবান সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পান এমন অভিভাবকদের পক্ষে কথা বলা হয়েছে। এইডস রোগের সংক্রমণ বাড়ায় একটি নিউজলেটারে লেখা হয়েছে, "সানফ্রানসিসকো শহরের সমকামীরা ভালো নির্দেশনাও শুনতে নারাজ। এ ধরনের মানুষদের পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার পর বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই। এদের স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। তাদের জীবনের কেন্দ্রই হচ্ছে নতুন নতুন যৌনসঙ্গী; পাশাপাশি অসুস্থতা ডেকে এনে অন্যদের মনোযোগ আর করুণা চাওয়া।"

তাদের এই কথার ঝাঁজ ইহুদিদের বেলায় এসে বেশ নরম। আমার দৃষ্টিতে ইসরায়েলের প্রতি এই নিউজলেটারের একটা বিশেষ আসক্তি আছে। এই দেশের নাম নিউজলেটারে যতবার উল্লেখ করা করা হয়, ততবার অন্য কোনো দেশের নাম নেওয়া হয়নি। পল কর্তৃক প্রকাশিত ইনভেস্টমেন্ট লেটারের ১৯৮৭ সালের একটি সংখ্যায় ইসরায়েলকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে "আগ্রাসী, জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" এবং বলা হয়েছে, '১৯৯০ সালে পৃথিবীর সব দেশে প্রভাবশালী মহলে ইসরায়েলের হাজার হাজার বন্ধু রয়েছে, যারা তাদের পারঙ্গমতার জায়গা থেকে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক।" ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নিউজলেটারে লেখা হয়েছে, "এই ঘটনা যদি আমার ইহুদি বন্ধুর সন্দেহ অনুযায়ী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ঘটিয়ে থাকে অথবা এটা ইসলামিক জঙ্গিদের পাল্টা জবাবও হয়ে থাকে, তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না।"

পলের নিউজলেটার শুধু অন্ধবিশ্বাসকেই ধারণ করে না, পাশাপাশি একধরনের বিকৃত মানসিকতারও ধারক তারা। আর এই বিকৃতির আরেক নাম সরকার বিরোধিতা, যা আশি ও নব্বইয়ের দশকে বেশ কিছু দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া গ্রুপকে আলোড়িত করেছিল। তখন ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করাটা ন্যায্য– এমন ইঙ্গিতও নিউজলেটারে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার ওকলাহোমা রাজ্যের মুরাহ ফেডারেল ভবনে বোমা হামলার মাস তিনেক আগে একটি নিউজলেটারে "টেন মিলিশিয়া কমান্ডমেন্টস" শিরোনামে লেখায় বলা হয়, "আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এখন ১৫০০ মিলিশিয়া যোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, যা আমেরিকার জন্য সবচেয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ অগ্রগতি।" লেখায় মিলিশিয়া যোদ্ধাদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, "তারা সম্ভবত বিএটিএফ (ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো অ্যান্ড ফায়ার আর্মস) নামে সংস্থাটির নজরদারিতে আছে।" অ্যালাবামা রাজ্যে সন্স অব লিবার্টি নামে আরেকটি সরকারবিরোধী মিলিশিয়া গ্রুপের উপদেশবাণী নিউজলেটারে মুদ্রিত হয়েছে এভাবে, "আপনারা বহুমাথার প্রাণী হাইড্রাকে মাথা কেটে হত্যা করতে পারবেন না", "আপনাদের দলের আকার ছোট রাখতে হবে", "নীরবতা আপনাদের

গোপনীয়তার প্রধান শর্ত", "কোথাও কোনো চিহ্ন ফেলে রাখবেন না", "যত দূর সম্ভব ফোন ব্যবহার এড়িয়ে চলবেন" এবং "খুব প্রয়োজন না হলে গুলি চালাবেন না, তবে তারা যদি যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে আপনারাও যুদ্ধ শুরু করবেন।"

এ ধরনের নিউজলেটারগুলোর বাক্সভর্তি বাজারচলতি ষড়যন্ত্রতত্ত্ব থেকে প্রতীয়মান হয়, শিল্প-ব্যাংক এবং রাজনৈতিক মহলের প্রতিপত্তিশালীদের নিয়ে পল কতটা ঘোরগ্রস্ত ছিলেন। পাশাপাশি ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার প্রতিও পলের আস্থাহীনতাও ছিল। নিউজলেটারে বিল্ডারবার্গ গ্রুপ, ট্রাইলেটারাল কমিশন এবং কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেশনস অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে ক্রোধপূর্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংস্থাগুলোর বিষয়ে ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকেরা বহুকাল ধরেই অভিযোগ করে আসছেন যে, তারা গোটা পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক দখল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৯৭৮ সালে একটি নিউজলেটারে ডেভিড রকফেলার, ট্রাইলেটারাল কমিশন এবং স্বৈরতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও ব্যবসায়িক স্বার্থকে দায়ী করা হয় 'পানামা চুক্তির' জন্য। নিউজলেটারে বলা হয়, "চুক্তিটি আমেরিকার ইতিহাসে একটি বিষাদময় ঘটনা"। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত একটি নিউজলেটারে একজন চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, তিনি বিশ্বাস করেন, এইডস রোগ সৃষ্টি হয়েছে মেরিল্যান্ডের ফোর্ট ডেট্রিকে অবস্থিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণাগারে। এসবের পাশাপাশি রন পল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস টেক্সাস রাজ্যের ওয়াকোতে ফেডারেল এজেন্টদের সঙ্গে কট্টর ডানপন্থীদের একটি গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিও বিক্রি করে। সেই ভিডিও প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ানা রাজ্যের একজন আইনজীবী। তিনি ভিডিওতে উল্লেখ করেন যে ওয়াকোর ঘটনা ছিল টিএফ এজেন্টদের হত্যার একটি পরিকল্পনা। নিহত এজেন্টরা ছিল প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের দেহরক্ষী। এই নিউজলেটারগুলোর অদ্ভুত যত তত্ত্বের মতো এই ভিডিও বিষয়েও মন্তব্য করতে গিয়ে লেখা হয়, "আমি ভিডিওতে বর্ণনাকারীর সব বিবরণ সম্পর্কে হলফ করে বলতে না পারলেও যে বিষয়টি এখানে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তা হলো সরকারের মিথ্যাবাদী ভূমিকা। পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে পুলিশের হীন কৌশল এবং অপরাধ।" নিউজলেটারে ভিডিওটি সংগ্রহের জন্য তাদের হিউস্টন অফিসে ২৪.৯৫ ডলার পাঠাতে অথবা 1-800-RON-PAUL এই ক্রেডিট কার্ডে পে করতে বলা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রন পলের প্রচার মুখপাত্র জেসি বেন্টনকে বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, "বিগত বছরগুলোতে তার প্রকাশনাগুলোয় অনেক লেখার অনুমোদন দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি নিজেই নিজের লেখার অনুমোদন দেননি।" বেন্টনকে আরও কয়েকটি আক্রমণাত্মক লেখা পড়ে শোনানোর পর তিনি বলেন, "অনেক নিউজলেটারের লেখা তিনি (পল) দেখেন না। এ রকম অনেক উসকানিমূলক লেখাও না।" তিনি আরও বলেন, "মার্টিন লুথার কিংয়ের প্রতি অপমানজনক মন্তব্য করার বিষয়টি তাকে বিস্মিত করেছে। কারণ, রন পল মার্টিন লুথার কিংকে একজন নায়ক বলে মনে করেন।"

প্রকৃতপক্ষে পলের মুখ্য প্রচারক তাকে একজন সরল, দায়িত্ব থেকে বিরত একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই চিত্রিত করতে চেয়েছেন, যিনি তার অনুপস্থিতিতে অধীনস্থরা কী করছে, তা জানেন না। এই চিত্র তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত, যদি নিউজলেটারে উগ্র মতের প্রকাশ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটত অথবা নিউজলেটারগুলো স্বল্প সময়কালের জন্য প্রকাশিত হতো। এখানে একটা বিষয় বিস্ময়কর যে, দিনের পর দিন বর্ণবাদ, সমকামীদের প্রতি সংস্কার, ইহুদিবিদ্বেষ আর ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তায় জারিত এসব লেখা পল কীভাবে ছাপার জন্য অনুমোদন দিয়ে গেলেন! পল নিজে আক্রমণাত্মক লেখাগুলো লিখেছেন কি লেখেননি, সেই প্রশ্নের চেয়ে এখানে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে নিজের নামে ছাপা হওয়া লেখাগুলোর বিষয়ে এত বছরে পল কেন কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না?

পলের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের যোগাযোগের বিষয়টাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নয়। জন বার্চ সোসাইটির ম্যাগাজিনে তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রেডিও উপস্থাপক অ্যালেক্স জোন্সের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে গেছেন বহুবার। এই অ্যালেক্স জোন্স আমেরিকায় ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক হিসেবে সুপরিচিত। সম্প্রতি তার তৈরি একটি তথ্যচিত্র 'এন্ডগেম: ব্লু-প্রিন্ট ফর গ্লোবাল এনস্লেভমেন্ট'-এ কীভাবে মানব সভ্যতাকে নির্মূল করে মহাকাশে ভ্রমণযোগ্য 'অতিমানবীয়' কম্পিউটার হাইব্রিড তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জর্জ পাতাকি, ডেভিড রকফেলার এবং নেদারল্যান্ডসের রানি বিয়াত্রিচ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছেন। পল ১২ বছরে এই রেডিও অনুষ্ঠানে আনুমানিক ৪০ বার উপস্থিত হয়েছেন।

গ্রে নর্থ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন কংগ্রেসম্যান পলের অফিস সহকারী। তিনি আবার আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বাইবেলের আইন বাস্তবায়নের পক্ষ সমর্থনকারী ক্রিশ্চিয়ান রিকনস্ট্রাকশনিজম নামের একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। উদারপন্থীদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান রিকনস্ট্রাকশনিস্টদের সুসম্পর্ক থাকার কারণ, তারা উভয়ই সরকারবিরোধী। গ্রে নর্থ ভ্রূণ হত্যাকারী নারী এবং পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া মানুষদের শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পক্ষে ওকালতি করেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ে নর্থ পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপন করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "এভাবে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা সবার জন্য সহজলভ্য এবং তাতে কোনো ধরনের অর্থ ব্যয় করতে হবে না।" এই ভদ্রলোক গ্রে নর্থ রেমনেন্ট রিভিউ নামে "ক্রিশ্চিয়ান এবং মুক্তবাজার"-এর পক্ষাবলম্বনকারী নিউজলেটারের জন্য বেশি পরিচিত। ১৯৮৩ সালে একটি নিউজলেটারে পল কমিটি টু স্টপ বেইলআউট মাল্টিন্যাশনাল

ব্যাংক নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দম্ভোক্তি করে লিখেছেন, "হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে গ্রে নর্থের রেমনেন্ট রিভিউতে সরকারের নির্যাতনকে উন্মোচন করা আমার লেখা পড়েছেন।"

রন পল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু তার নির্বাচনী প্রচার যেহেতু হালে যথেষ্ট পানি পেয়েছে, তাই রন পলও সীমানা টপকে উচ্চ পর্যায়ের বিতর্কের আসরে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছেন। সম্প্রতি পল টিম রুসার্টের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। মাত্র তিন মাসে তিনি প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছেন, যার বেশির ভাগই তোলা হয়েছে অনলাইনে। পল গত সপ্তাহে আইওয়া ককাসের ভোটে পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী রুডি জুলিয়ানির চেয়ে তিন গুণ বেশি ভোটও বাক্সবন্দি করেছেন। গণমাধ্যম তাকে নিয়মনিষ্ঠ গম্ভীর মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করে। পাশাপাশি একজন স্পষ্ট বক্তা হিসেবে তার প্রশংসা করে থাকে।

কিন্তু পলের নিউজলেটারগুলো তার একটি ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করে। সেই চিত্রটি বলে, হয় পল অন্তর্গতভাবে একজন তিক্ত প্রকৃতির মানুষ, অথবা দীর্ঘ সময় ধরে তিনি অন্য মানুষকে তার পক্ষ থেকে তিক্ততর রচনা লেখার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিদের নাম বিকৃত করে বলার প্রবণতা আছে তার মধ্যে। বারবারা জর্ডানকে তিনি ডাকেন "বারবারা মোরনডন", এলেনের হোমস নর্টন হয়ে যান "ব্ল্যাক পিংকো"। আবার ডোনা শালেলাকে তিনি সম্বোধন করেন "শর্ট লেসবিয়ান", রন ব্রাউন হয়ে যান "রেসিয়াল ভিকটিমোলজিস্ট"। আমেরিকার সিনেটে প্রথম সরকারিভাবে স্বীকৃত সমকামী জনপ্রতিনিধি রবার্টা অ্যাকটেনবার্গকে তিনি সম্বোধন করেন "চূড়ান্ত বামপন্থী ঘৃণিত সমকামী রাজনৈতিক কর্মী" হিসেবে। হয়তো এ ধরনের বিস্ফোরক বক্তব্য বলে দেয়, রন পল একজন স্পষ্ট বক্তা অথবা প্রমাণ করে, রন পল ঘৃণায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ।

পরিশিষ্ট

জেমস কার্চিক

বহুদিন ধরে রন পলের বিষয়ে আমার একধরনের সন্দেহ কাজ করে আসছিল। আমেরিকায় ধর্মান্ধতা এবং চরমপন্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ছোট ছোট ডানপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ রয়েছে। লক্ষ করে দেখেছি, পলের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা এবং তার লেখার সঙ্গে উগ্র ডানপন্থীদের কিছু সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে। আমি জানতাম, তার সঙ্গে সত্যিকারের উগ্রপন্থীদের মেলামেশা আছে, কিন্তু এই বিষয়ে একটি লেখা তৈরি করে ফেলাকে কেউ সঙ্গ বিবেচনায় দায় চাপানো বলে চিহ্নিত করতে পারেন।

আমি জানি, তিনি কিছু সময়ের জন্য একটি নিউজলেটার প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত একটি বা দুটি সংখ্যা দিয়ে পুরোটা বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই আমি একটা ভালো স্টোরি করার জন্য অন্যদের শরণাপন্ন হই। উগ্র ডানপন্থীদের কাজকর্ম নিয়মিত নজরে রাখেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিপ বার্লেট, ম্যাসাচুসেটসে অবস্থানরত রাজনৈতিক গবেষকেরা আমাকে কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় এবং উইসকনসিন হিস্ট্রক্যাল সোসাইটির গ্রন্থাগারে অনুসন্ধানের কাজ করার পরামর্শ দেন। ওই দুই জায়গাতেই আমেরিকার উগ্র ডানপন্থা বিষয়ে অনেক গবেষণাকর্ম রয়েছে বলে তারা আমাকে জানান। পাশাপাশি আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণা গ্রন্থাগারের ডেটার জন্য ওয়ার্ল্ডক্যাট নামে অনলাইনভিত্তিক ডেটাবেজের সহায়তা নিই, যা বহু রিপোর্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

আমাকে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয়, কম খরচে কোন গ্রন্থাগারে যাওয়া যেতে পারে। আমি দুটি গ্রন্থাগারের প্রধান কর্মকর্তাকে ফোন করি। সব সময়ই দেখা যায়, কিছু মানুষ আছেন যারা কিছু না কিছু তথ্য জানেন এবং তারা কথা বলতে আগ্রহী হন। আমি দুই প্রধান গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে তাদের গ্রন্থাগারে আমার আগ্রহের বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করি। তবে তারা আমাকে একেবারে প্রাথমিক কিছু তথ্য ছাড়া আর কোনো কিছু সরবরাহ করতে পারেননি। কানসাস গ্রন্থাগার জানায়, তাদের কাছে নিউজলেটারের প্রথম দিককার সংখ্যা আছে আর উইসকনসিনের গ্রন্থাগারে পরের দিকের কিছু সংখ্যা আছে। আমার মনে হলো, পুরোনো সংখ্যা ঘাঁটলে লেখার জন্য রসাল উপাদান মিলতে পারে। তাই কানসাসে যাওয়া স্থির করলাম। সেখানে যেসব তথ্য পাওয়া গেল, সেগুলো ছিল বেশ আপত্তিকর। তবে উইসকনসিন হিস্ট্রক্যাল সোসাইটি আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে যেভাবে সাড়া দিল, তাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। তারা আমার অনুরোধ পেয়ে অনুপ্রাণিত হয় ভীষণভাবে। (সম্ভবত সেই নিউজলেটারগুলোর বিষয়ে সেবারই প্রথম কেউ জানতে চাইল।) কয়েক সপ্তাহ পরে তারা পুরো সংগ্রহই মাইক্রোফিশ আকারে আমাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আমি তাদেরকে মেইল করে কার্ট্রিজগুলো পাঠানোর অনুরোধ করি। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত সংখ্যাগুলো, বলা যায়, আমার জন্য সৌভাগ্যের ভাণ্ডার ছিল। এগুলো ছাড়া আমার লেখা এতোটা তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত না।

আমি তাদের সহায়তায় সব তথ্য বিষয় অনুযায়ী গুছিয়ে ফেলি। (ইহুদিবিদ্বেষ, বর্ণবাদ, সমকামিতা, মিলিশিয়াদের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি।) কাজটা খুবই সময়সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু একবার গুছিয়ে ফেলার পর লেখার কাজটা সহজ হয়ে যায়।

লেখাটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে সম্পাদক নিশ্চিত ছিলেন না। তবে লেখার জন্য ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া থাকলে আমার কাজ দ্রুত এগোয়। ২০০৮ সালের গোড়ার দিকে নিউ হেমিস্ফিয়ার রিপাবলিকান প্রাইমারি অ্যাপ্রোচের দিনটাকেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে স্টোরিটি প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত বলে বেছে নিই। আশা করা হচ্ছিল, পলও সেখানে ভালো ফল করবেন। আমার স্টোরির সম্পাদক ছিলেন খুব দক্ষ। তিনি আমার ১২ হাজার শব্দের স্টোরিটি কেটে-ছেঁটে ৩০০ শব্দে নামিয়ে আনেন। স্টোরিটি আমার স্টোরির সব সূত্রের কাছে, বিশেষ করে, যারা গণমাধ্যমে কাজ করেন, তাদের কাছে পাঠাই। দ্য নিউ রিপাবলিক-এ কর্মরত আমার সহকর্মীরাও আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন স্টোরিটির বিষয়ে।

শুরুতেই স্টোরিটি ইতিবাচক সাড়া পায়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এটি উল্লিখিত হয় এবং এসব অভিযোগের বিষয়ে পলকে উলফ ব্লিজারের ইন্টারভিউয়ে এবং প্রকাশের পরের দিন সিএনএনে ব্যাখ্যা দিতে হয়। প্রাইমারিতে পল পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। যদিও অনেকে আশা করেছিলেন, তিনি তৃতীয় হবেন। পল অথবা তার সহকারীদের কেউই স্টোরির তথ্যগত ভিত্তি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। রিজন ম্যাগাজিন এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলোআপ স্টোরি প্রকাশ করে তার আয়কর নিয়ে। সেখানে প্রকাশ করা হয় পল এবং তার পরিবার এই নিউজলেটারগুলোর মাধ্যমে কত টাকা বানিয়েছেন। উল্টো দিকে আমি পলের সমর্থকদের কাছ থেকে শত শত বিদ্বেষপূর্ণ ই-মেইল পেয়েছি, যার কয়েকটিতে মৃত্যুর হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। একজন রাজনীতিবিষয়ক রিপোর্টার হিসেবে আমি বিদ্বেষপূর্ণ মেইল পেতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ ধরনের হুমকির গন্ধমাখা ই-মেইল ছিল তখন আমার কাছে নতুন বিষয়। আমি পল এবং তার সমর্থকদের সম্পর্কে যেসব তথ্য জানতাম, তাতে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।

তবে আমি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পলের বিষয়ে খবর প্রকাশের ধরন দেখে হতাশায়ও ভুগি। সম্প্রতি পল ২০১২ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সপ্লোরেটরি কমিটির স্তরবিন্যাস ঘোষণা করলে খুব কমসংখ্যক সংবাদমাধ্যমের খবরে নিউজলেটারের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়। এস্কয়ার পত্রিকায় পলের পরিচিতি ছাপা হলে সেখানেও নিউজলেটারের বিষয়টা ছিল অনুপস্থিত। আমার স্টোরিটি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেছিলাম এবং মনে করেছিলাম, এটি পলের পরিচিতির ওপর আরও বড় ধাক্কা দেবে। মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো যখন পলকে কৃতী মানুষ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন আমি ব্যথিত হই; কারণ, এটা তার প্রাপ্য নয়।

২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের পায়ের নিচে মাটি: সামাজিক ঘটনা অনুসন্ধান

১.
তিক্ত অভিজ্ঞতার বিদ্যালয়গুলো

সুন্দর জীবন এবং ভালো বেতনের চাকরির জন্য বিপুলসংখ্যক নারী আজকাল আর্থিকভাবে লাভজনক পেশায় শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হচ্ছেন। কিন্তু পরিবর্তে তাদের ঝুলিতে জমা হচ্ছে অর্থহীন ডিগ্রি আর ঋণের বোঝা।

ব্যারি ইয়োম্যান

ভূমিকা

এই সংকলন তৈরির সময় আমাকে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে। তখন বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বেসরকারি বিদ্যালয় আমার চোখে পড়েছে। সেগুলো কোনোটা ভাষা শিক্ষার (ইংরেজি ভাষা), কোনোটা কারিগরি বিদ্যার (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার), কোনোটা শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের স্কুল। (সাংবাদিকতার এসব বিদ্যালয়ের স্নাতকদের এক-তৃতীয়াংশও বর্তমান গণমাধ্যমে চাকরির সুযোগ পায় না।) অবাক হয়ে ভাবি, এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো কি জ্ঞানের সামান্যতম ছিটেফোঁটা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে পারছে, নাকি তাদের সুন্দর জীবনের স্বপ্নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে? ব্যারি ইয়োম্যান তার প্রতিবেদনে এই প্রশ্নের হৃদয়বিদারক উত্তর দিয়েছেন। এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য ব্যারি ইয়োম্যান কর্মপদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন একগুচ্ছ বিস্ময়কর তথ্যপ্রযুক্তি। তবে শেষে এ প্রযুক্তি সেই সব মানুষকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছে, যারা ব্যক্তিগতভাবে দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। ব্যারি ইয়োম্যান সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে ভাগ করা যায়। ওই মানুষগুলোর মধ্যেই একজন তার স্টোরির লিড হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রবণতাকে কীভাবে আকার দেওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এই বাণিজ্য, এটির পরিচালক এবং বাজার– এই তিনটি বিষয়ের চমৎকার একটি মানচিত্র আঁকা হয়েছে স্টোরির মধ্যে। এসব উপাদান ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন চেহারায় উঁকি দেবে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, ইয়োম্যান স্টোরির উপসংহারে বড় ধরনের সংকটের অবয়ব তুলে ধরার আগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের নিজ নিজ পক্ষ থেকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ ধরনের একটি স্টোরি মানুষের জীবন পাল্টে দিতে পারে এবং পৃথিবীর যেকোনো অংশেই এমনটা ঘটতে পারে। (আমি নাইজেরিয়া থেকে একই ধরনের একটি স্টোরি জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ই-মেইলে কোনো উত্তর পাইনি।) ইয়োম্যান স্টোরির পরিশিষ্ট অংশে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তা একটি ভালো অনুশীলনের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

স্টোরিটি প্রথম প্রকাশিত
গুড হাউজকিপিং (যুক্তরাষ্ট্র) জুন ২০১০

পাঁচ বছর আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর ইয়াসমিন ইসা উপলব্ধি করেন, তার পক্ষে শুধু একজন গৃহবধূ মা হয়ে টিকে থাকা অসম্ভব। বিয়ের আগে তিনি দুই বছর কলেজে ক্লাস করেছেন, কিন্তু কখনোই পেশাদার কাজ করার জন্য তার কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল না। নিউইয়র্কের ইয়নকার্সের বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সী ইয়াসমিন বলেন, "আমি নিজের জন্য আশাপ্রদ কিছু একটা করতে চেয়েছি।" একজন আলট্রাসাউন্ড টেকনিশিয়ান হতে চাওয়া ইয়াসমিন স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট খুঁজে পান ইন্টারনেটে। আর্থিকভাবে লাভজনক পেশাগত শিক্ষার জন্য চেইন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে স্যানফোর্ড ব্রাউন স্বাস্থ্যবিষয়ক পেশার জন্য বিশেষায়িত। তাদের ওয়েবসাইটে বলা আছে, "আপনি কি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন খাতে উদ্দীপক এবং ফলপ্রসূ কোনো পেশা খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারি।"

নিউইয়র্কের হোয়াইট প্লেইনসে স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউটের বিশাল কার্যালয়ে তিনি একজন নিয়োগকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ক্যারিয়ার এডুকেশন করপোরেশনের মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠান দেশজুড়ে ৯০টি পেশা শিক্ষাবিষয়ক কলেজ থেকে বছরে ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। সেই নিয়োগকর্তা জানান, তাদের একটি শিক্ষা কার্যক্রম ইয়াসমিনকে দ্রুততার সঙ্গে মাত্র ১৮ মাসে আলট্রাসাউন্ড বিষয়ে সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য যোগ্য করে তুলবে এবং তাদের পদায়ন ব্যবস্থা তাকে ভালো বেতনের কাজ পেতে সহায়তা করবে। ইয়াসমিনকে তারা এ-ও বলেছিল, "আপনি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব।" সেই নিয়োগকারী কর্মকর্তা ইয়াসমিনকে আরও জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানটি সরকার অনুমোদিত 'অ্যাক্রিডেটিং কাউন্সিল' কর্তৃক স্বশাসিত স্কুল ও কলেজের জন্য স্বীকৃত। কিন্তু সেই নিয়োগকারী নিবন্ধন করিয়ে ফেলার জন্য যেভাবে চাপ দিচ্ছিল, তাতে ইয়াসমিন বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তবে লোকটির চাপাচাপিতে ইয়াসমিন শেষ পর্যন্ত নিবন্ধন করে ফেলেন। তার কোর্সের নির্ধারিত ফি ছিল ২৭ হাজার মার্কিন ডলার। ইয়াসমিন ১৫ হাজার ডলার নেন ফেডারেল সরকারের শিক্ষার্থী ঋণ তহবিল থেকে। বাকি ১২ হাজার ডলার তিনি তুলে নেন যমজ কন্যার জন্য বরাদ্দকৃত শিশু সহায়তা তহবিল থেকে।

ইয়াসমিন ইনস্টিটিউটের ব্যবহারিক শিক্ষার পাঠদানের প্রশংসা করলেও কিছু কিছু ক্লাসের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়া মুখস্থ করতাম। কোনো কিছুই আত্মস্থ করতে পারতাম না।" তিনি নিজের সাত বছর বয়সী মেয়েকে দেওয়া সময়ের অনেকটাই পড়ালেখার পেছনে ব্যয় করেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। দেড় বছর পর ২০০৮ সালের জুন মাসে তিনি 'ডায়াগনস্টিক মেডিকেল আলট্রাসাউন্ড' বিষয়ে সার্টিফিকেট হাতে পান।

বিপত্তিটা ঘটে এরপরেই। ইয়াসমিন যখন তার পেশাগত শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেন, তখন 'আমেরিকান রেজিস্ট্রি ফর ডায়াগনস্টিক মেডিকেল সনোগ্রাফি' নামে একটি অলাভজনক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ তাকে জানায়, ইয়াসমিন নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষায় বসার উপযোগী নন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে পারেন, স্যানফোর্ড ব্রাউন একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হলেও তাদের আলট্রাসাউন্ড শিক্ষাসূচির অনুমোদন নেই। বিষয়টা তাকে সেই নিয়োগকর্তা উদাসীন হয়ে অবহিতই করেননি। (যদিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়, ইয়াসমিনের নিবন্ধনের সময় এই তথ্য তাদের দেওয়া কাগজপত্রের একটিতে উল্লেখ করা ছিল)। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অননুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রমের স্নাতকেরা ১২ মাসের প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শংসাপত্রের পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাবেন না। অথচ এই পরীক্ষা না দেওয়া থাকলে কোনো চাকরিদাতাই ইয়াসমিনকে চাকরি দিতে পারবে না।

ইয়াসমিন প্রায় ২০০ চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি এবং কানেকটিকাটের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের দপ্তরে দেখা করেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির পদায়ন ব্যবস্থাও ইয়াসমিনকে কোনো ধরনের ভরসা দিতে পারেনি। ইয়াসমিন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "ওই বিভাগের নারী কর্মী আমাকে বলেন, আমার জীবনবৃত্তান্ত বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছে। এই খাতে খুব বেশি চাকরি এখন নেই। কোনো সুযোগ পেলে জানানো হবে।" তবে সেই খবর ইয়াসমিনের কাছে আর কখনোই আসেনি।

ইয়াসমিন এখন চাকরিহীন। কিন্তু আলট্রাসাউন্ড সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ খোঁজা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ নেই। কারণ, ওই একটামাত্র ডিগ্রিই তার আছে। এদিকে তার নেওয়া ছাত্রঋণের সুদও চড়ছে। ইয়াসমিন প্রথাগত কোনো বিদ্যালয় থেকে নার্সিং বিষয়ে লেখাপড়া করতে আগ্রহী হন। কিন্তু স্যানফোর্ড ব্রাউন থেকে তার পাঠ্যক্রম অন্য বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু জীবন নির্বাহের জন্য ইয়াসমিনকে শিশু সহায়তা তহবিলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল, তাই তার পক্ষে আরেকটি ঋণ নেওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বলেন, "আমার সামলানোর জন্য একটা সংসার আছে, বাড়ির ভাড়া আছে, গাড়ির খরচ আছে, আর তার সঙ্গে আছে বিপুল ঋণের বোঝা। পুরো বিষয়টা আমার জন্য খুবই চাপের। তখন আমার মনে হতো, আবার স্কুলে গিয়ে অন্য কোনো বিষয় শিখি জীবিকার জন্য। কিন্তু আমার হাতে কোনো অর্থও ছিল না।"

সংকটাপন্ন অর্থনীতির আঘাতে জর্জরিত বিপুলসংখ্যক মানুষ

মার্কিন নাগরিক এখন আর্থিকভাবে লাভজনক পেশাগত শিক্ষার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন কলেজে চিকিৎসাবিষয়ক সহকারী, কম্পিউটার গ্রাফিকস এবং ফৌজদারি বিচার বিষয়ে কারিগরি ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হচ্ছেন। তাদের স্বপ্ন– সুন্দর জীবন এবং একটি ভালো চাকরি। কিন্তু তাদের বেশির ভাগের কপালে জুটছে অর্থহীন একটি ডিপ্লোমা ডিগ্রি এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা।

সরকারি তদন্ত আর বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নানান ধরনের অব্যবস্থাপনাকে স্পষ্ট করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অদক্ষ শিক্ষক, কোথাও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ করে না দেওয়া, প্রথাগত কলেজে ক্রেডিট স্থানান্তরের মিথ্যা আশ্বাস, ফোলানো-ফাঁপানো চাকরির আশ্বাস ইত্যাদি। সমালোচকদের কথা অনুযায়ী কখনো মামলার বাদী হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের স্নাতকেরা যেমন নতুন পেশায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি তারা ঋণের বোঝার নিচে চাপা পড়েন।

ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক 'ক্যারিয়ার কলেজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ৩ মিলিয়ন মার্কিন নাগরিক আর্থিকভাবে লাভজনক পেশা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত শিক্ষার্থী হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী। আপনারাও নিশ্চয় টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে, সাবওয়ে এবং ট্রেন স্টেশনে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং ভালো বেতনের চাকরির আশ্বাস ভর্তি বিজ্ঞাপনগুলো দেখে থাকবেন। পেশাগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের আকর্ষণ করার জন্য এ ধরনের কলেজ (এগুলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলও বলা হয়) তাদের পাঠদানের পরিবর্তনযোগ্য সময়সূচি, অনলাইনে ক্লাস এবং শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলে বিজ্ঞাপনে প্রচার করে। তারা ব্যাচেলর এবং গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির পেশাদার সনদও দিয়ে থাকে। বড় বড় সংস্থার মালিকানাধীন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার ব্যয় বিপুল হলেও তারা শিক্ষার্থীদের সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে শিক্ষাঋণ নিতে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে।

এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের রাজস্ব আয়ের ৯০ শতাংশই সংগ্রহ করে বিভিন্ন সরকারি বরাদ্দের খাত থেকে। আর এসব কারণে ১৯৭৬ সাল থেকে আর্থিকভাবে লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশের বেশি। ক্যারিয়ার কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী হ্যারিস মিলার মনে করেন, বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার কালে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। মিলার বলেন, "যখন থেকে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে, তখন থেকে আমাদের ব্যবসাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে বিপুল বেগে।" তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাজারে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো সেই ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করছে চাকরিহীনদের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে। তার ভাষায়, দেশের প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো "সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে অভিজাত", অন্যদিকে কমিউনিটি কলেজগুলোর বাজেটে চলছে কাটছাঁট। আমরা বলব, লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো সবার জন্য নয়। এসব বিদ্যালয় হার্ভার্ড বা স্ট্যানফোর্ডের বিকল্পও নয়। আমরা একটু ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে সেই শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিই, যারা মায়ের গর্ভে বসে মোৎজার্ট শোনেনি এবং স্কুলের তৃতীয় গ্রেডে পড়ার সময় থেকে স্যাট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়নি।"

এ বিদ্যালয়গুলো ২৯ বছর বয়সী ডিয়ানা রিভেরার মতো স্নাতক ডিগ্রিধারীদের সাফল্যের গল্প প্রচার করে। ডিয়ানা একদা ব্যবস্থাপনা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি শিকাগোর লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয় ওয়েস্টউড কলেজ ডাউনটাউন থেকে ফৌজদারি আইন বিষয়ে একটি ডিগ্রি নেন এবং বছরে ৩৭ হাজার মার্কিন ডলার বেতনের চাকরি পেয়ে যান। তার কাজ ছিল জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত কিছু কর্মীকে সহিংসতা প্রতিরোধবিষয়ক কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করা। ডিয়ানা স্বামী বিচ্ছিন্ন সন্তান পালনকারী একজন মা। তিনি ব্যক্তিগত, ফেডারেল ঋণ নিয়ে এবং অনুদানের মাধ্যমে তিন বছরে এই বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এতে তার ব্যয় হয়েছে ৬০ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার। ডিয়ানা বলেন, "আমি একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারকে সাহায্য করতে পারছি– এই অনুভূতিটা আমার জন্য অনেক বড়।"

কিন্তু ২০০৯ সালে ওয়েস্টউড ক্যাম্পাসের নয়জন সাবেক কর্মীর করা একটি মামলার পেছনে ৭ মিলিয়ন ডলার গুনতে হয় ন্যাশনাল ওয়েস্টউড কলেজের মূল মালিক আল্টা কলেসেকে। সেই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জানিয়েছিল যে বাজারে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন এই সম্ভাবনা ছিল ৫৫ শতাংশের কম। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধেই মামলাটি করা হয়।

২০০৫ সালে আমেরিকার শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক জন পি. হিগিন্স জুনিয়র কংগ্রেসকে অবহিত করেন যে গত ছয় বছরে তাদের দপ্তরে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, সেগুলোর মধ্যে ৭৪ শতাংশ ঘটনার সঙ্গে লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো জড়িত। শিক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের হার নিম্নমুখী। এ ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচি শেষ করার হার যখন ছয় বছরে ৩২.৬ শতাংশ, সেখানে সরকারি বিদ্যালয়ের হার ৫৪.৮ শতাংশ এবং বেসরকারি অলাভজনক বিদ্যালয়ে ৬৪.৫ শতাংশ।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব কলেজিয়েট রেজিস্ট্রার্স অ্যান্ড অফিসার্স-এর সহযোগী নির্বাহী পরিচালক বারমাক নাসিরিয়ান বলেন, "দু-একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই খাতে বাকিরা সবাই দ্রুত মুনাফা লাভের পথে ধাবিত হয়েছে।"

লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোকেও এই প্রতিষ্ঠান তাদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। তিনি বলেন, "যেসব শিক্ষার্থী নিজের জীবনের মান উন্নয়ন করতে এ ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের শেষ দৃশ্যটা সূচনার সময়ের চেয়েও খারাপ হয়। তারা একটি বিশাল অঙ্কের অভিশপ্ত ঋণের বোঝা কাঁধে নেয়। হাতে পায় মূল্যহীন সনদ। এভাবে ক্রমশ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তারা।"

গত বছর শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায়, লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর যারা ফেডারেল ছাত্র ঋণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে, তাদের এক-চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে গত তিন বছরে তাদের শিক্ষার্থীদের খেলাপি হওয়ার সংখ্যা ৩০ শতাংশ বা তার বেশি। পাশাপাশি এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যানের কথা প্রথাবদ্ধ স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে শোনা যায় না। লাভজনক ও অলাভজনক ৩১৬টি কলেজের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ঋণ শোধ করতে না পারার যে উচ্চ হার, তার মধ্যে কিন্তু শতকরা ৭৮ ভাগই লাভজনক শিক্ষার খাত থেকে এসেছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই ৭৮ ভাগের মধ্যে ২২টি কলেজ এভারেস্ট কলেজ চেইনের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে হাসপাতাল সহকারী, ফার্মেসি সহকারী, মাসাজ থেরাপির মতো কার্যক্রম রয়েছে। এভারেস্ট নামের কলেজটি বছরে ১.৩ বিলিয়ন ডলার আয় করলেও তাদের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঋণখেলাপি হয়। এদের মূল কোম্পানি কোরিন্থিয়ান কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের "অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত" শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছে, তারা শিক্ষার্থী ঋণের খেলাপি হার কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থদের বেতন-ভাতা শিক্ষা বিভাগ আইনি নির্দেশের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের জন্য আটকে দিতে পারে, তাদের আয়কর প্রত্যর্পণ ট্রেজারি বিভাগ বাজেয়াপ্ত করতে পারে আর তাতে তাদের ক্রেডিট স্কোর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে অর্থ ফেরত পাওয়ার মামলা করতে পারে অথবা ঋণ আদায়ের দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাকে দিতে পারে। বোস্টনের জাতীয় ভোক্তা আইন কেন্দ্রের আইনজীবী ড্যানি লুনিন বলেন, "এ ধরনের ঋণের অর্থ আদায়কারী সংস্থাগুলো সারা জীবন ঋণখেলাপিদের তাড়া করে ফেরে।" তার মতে, "এই ফাঁদ থেকে শিক্ষার্থীদের পালানোর পথ হচ্ছে স্কুলে ফিরে গিয়ে প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়া শেষ করে ভালো বেতনের চাকরি নেওয়া। কিন্তু এই ঋণ তাদের এখান থেকে বের হয়ে যেতে দিচ্ছে না।" বিশেষভাবে শিক্ষার্থীরা যখন ফেডারেল ঋণখেলাপি হয়ে যায়, তখন করদাতারা হিসাব-নিকাশ করতে শুরু করে দেয়; কারণ, এসব ঋণের জামিনদার তো স্বয়ং সরকার।

লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো লাভের অঙ্ক যতটা সম্ভব বাড়ানোর বিষয়ে তাদের মূল মালিক অথবা অংশীদারদের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু মালিকেরা এটাকে কোনো সমস্যা বলে মানতে রাজি নয়। ক্যারিয়ার কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের মিলার বলেন, "ধরে নিই, আমরা একদল অর্থলোভী ও কাঁদুনে লোক। ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে ক্রেতার সন্তুষ্টির ওপর। আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে নিম্নমানের শিক্ষা তাদের জন্য উপস্থাপন করতে থাকেন, তা আপনার জন্য স্বল্প মেয়াদে লাভজনক হলেও দিন শেষে আপনার ব্যবসার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।" সমালোচক বিশেষ করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মীরা চলমান এই প্রবণতার দ্রুত বৃদ্ধির পেছনের কারণ হিসেবে দিনের বেলা টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলোকে চিহ্নিত করেন। তারা মনে করেন, এ ধরনের বিজ্ঞাপন সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তাদের দরজায় টেনে নিয়ে আসে এবং জোরালো বিপণন কৌশল সেই মানুষদেরকেই শিকার করে, যাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র বেছে নেওয়ার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

ক্লারেন্স হার্মন ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালে ৯ মাসের জন্য স্যানফোর্ড ব্রাউন কলেজের হেজেলউড শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার আগে মিসৌরি রাজ্যের সেন্ট লুইসের মেয়র এবং পুলিশ প্রধান ছিলেন। তার ভাষায়, "আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমগুলো খুবই ব্যয়বহুল। বেশির ভাগ সময়ে শিক্ষকেরা ছিলেন অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ। কিন্তু তারপরেও সেখানে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগে থাকত। টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিষ্ঠানটির লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখে অল্প সময়ে ভালো চাকরি আর সুখী জীবনের প্রত্যাশায় তারা এখানে ভর্তি হতো।" হার্মন তাদের মূল কোম্পানি 'ক্যারিয়ার এডুকেশন করপোরেশন'-এর বেশ কয়েকটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তার ভাষায়, "ওই বৈঠকগুলোর একটিতেও লেখাপড়া বিষয়ে কোনো আলোচনা স্থান পায়নি। সেখানে মূল আলোচনার বিষয় ছিল টাকা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার নিয়ে কিছু আলোচনা তারা করত, তবে সেগুলো ছিল খুব জোরালো এলোমেলো বাতাসে বরফে মোড়া পাহাড়ে পদযাত্রা করার মতো।"

'ক্যারিয়ার এডুকেশন করপোরেশন'-এর একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউট, যেখানে ইয়াসমিন সোনোগ্রাফি নিয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই প্রতিষ্ঠান জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বড় ধরনের ধাক্কা খাবার পর নিজেদের মান রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। শিক্ষার্থীদের চাকরির সম্ভাব্যতা নিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া, চাকরির শুরুতে কর্মচারীদের বেতন, শিক্ষকদের মান, প্রশিক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি এবং ক্রেডিট স্থানান্তর নিয়ে নানা অভিযোগে এই কোম্পানি একাধিক মামলার মুখোমুখি হয়। শিক্ষা বিভাগ, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বিচার বিভাগও তাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত চালায়। যদিও তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। 'সিবিএস ৬০ মিনিট' এবং শিক্ষাবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্রনিকল অব হায়ার এডুকেশন' বিষয়টি নিয়ে অনুষ্ঠান এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০০৫ সালে শিক্ষা বিভাগ "আইন লঙ্ঘনের ইতিহাস আছে" এই অভিযোগে এই কোম্পানির নতুন শাখা খোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগের অভিযোগ ছিল, সরকারের অর্থনৈতিক নিয়মনীতি

লঙ্ঘন এবং তাদের স্নাতকদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। 'সাউদার্ন অ্যাসোসিয়েশন অব কলেজ অ্যান্ড স্কুল' ২০০৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 'আমেরিকান ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইউনিভার্সিটি' নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ভর্তি এবং বিপণন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়। এই অ্যাসোসিয়েশন তখন অনুমোদন সংস্থা হিসেবে কাজ করছিল।

ক্যারিয়ার এডুকেশন কর্পের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি জেফ ল্যাশে অবশ্য জোর গলায় বলতে চান, তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯০টি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা উচ্চ মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, "আমরা যে ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তা যদি আমাদের শিক্ষার্থী ও কর্মীদের কোনো কাজে না লাগত, তাহলে আমরা এভাবে বিকশিত হতে পারতাম না।" তিনি দাবি করেন, "স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউটের শত শত স্নাতক এখন আলট্রাসনোগ্রাফি সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।" তিনি ক্লারেন্স হার্মনকে "অসন্তুষ্ট সাবেক কর্মী" আখ্যা দিয়ে বলেন, "আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। শিক্ষার্থীদের সাফল্যই আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।" নিউ আমেরিকান ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'হায়ার এডুকেশন ওয়াচ' নামে একটি জননীতিবিষয়ক ব্লগে স্টিফেন বার্ড বাস্তবে গোটা পরিস্থিতি আরও জটিল বলে মন্তব্য করে বলেছেন, "সংগঠনটির নতুন ব্যবস্থাপনা কাঠামো সমস্যায় আক্রান্ত কিছু স্কুল বন্ধ করার মতো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তাদের শিক্ষা কার্যক্রমগুলোর মান নিয়ে এখনো উদ্বেগ রয়েছে।"

লাভজনক পেশা শিক্ষার নিম্নমানের বিদ্যালয় নতুন নয়। কুড়ি বছর বা তারও বেশি সময় আগে কিছু অপরাধী দল ফেডারেল সরকারের শিক্ষার্থী ঋণের টাকা আত্মসাতের পরিকল্পনা করে। ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার শিক্ষার অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ডেভিড ডব্লিউ ব্রেনিমেন বলেন, "ব্যাপারটা হলো ট্রাক চালনা শিক্ষার জন্য আপনি শিক্ষার্থী ঋণ নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন, অথচ দেখা গেল তাদের ট্রাক-ই নেই।" ১৯৯২ সালে কংগ্রেসে প্রণীত একটি আইনের বলে এ ধরনের গজিয়ে ওঠা বহু স্কুল বা বিদ্যালয় ফেডারেল সরকারের অর্থায়ন ও অনুমোদন– দুই-ই হারায়।

কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি। তখনো এ ধরনের কঠিন সরকারি নীতিমালার কার্যকারিতা ছিল শিথিল। রাষ্ট্রের তদারকির বিষয়টা ছিল একধরনের জোড়াতালির মতো। মার্কিন কংগ্রেসে স্পষ্টভাষী সংস্কারপন্থী ম্যাক্সিন ওয়াটার্স বলেন, "মানুষকে নির্যাতন করার পদ্ধতিটা একই রকম, যেমন মিথ্যা বক্তব্যে ভরা বিজ্ঞাপন, ভর্তির ক্ষেত্রে নানান কৌশল, আজগুবি সব পাঠদান; যা কোনো চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না এবং উল্টো শিক্ষার্থীদের পিঠের ওপর চাপিয়ে দেয় ঋণের বোঝা, যা তারা কোনো দিন পরিশোধ করতে পারবে না।"

'ক্যালিবার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত ৫৫০ শিক্ষার্থীর জন্য একটি বিদ্যালয়। সেখানে হাসপাতাল সহকারী, রোগীদের বিল, রেকর্ড এবং অন্যান্য বিষয় দেখাশোনার জন্য সহকারী এবং ট্রাভেল এজেন্ট পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গোয়েন্দারা অনুসন্ধান চালিয়ে এখানেও অদক্ষ শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপচে পড়া ভিড় এবং অননুমোদিত শিক্ষণ পদ্ধতির সেই একই চিত্র দেখতে পান। 'নিউইয়র্ক স্টেটস ব্যুরো অব প্রিপারেটরি স্কুল সুপারভিশন' নামে সংস্থাটির পরিচালক ক্যারল ইয়েটস তিন বছর ধরে পরিচালিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,"শ্রেণিকক্ষগুলো দেখে মনে হয়েছে, সেখানে আনন্দ উৎসব করার মানসিকতা বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি একটা কিছু খাবার এনে সবার মধ্যে বিতরণ করে, তাহলে তার কপালে পরীক্ষায় 'এ' জুটে যাবে। নিউইয়র্কের ব্রংকসে 'ভোকেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (আইভিটিডি) নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, পেশাদার নার্সের ভুয়া সনদের জোরে একজন স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্সে পাঠদান করাচ্ছেন। নিউইয়র্কের অঙ্গরাজ্য শিক্ষা বিভাগ ২০০৭ সালে আইভিটিডি এবং ২০০৮ সালে ক্যালিবার নামের বিদ্যালয়টি বন্ধের নির্দেশ দেয়।

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর লাভজনক বিভিন্ন ক্যারিয়ার কলেজ ওই ট্রাক চালনা প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ের মতো ট্রাক ছাড়াই প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো প্রত্যক্ষ দুর্নীতি বেশি দিন অব্যাহত রাখেনি। ব্রেনম্যানের ভাষায়, "তারা কিন্তু এখনো টাকা তৈরির যন্ত্র হিসেবেই কার্যকর রয়েছে। কারণ, ওয়াল স্ট্রিট তাদের বিকাশমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে। আর এই সুবিধা পেয়েই তারা আইন ভঙ্গ করার সুযোগ নেয়।"

এভাবে আরও মুনাফার আশায় লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো বিপণনে প্রচুর বিনিয়োগ করে। 'ক্রনিকলস অব হায়ার এডুকেশন'-এর মতে, বিজ্ঞাপনের জন্য এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে থাকে। অথচ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অথবা প্রশিক্ষণের জন্য ভালো যন্ত্রপাতি কেনার সময় তারা এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে না।

ওয়েন্ডি ওয়ালকটের ব্রাউন ম্যাকি কলেজের অভিজ্ঞতাটাও ভালো নয়। ৩৩ বছর বয়সে ওয়েন্ডি ওই কলেজের মেরিলভিল ক্যাম্পাসে ভর্তি হন হাসপাতাল সহকারীর কাজে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। তখন ২০০৭ সাল। ওয়েন্ডি একটি স্কুলে খাবার বিতরণের কাজ করতেন। তিনি চাইছিলেন নিজের পেশা পরিবর্তন করতে। ওই স্কুল থেকে তাকে সংক্ষিপ্ত ক্লাস, দ্রুততম সময়ে শেষ হওয়া কোর্স আর বাহ্যিক প্রশিক্ষণের জন্য তার বাড়ির কাছে রোগীদের সঙ্গে কাজ করতে পারার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ওয়েন্ডিকে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার কথা বলে

ভর্তি হওয়ার জন্য তাড়া দেওয়ায় ওয়েন্ডিও রাজি হয়ে যান। দুই সন্তানের মা ওয়েন্ডি তখন বলেছিলেন, "ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও আমি ভর্তি হব। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য ভালো কিছু করার এটাই সময়।"

ওয়েন্ডির ভাষায়, প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রত্যাশার ফারাকটা বুঝতে তার বেশি সময় লাগেনি। ওয়েন্ডি ভর্তি হয়ে দেখতে পান, গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলোতে সামর্থ্যের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে, আর শিক্ষকেরা পাঠ্যবই দ্রুত পাঠ করেই দায়িত্ব শেষ করছেন। তিনি বলেন, "সেখানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি ছিল পুরোনো অথবা বিকল। প্রশ্ন করলে কর্তৃপক্ষ উত্তর দিত, তারা যথাযথ সরবরাহ এখনো পাননি।"

ওয়েন্ডি বলেন, "ইলেকট্রন সেফালোগ্রাম সেন্সর প্যাড যন্ত্রটি একজন ব্যক্তির ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমাদের যন্ত্রটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে দিত। ইনজেকশন দেওয়া শেখানোর কাজে ব্যবহৃত পুতুলগুলো এত বহুল ব্যবহৃত ছিল যে সেগুলোর হাতে কখনো শিরা খুঁজে পাওয়া যেত না। এমনকি আমরা যখন একে অপরের ওপর ইনজেকশন দেওয়া অনুশীলন করেছি, তখন স্যালাইনের অপ্রতুলতার কথা বলে আমাদের দুবারের বেশি ইনজেকশন দিতে দেওয়া হতো না।"

তবে ওয়েন্ডির মতে শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন যে ভালো ছিলেন না এমন নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তারাও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে 'অ্যালাইড-হেলথ ডিপার্টমেন্ট'-এর প্রধান ডেভিড স্কোল বলেন, "আমার পরীক্ষাগারে একটি অটোক্লেভ (যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়) নষ্ট ছিল, কিন্তু সেটা সারানো হচ্ছিল না। কিন্তু তারপরেও শিক্ষার্থীরা সেই যন্ত্র চালাতে জানে এমন সনদ পেয়ে যাচ্ছিল। স্কোল তার গবেষণাগারের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমার গবেষণাগারে দুটো ব্লাড সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র নষ্ট। এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে গেলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টা নিয়ে যতবার অভিযোগ জানিয়েছি, ততবারই শুনতে হয়েছে, এ ধরনের যন্ত্রের আমার প্রয়োজন নেই, অথবা এগুলোর ক্রয়মূল্য আকাশছোঁয়া।"

বিভিন্ন হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করার জন্য শিক্ষানবিশ পাঠানোর তালিকা তৈরি করে রাখা ছিল স্কোলের কাজের অংশ। পরে তিনি দেখেছেন, 'ব্রাউন ম্যাকে' বিদ্যালয় থেকে আসা প্রার্থীদের অনেক হাসপাতাল গ্রহণ করত না। তাদের অভিযোগ ছিল, ব্রাউন ম্যাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশিক্ষণই দেওয়া হয় না। ব্রাউন ম্যাকের মূল কোম্পানি হচ্ছে 'এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট কর্প', যারা বছরে আয় করে ২ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তারা রাজি হয়নি। তবে পরে চারজন শিক্ষার্থী এবং একজন সাবেক প্রশিক্ষক বিষয়গুলো নিয়ে মুখ খোলেন। ওয়েন্ডিকে তার বাড়ির কাছে একটি হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে চলাচলে অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিদের একটি ডে-কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়, যেখানে রোগীদের সঙ্গে সারা দিনেও তার দেখা হতো না। তার কাজ ছিল কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে অপেক্ষমাণ ওয়েন্ডি এখনো একটি চাকরি জোগাড় করতে পারেননি। ওয়েন্ডি বলেন, "এখন আমার একটাই আশা, কেউ যদি আমাকে তাদের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে কাজ করতে বলত!"

লাভজনক ক্যারিয়ার কলেজ বেশি ব্যয় করে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে। যারা বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারে, তাদেরকে পুরস্কৃতও করা হয়। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা অনুসরণ করা বেআইনি। কিন্তু কোম্পানিগুলো যোগাযোগ-দক্ষতা বা কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ সামনে এনে বিষয়টা এড়িয়ে যায়। এই ব্যবস্থার সমস্যা হচ্ছে, যারা কাজটা করেন, তারা সবাই তো মানুষ। যখন তারা দেখেন, বেশি বেশি শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে পারলে তাদের পকেটে আসা অর্থের পরিমাণ বাড়ছে, তখন বিপণন প্রতিনিধিদের মতো তারাও ব্যবসা বাড়াতে তৎপর হবেনই। তারা তখন শিক্ষার্থীদের পাঁচ অঙ্কের বেতনের চাকরি, স্কুলের ক্রেডিট ঐতিহ্যবাহী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরের গল্প শোনাতে থাকেন, যা কখনোই বাস্তবে ঘটে না। তারা সরল শিক্ষার্থীদের সামনে চাকরি পাওয়া এবং পড়াশোনা শেষ করা শিক্ষার্থীদের হার বাড়িয়ে দেখিয়ে ফর্ম ভালো করে না পড়েই স্বাক্ষর করতে উৎসাহ জোগান।

দেশের নামকরা লাভজনক ক্যারিয়ার কলেজগুলোর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী ভর্তির গোপন কৌশল ব্যবহারের অভিযোগ আছে। ২০০৩ সালে শিক্ষা বিভাগ ইউনিভার্সিটি অব ফিনিক্সের বিরুদ্ধে তদন্ত করে। আমেরিকা ও কানাডা মিলে এই ফিনিক্সের ২০০ শাখা রয়েছে। সেই তদন্ত প্রতিবেদনে হৃদয়বিদারক সব তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, ওই সব বিদ্যালয়ে শুধু কে কয়জন শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারল, তার ওপর ভিত্তি করে কীভাবে ভর্তিবিষয়ক প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করা হয় অথবা শাস্তি দেওয়া হয়। সাক্ষাৎকার দেওয়া এই প্রতিনিধিদের মাঝে শতকরা ৭২ জন জানান, সংখ্যাটাই তাদের কাছে মূল বিষয়। ক্লাসের বেঞ্চে কয়জন শিক্ষার্থী বসল, সেটাই আসল, অন্য কিছু নয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যারা বেশি শিক্ষার্থী আনতে পারে, তাদের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকে মোটা অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি, স্কি খেলার টিকিট আর স্পা সেন্টারের লোভনীয় প্যাকেজ। অন্যদিকে অসফল প্রতিনিধিরা মুখোমুখি হয় চাকরি হারানোর হুমকির।

ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কর্মচারী এবং কাগজপত্র সাক্ষ্য দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের 'আগ্রাসী বিপণন' নীতিকে উৎসাহিত করেছে। ৩৮ বছর বয়সী রেবেকা মেকোভার ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কাজ করতেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে ক্যাম্পাসে। তিনি বলেন, "আমাদের প্রশিক্ষকেরা বলতেন, শিক্ষার্থীদের কষ্টের জায়গাটা খুঁজে বের করে ক্ষতস্থানের ওপরের চামড়াটা ছিঁড়ে ফেলো এবং আহত জায়গায় আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিতে থাকো যতক্ষণ না শিক্ষার্থীরা ব্যথায় কেঁদে ওঠে।" রেবেকার মনে হয়েছে যে মানুষটিকে তিনি এভাবে ভর্তি হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন, সে তাকে একজন ভবিষ্যতের খারাপ মা বলেই ভাববে হয়তো। রেবেকা এখন আর চাকরি প্রদানকারীর কাজটা করেন না। তবে তিনি এখনো ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যান এবং তার ভাষায় গুণগত মান বিবেচনায় সেখানকার প্রশিক্ষণ অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়।

গত ডিসেম্বরে ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো গ্রুপ; যাদের আয় বছরে চার বিলিয়ন ডলার, তাদের বিরুদ্ধে করা একটি মামলা নিষ্পত্তির জন্য ফেডারেল সরকারকে ৬৭.৫ মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হয়। তারা এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য উকিলের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয় ১১ মিলিয়ন ডলার। ভর্তিবিষয়ক প্রতিনিধিদের শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যার বিপরীতে কম টাকা দেওয়ার অভিযোগে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ তারা দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য কোম্পানির কর্মকর্তারা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা দীর্ঘস্থায়ী আইনি যুদ্ধ এড়ানোর জন্যই এই মামলা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। কোম্পানির মুখপাত্র সারা জোন্স বলেন, "শুধু এই ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়েই তারা ভর্তিবিষয়ক প্রতিনিধিদের ক্ষতিপূরণ গোনেননি; তাদের যোগাযোগ-দক্ষতা, গ্রাহকসেবা, বিবেচনা এবং শিক্ষার্থী ধরে রাখার যোগ্যতার কথা বিবেচনা করেও এই মামলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।" সারা জোন্স বলেন, "এই প্রতিনিধিরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাই তারা জানেন, শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম উপদেশ এবং সাহায্য কোনটা হবে। ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরিকল্পনা করা হয় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে।"

এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও একই ধরনের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে। গত বছর 'আলটা' নামক কোম্পানিটির ওয়েস্টউড কলেজের ভর্তি প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অযোগ্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ দেওয়ার এবং তাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং শেখার পাঠ্যসূচিতে ভর্তি করার জন্য ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই প্রক্রিয়া তাদের অঙ্গরাজ্যের ছাড়পত্র পাওয়ার পরীক্ষায় বসার জন্য যথাযথ ছিল না। ওয়েস্টউডের মুখপাত্র ক্রিস্টিনা ওয়েরিংটন বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, আমরা সব সময় আইনগত ও নীতিগতভাবে সঠিক অবস্থানে আছি। আমাদের কোম্পানি দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াইয়ের পথ এড়ানোর জন্যই মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "ভর্তি প্রতিনিধিদের স্বচ্ছ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের বেছে নেওয়া উচিত, যাদের সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশি। আমাদের ভর্তি প্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্নাতক কোর্সের জন্য ভর্তি করা।"

ক্রিস্টিনার এই বক্তব্য কিন্তু জারা ক্রাউলির কাছে একটু বিস্ময়কর ঠেকেছে। ২০০৭ সালে ওয়েস্টউড ক্যাম্পাসে জারা শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। (এখন তিনি কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের একটি গণবিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন।) জারা মনে করতে পারেন, ওয়েস্টউডের কোনো কোনো পাঠ্যসূচির সঙ্গে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা না মিললেও তাকে দ্রুত ভর্তি করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, "কেউ যদি চিকিৎসক হতে চান, তাকে হাসপাতাল সহকারীর জন্য প্রযোজ্য কার্যক্রমে ভর্তি হতে বলুন।" জারা তার পরিচালকের একটি বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, "যদিও ওয়েস্টউডের ক্রেডিট সাধারণত অন্য প্রথাসিদ্ধ স্কুলে স্থানান্তর করা যায় না, তারপরেও ভর্তি হতে আসা কেউ যদি আরেকটু ভেবে দেখার কথা বলেন, তাহলে তাকে বলতে হবে, আপনি কি কিছুই করবেন না? আপনিই তো বলেছিলেন, ম্যাকডোনাল্ডের মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চান না।"

কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোকে আরও দায়িত্বশীলতার আওতায় আনার জন্য উদ্যোগও নিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল জেরি ব্রাউন কোরিন্থিয়ান কলেজের বিরুদ্ধে ৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের মামলা রফা করার উদ্যোগ নেন। ওই অঙ্গরাজ্যে কোরিন্থিয়ান কলেজের ১৪টি শাখা রয়েছে। জেরি ব্রাউনের অভিযোগ ছিল, বিদ্যালয়টি তাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার শতকরা হার অনেক বাড়িয়ে দেখিয়েছে। পাশাপাশি তারা স্নাতকদের চাকরি পাওয়ার পর সূচনা বেতন নিয়েও মিথ্যা বলেছে। তিনি এ-ও অভিযোগ করেন, কোরিন্থিয়ান কলেজ স্নাতকদের সংখ্যা এবং তাদের চাকরি পাওয়ার শতকরা হার নিয়ে সরকারের কাছে যে তথ্য পাঠিয়েছে, সেটাও ছিল বানানো। কোরিন্থিয়ান কলেজ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অর্থ ফেরত এবং ঋণ বাতিল করা বাবদ ৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার এবং সরকারকে ৭ লাখ ডলার জরিমানা দেয়। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেন, জরিমানার অর্থের এই অঙ্কও যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনি। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পর কলেজটি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে একই ধরনের মামলা মধ্যস্থতা করে ফেলে। দুটি ক্ষেত্রেই তারা অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে।

প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল, ভর্তি করাতে পারা শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ভর্তি প্রতিনিধিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেটাকে আরও সুদৃঢ় করা। বুশ প্রশাসনের সময়কার ১২টি প্রবিধানকে শিক্ষা বিভাগের ত্রুটি বলে মনে

করা হয়। শিক্ষা বিভাগ এই রন্ধ্রগুলো বন্ধ করতে কিছু আইনের সহায়তা নিচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বিদ্যালয়গুলোতে বছরে দুবার ছাত্র ভর্তি প্রতিনিধিদের বেতন বাড়ানোর বিষয়ে নতুন আইনে বলা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই সক্রিয় থাকবে, যতক্ষণ না শুধু শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিষয়টা ঘটবে। শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়গুলোর ছদ্ম বিপণন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও কঠোর আইনের ওপর জোর দেয়।

অনেক শিক্ষার্থী আবার সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরাই আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গত বছর ওয়েস্টউড কলেজের চার প্রাক্তন শিক্ষার্থী এখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়া শিক্ষার্থীদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনার ভ্রান্ত উপস্থাপনা, তাদের ক্রেডিট স্থানান্তরের সম্ভাব্যতা, শিক্ষার্থীদের ঋণের ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে উচ্চ হারে সুদ নেওয়া ইত্যাদি অভিযোগে সালিসি মামলা করেন। এ রকম আরও অনেক শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও তাদের খারাপ অভিজ্ঞতাগুলো বাদীপক্ষের আইনি প্রতিষ্ঠান টামপাকে জানায়। প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য আইনজীবী জিলিয়ান এস্টেস বলেন, "শিক্ষার্থীরা আমাদের বলেছেন, চাকরি পাওয়ার বদলে তারা হাসির খোরাক হয়েছেন।" জিলিয়ান বলেন, স্নাতক ডিগ্রি পেয়ে এই শিক্ষার্থীরা যখন চাকরির জন্য গেছেন, চাকরিদাতারা তাদের বলেছেন, "ভালো চেষ্টা করেছেন আপনি। এবার কলেজে গিয়ে আমাকে একটা ফোন করবেন।" ওয়েস্টউডের প্রতিনিধি ইয়ারিংটন উল্টো জিলিয়ানকেই অনলাইনে অ্যাম্বুলেন্সের মতো শিক্ষার্থীদের পেছনে তাড়া করার অভিযোগ তুলে ২০০৮ সালের জুলাই থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। সেখানে তারা দাবি করেছেন, তাদের বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি শেষ করা প্রায় ৭৬ শতাংশ যথাযথ চাকরির সন্ধান পেয়ে গেছে।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ আইনজীবীর কাছে যাচ্ছেন। মিচেল ফ্রিম্যানের বয়স ৩২ বছর। তিনি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রোডাকশন বিভাগে কাজ করতেন। কিন্তু সেখানে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে 'ক্যারিয়ার এডুকেশন কর্প'-এর আমেরিকান ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইউনিভার্সিটিতে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং বিষয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হন। তার আশা ছিল, দুই বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করার পর তিনি টেলিভিশন স্টুডিও ডিজাইন করার ভালো কাজ পেয়ে যাবেন।

২০০৩ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে যান। সেখানে তাকে বলা হয়, কীভাবে তিনি পাঁচ অঙ্কের ওপরে এবং ছয় অঙ্কের নিচের সীমানার বেতনে সহজে চাকরি পেয়ে যাবেন। তারা মিচেলের কাছে জানতে চায়, "আপনি শিক্ষানবিশি করতে চান? আমাদের তালিকায় ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানের নাম আছে। আপনি চাকরি চান? আমাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন, তারা আপনাকে খুশি হয়ে কাজ দেবেন।" তারা আরও বলেন, "এটি এমন একটি বিদ্যালয়, যার সুনামের কারণে আপনাকে অনেক চাকরির আহ্বান ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ, সবাই আপনাকেই চাকরি দিতে আগ্রহী হবে।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের শিক্ষানবিশি কাজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। তখন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়, স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর কাজের ব্যাপারে তারা সহায়তা করতে পারবে না। প্লেসমেন্ট অফিসে ঢুঁ মারার পথে মিচেলকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা বলতেন, "দুঃখিত, আমাদের কাছে এখন কোনো সুযোগ নেই।" ওই রকম কয়েকবার যাওয়ার পর মিচেলের বমি পেত। শরীর খারাপ করত পরাজয়ের হতাশায়। চার বছর পর তার বেকার বেনিফিটও ফুরিয়ে যায় এবং লেখাপড়ার জন্য মিচেল উল্টো ৬৩ হাজার ডলারের দেনায় জড়িয়ে পড়েন। তখন 'এডুকেশন কর্প' তাদের বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র ল্যাশে জানান, 'মান নিয়ে আপত্তির' কারণে নয়, 'বাজারের চাহিদার অভাবে' তারা গুটিয়ে নিচ্ছেন।

মিচেল ফ্রিম্যান নিজের ছোট ফ্ল্যাটটিতে ঘুরতে ঘুরতে ভাবতেন, আর কী কী ঘর থেকে বিক্রি করা যায়। তার ভাষায়, "জানালা দিয়ে আমি দেখতাম, রাস্তায় গৃহহীন মানুষ প্ল্যাকার্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে লেখা, "সাহায্য করুন।" মিচেল ভাবতেন, এই অবস্থায় পৌঁছাতে তার হাতে কতটা সময় আছে? তবে তিনি পদক্ষেপ নেন। ২০০৭ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার আইন প্রণয়ন-সম্পর্কিত কমিটির সামনে হাজির হন এবং এ ধরনের বিদ্যালয়ের বিষয়ে সরকারি তদারকি আরও শক্ত করার আবেদন জানান। তিনি কমিটিকে বলেন, "আমাদের সবাইকে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, আমরা স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কাজ দেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অথচ আমরা এখন বেকার এবং আতঙ্কিত এক জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের মাথার ওপর চেপে বসেছে ভয়ানক ঋণের বোঝা।" পরে মিচেল এবং তার একজন সহপাঠী মিলে একটি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তিনি বলেন, "আমি প্রতিবাদ করেছি; কারণ, কাউকে তো সাহস করে বলতে হবে। আমাকে কথা বলতে হবে তাদের জন্য যারা প্রতিবাদ করতে ভয় পায় এবং জানে না কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। হাজার হাজার মানুষ এ ধরনের অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। এগুলো বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।"

পরিশিষ্ট

ব্যারি ইয়োম্যান

লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর বাণিজ্য এবং গরিব শোষণের কারবার নিয়ে আমাকে দুবার লিখতে হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রথম প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ‘এক্সপোজার’ পত্রিকায়। দ্বিতীয়বার ‘গুড হাউসকিপিং’-এর জন্য। প্রায় এক দশক পর পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী লাভজনক পেশা শিক্ষার কলেজগুলোকে নিয়ে আবারও প্রতিবেদন প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। তারা মনে করছিলেন, সমস্যাটি একেবারে নির্মূল হয়নি এবং পাশাপাশি তারা দেখতে চাইছিলেন, ইন্টারনেটের যুগ মানুষ ঠকানোর নতুন কোনো জাল তৈরি করেছে কি না। আমার প্রতিবেদন প্রমাণ করেছে, সমস্যাটি সমাজে রয়ে গেছে, তবে অবশ্যই সেই কাহিনিতে এসেছে নতুন বাঁক। ১৯৯০ সালে এ ধরনের বিদ্যালয়গুলোর একধরনের কুটিরশিল্পের অবয়ব ছিল। কিন্তু নতুন সময়ের নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ শক্তিশালী করপোরেশনগুলো। সেখানে আগেকার সেই নির্মম নির্যাতনের চিত্র সরে গেলেও এদের হাতে সমস্যাটি আরও গভীর হয়েছে।

সাধারণত আমি যখন একটা প্রতিবেদন তৈরির জন্য অনুসন্ধান শুরু করি, তখন আমার প্রথম লক্ষ্য হয়, সে বিষয়ে নথিপত্র কী আছে তা জানা। এ ক্ষেত্রে আমি প্রথম নথির সন্ধান পাই ‘লেক্সিস-নেক্সিস’ নামে একটি তথ্যাগার বা ডেটাবেইজ থেকে। সেখানে আমি কিছু নিবন্ধও পেয়ে যাই। ওই তথ্যাগার থেকে আমি খবরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনুষ্য সূত্রের নাম এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণও পাই। এই তথ্যাগারে অনুসন্ধান চালানোর পাশাপাশি আমি বেশ কিছু বিশেষায়িত গণমাধ্যমে প্রকাশিত নিবন্ধ (যেমন ‘ক্রনিকল ফর হায়ার এডুকেশন’) নিয়ে কাজ করি; পাশাপাশি ‘নিউ আমেরিকা ফাউন্ডেশনস হায়ার এডুকেশন ওয়াচ’ নামে খুবই পেশাদার একটি ব্লগে প্রকাশিত লেখার সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালাই। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্টও আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ন্যাশনাল কনজিউমার ল সেন্টার’ এবং সরকার পরিচালিত সমীক্ষা।

লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর আয়ের বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক চিত্র জানার জন্য আমি দেশের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে, তাদের সরকারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নেওয়া বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ এবং মামলা বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে হয়। আমি প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব তথ্যের জন্য ওয়েবসাইটে সন্ধান চালাই।

শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থী ঋণখেলাপিদের আনুপাতিক হারবিষয়ক তথ্য এক্সেল ফরমেটে ডাউনলোড করে নিই। (এই লিংক আমি হায়ার এডুকেশন ওয়াচে খুঁজে পাই।) সংখ্যাটা হায়ার এডুকেশন ওয়াচ আগেই প্রক্রিয়াকরণ করে রাখলেও আমি আবারও কাজটা নিজে করি।

আমি চারভাবে মামলার বিবরণগুলো পাই:

১. কিছু ক্ষেত্রে মামলার বাদীপক্ষের উকিল উভয় পক্ষের মামলার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সব নথিপত্র আমাকে পাঠায়।

২. কিছু কিছু মামলার আবেদন অনলাইনে পাঠানো হয়।

৩. আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে একটি ফৌজদারি মামলার আবেদন আমাকে পাঠানো হয়।

৪. কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলায় আমি ‘পিএসিইআর’ নামে একটি সরকারি সংস্থার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন মামলার নথিপত্রের ডেটাবেইজের সহায়তা নিয়েছি। সেখানে আমাকে ন্যূনতম মাশুল দিতে হয় পিডিএফ ফরম্যাটে নথিপত্র ডাউনলোড করার জন্য।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের ব্যাপারে তদন্ত প্রতিবেদনের বাড়তি তথ্য পেতে আমি ওই রাজ্যের সংস্থাগুলোকে চিঠি পাঠিয়েছি। ফ্লোরিডা মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির নথিপত্রের জন্য ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে চিঠি পাঠিয়েছি। নিউইয়র্কের 'ক্যালিবার' নামে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং 'দ্য ইনস্টিটিউট ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর নথিপত্রের জন্য তাদের অনুরোধ জানিয়েছি। এ ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রথমে আমি তাদের ফোন করেছি এবং পরে ই-মেইল পাঠিয়েছি। পরে জনসংযোগ কর্মকর্তা আমাকে সব তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যের স্বাধীনতাসংক্রান্ত একটি আইন রয়েছে। কিন্তু আমাকে সেই আইন ব্যবহার করতে হয়নি। তবে 'ক্যালিবার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' এবং 'দ্য ইনস্টিটিউট ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার জন্য আমাকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের 'তথ্যের স্বাধীনতা' আইনের অধীনে আবেদন করতে হয়েছে। রাজ্য আইনে সংশোধিত সকল তথ্যই আমি ধীরে ধীরে পেয়ে গেছি। তবে অঙ্গরাজ্য সংস্থাগুলো তাদের বিশেষাধিকার প্রয়োগের কারণে নথিগুলো পেতে আমার এক মাস দেরি হয়েছে। আমাকে অবশ্য প্রয়োজনের তালিকাটিকেও কিছুটা ছোট করে আনতে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সব অভিযোগ এবং অঙ্গরাজ্যের পক্ষ থেকে পরিচালিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন এত দীর্ঘ ছিল যে সেগুলো সব পেতে হলে আমার রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা পার হয়ে যেত।

সব নথিপত্র পাঠ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি কম্পিউটারে একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইলে সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলি। তথ্যগুলোকে 'সাধারণ' এবং 'নির্দিষ্ট বিদ্যালয়' এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি।

এসব নথিপত্রে উল্লেখ করা ব্যক্তিরা হয়েছে আমার সোর্স। তবে এই তালিকা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এদের মধ্যে আছে:

১. প্রতিবেদনগুলোর লেখক।

২. বাদী, আইনজীবী, শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মী, বিশেষজ্ঞ এবং পত্রিকার খবরে প্রকাশিত বিদ্যালয়ের মুখপাত্রদের নাম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ।

৩. যেসব সাবেক কর্মী ও শিক্ষার্থীর নাম মামলার আবেদনে আছে।

৪. যেসব প্রাক্তন শিক্ষার্থীর নাম অঙ্গরাজ্য পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

৫. ripoffreport.com -এর মতো ওয়েবসাইটে অভিযোগ জানিয়ে যেসব সাবেক কর্মী ও শিক্ষার্থী পোস্ট দিয়েছেন।

৬. অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে পরিচিত সাবেক কর্মী, শিক্ষার্থী এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ।

আমার সব কাজ গোছানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি একটানা এবং একনিষ্ঠভাবে। কম্পিউটারে এমন একটি ফাইল তৈরি করি, যা ছিল নথিপত্রের ফাইলের অনুরূপ। দুই জায়গাতেই আমি সব নথিপত্র সুসজ্জিত করে রাখি। সেখানে কিছু ফোল্ডার ছিল বিষয়ভিত্তিক, (যেমন, অ্যাক্রিডিটেশন, ফেডারেল এইড, স্টেট রেগুলেশন-নিউইয়র্ক ইত্যাদি।) আবার কিছু ফোল্ডার ছিল ঘটনাভিত্তিক, (যেমন, ক্যালিবার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, 'কেস– ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়, কেস– ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়– হেন্ডা মামলা' ইত্যাদি)।

মনে রাখতে হবে, এমন একজন বিশেষজ্ঞ খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন, যিনি আপনার বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ফেডারেল এবং অঙ্গরাজ্যের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর বিষয়ে জানাতে পারবেন। অনুসন্ধান করার জন্য আপনার কাছে যদি প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা করা থাকে, তাহলে সেই তালিকা নিয়ে আপনি ওই সংস্থাগুলোর কাছে হাজির হয়ে তাদের কাছে কী ধরনের নথিপত্র আছে, তা জানতে পারবেন। আমি সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে কিছুটা উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু ওই সংস্থা আসলে তথ্যের খনি ছিল।

আমি ক্রেতাস্বার্থবিষয়ক অভিযোগের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ওয়েবসাইট যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। এসব সাইট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ripoffreport.com এর কথা। এই ওয়েবসাইট তাদের সঙ্গে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। তবে এ ধরনের সাইটের তথ্যের অনুসন্ধান বেশ ধীরগতির হয়ে থাকে। কিছু অভিযোগ প্রায় সময়ই অস্পষ্ট হয়; কিছুর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। কিছু অভিযোগকে সুনির্দিষ্ট মনে হলেও অভিযোগকারী আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। তবে কেউ কেউ আমার অনুসন্ধানের উত্তর দিয়েছেন। তারা হলেন ইয়াসমিন ইসা ও ডেভিড শোল।

এদের দুজনের মধ্যে ইয়াসমিন ছিলেন খুবই বাধ্য উত্তরদাতা এবং কার্যকর সূত্র। আমি একাধিকবার তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি। প্রতিবারই তার বক্তব্য ছিল আগের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইয়াসমিন আমাকে জানান, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে চাকরিদাতারা তার কাছে সনদ

দাবি করেছিল। কিন্তু স্যানফোর্ড ব্রাউন বিদ্যালয়ের মূল প্রতিষ্ঠান বিষয়টি অস্বীকার করে তার কাছে। আমি তখন এ ধরনের সহকারীর চাকরির বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান করে ইয়াসমিনের কথার সত্যতা খুঁজে পাই। 'আমেরিকান রেজিস্ট্রি ফর ডায়াগনস্টিক মেডিকেল সনোগ্রাফি' নামে প্রতিষ্ঠানটির একজন সদস্য বিষয়টি আমাকে নিশ্চিত করেন।

ডেভিড শোল আমাকে ব্রাউন ম্যাকে কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা বিশদভাবে জানান এবং তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কিছু নথিপত্রও আমার হাতে তুলে দেন। ডেভিড আমাকে তারই এক সাবেক সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই ভদ্রলোক আমাকে ডেভিড শোলের কাহিনির সত্যতা নিশ্চিত করেন এবং ওই বিদ্যালয়ের বর্তমান এবং প্রাক্তন পাঁচজন শিক্ষার্থীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের মধ্যে ওয়েন্ডি ওয়ালকটও ছিলেন। তারা সবাই আমাকে আরও তথ্য দেন। ওয়েন্ডির মাধ্যমে আমি আরও দুজন শিক্ষার্থীর সন্ধান পাই। এই মনুষ্য সূত্ররাই আমার রিপোর্টকে প্রাণবান করে তুলেছিল।

বিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আমাকে কথা বলতে হয়েছে। তাদের কেউ কেউ আমার কাছে আবেগ প্রকাশ করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছে। আবার কেউ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লাভজনক পেশার কলেজগুলোর অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিতে গেলে তিনি শুরুতেই আমাকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেন। সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরুর ১০ সেকেন্ডের মাথায় তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "এই একই নামে আপনার কি কোনো ভাই অথবা আত্মীয় আছেন, যিনি ১৩ বছর আগে আমাদের এই সেক্টর নিয়ে কোথাও নিবন্ধ লিখেছিলেন?" একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে আমি এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত থাকায় সেই ব্যক্তি আমার জন্য তেমন কোনো বাধা তৈরি করতে পারেননি।

আমি লেখার সময়টাতে সাধারণত অনেকটা সময় ব্যয় করে থাকি। প্রতিদিন ৫০০ শব্দ লিখি এবং আরও কয়েক দিন ব্যয় করি লেখাটাকে ঝাড়ামোছা করতে। সাধারণভাবে কোনো ম্যাগাজিনের জন্য একটি ফিচার ধরনের লেখা তৈরি করতে আমার সময় লাগে দুই সপ্তাহ। শুরুতেই আমি লেখার একটি কাঠামো তৈরি করে পুরো লেখা ৫০০ শব্দ করে কয়েক ভাগে ভাগ করি। যেকোনো লেখা আমি উপাখ্যানমূলক ভঙ্গিতে শুরু করি এবং লেখাটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য মাঝে এবং শেষাংশে উপাখ্যানধর্মিতা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করি। লেখার প্রচুর উপাদানকে এক জায়গায় করে একটা ব্লক তৈরি করি, যা উপাখ্যানগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহার করা যায়।

এখানে বিষয়টা বোঝানোর জন্য ইয়াসমিন ইসার ঘটনাটা বেছে নেওয়া যায়। কারণ, এমন একটি স্কুলের কার্যকলাপের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে, যার মূল প্রতিষ্ঠানটি মামলা এবং তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে। ইয়াসমিন গুছিয়ে কথা বলতে পারেন এবং তিনি সহানুভূতিশীল মানুষ। তার বলা কাহিনিতে এমন অনেক উপাদান আছে, যা নিয়ে পরে আলোচনা করব। পুরো বিষয়টি আমি এভাবে সাজাই:

১. সূচনা: ইয়াসমিন ইসা এবং স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউট।

২. মধ্যবর্তী অংশ: ছোট ছোট উদাহরণসহ মূল বিষয়টির বিশদ অবতারণা।

৩. ক. প্রেক্ষাপট অংশ: ক্যামেরার লেন্স পেছনে নিয়ে যাওয়ার মতো করে পাঠকদের কাছে ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা। এখানে আমি ক্যালিবার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি। কারণ, এই বিদ্যালয় পুরোনো ধারার নিপীড়নমূলক একটি প্রতিষ্ঠান।

৩. খ. ব্রাউন ম্যাকি কলেজের ওয়েন্ডি ওয়ালকট এবং ডেভিড শোলের উপাখ্যান ব্যবহার করা, যাতে আধুনিক শিক্ষার্থী নিপীড়নের পদ্ধতির সঙ্গে পুরোনো দিনের তুলনাটা দেখানো যায়।

৪. এরপর রিপোর্টের আরেকটু গভীরে গিয়ে সমস্যার মূলকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে। বুশ প্রশাসনের আমলে আইনের ফোকর গলে তখনকার প্রচলিত আগ্রাসী বিপণন ব্যবস্থা মানুষকে ঠকানোর সুযোগ নিয়েছে।

৫. এই শিক্ষার্থীদের লড়াই করার গল্পগুলো ব্যবহার করে রিপোর্টের শেষে এসে একটি শক্তিশালী উপসংহার টানা। এ পর্যায়ে আমি আমেরিকান ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশেল ফ্রিম্যানের উপাখ্যানটি ব্যবহার করেছি।

এই প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার পর আমাকে টেলিফোন করেন মার্কিন সিনেটর টম হারকিন। তিনি সিনেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম এবং অবসর ভাতাবিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি রিপোর্টটি পাঠ করে লাভজনক পেশা শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে ধারাবাহিক শুনানির ব্যবস্থা করে ফেলেন। আমাদের টেলিফোন সংলাপের ভিত্তিতে ইয়াসমিন হয়ে যান তার মূল সাক্ষী। ইয়াসমিন স্যানফোর্ড ব্রাউন ইনস্টিটিউটে তার সব অভিজ্ঞতা শুনানিতে জবানবন্দি হিসেবে দেন। তার আগে সিনেটর আমার লেখাটিও পাঠ করেন। সাক্ষ্য দেওয়ার পর ওই শুনানিতে উপস্থিত আরেকজন প্যানেল সদস্য ইয়াসমিনের শিক্ষার্থী ঋণের পুরোটা পরিশোধ করে দেন।

শুনানি চলার সময় বড় বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ছিল সমালোচকের। প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টটি একটা জটিল সময়ে প্রকাশিত হয়। ওবামা প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ ওই সময়ে বেশ কিছু সংস্কার প্রণয়ন করেছিল বুশ আমলের বেশ কিছু রন্ধ্র বন্ধ করার জন্য। ওই পথগুলো ব্যবহার করে এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো যেভাবে ছাত্র ভর্তি করাত, সেটা সমালোচকদের ভাষায় ছিল অনৈতিক পন্থা। 'ইউএস গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস' থেকে প্রকাশিত বিশেষ অডিট প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন শিক্ষার্থীদের কাছে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে আসছিল এবং কখনো শিক্ষার্থীদেরকেও প্রতারণার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছিল।

এই প্রতিবেদনের জন্য আমি বহু মানুষের ধন্যবাদ পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে নতুন লেখার জন্য রসদও পেয়েছি। অ্যাকাডেমি ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে আমাকে এই একই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই প্রতিবেদনের সঠিকতা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি এবং কেউ আইনি পদক্ষেপও নেয়নি আমার বিরুদ্ধে। 'দ্য ক্যারিয়ার কলেজ অ্যাসোসিয়েশন' বিষয়টি নিয়ে একটি ব্লগ পোস্ট প্রকাশ করে। এ রকম পোস্ট তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত যেকোনো রিপোর্টের ক্ষেত্রেই করে থাকে।

২০১১ সালে 'আমেরিকান সোসাইটি অব জার্নালিস্টস অ্যান্ড অথরস' এই রিপোর্টকে 'আরলিন আইজেনবার্গ' পুরস্কারে ভূষিত করে।

২.

বিবাহবিচ্ছেদ মামলার দীর্ঘসূত্রতায় ভুগছে জর্ডানের নারীরা: অভিভাবকত্ব বেছে নিতে গভীর দোটানার শিকার সন্তানেরাও

মাজদোলিন অ্যালান

ভূমিকা

একজন রিপোর্টারের জীবনে প্রথম অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন সাংবাদিকতা পেশায় তার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেই রিপোর্টারের প্রতিবেদন একজন দুর্নীতিপরায়ণ প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে সক্ষম হলো কি না, এই প্রশ্নের চেয়ে কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, একটি ঝকঝকে প্রতিবেদন বা স্টোরি তিনি লিখে প্রকাশ করতে পারলেন কি না। এই প্রতিবেদন ছিল মাজদোলিন অ্যালানের প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। আর এই প্রতিবেদন আমাদেরকে নিক্ষেপ করে গভীর বেদনার জলরাশিতে। প্রতিবেদনটি সেই হাজার হাজার অসহায় নারী ও শিশুর কাহিনি যাদের স্বামী এবং পিতারা বিবাহবিচ্ছেদের পর সব ধরনের সহায়তা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই প্রতিবেদনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে রিপোর্টারের লেগে থাকার সংকল্প। পাশাপাশি বলা যায়, অনভিজ্ঞতা মাজদোলিন অ্যালানের মতো একজন নারী রিপোর্টারকে বুঝতে দেয়নি কী এক অসম্ভব কাজের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের শিকার সেই নারীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনো পরিসংখ্যানের সহায়তা অ্যালান পাননি। কিন্তু দমে যাননি তিনি। নিজেই প্রশ্ন তৈরি করে দুর্ভাগ্যের শিকার সেই নারীদের মাঝে ১৩০ জনকে বেছে নিয়ে তিনি নিজেই একটি পরিসংখ্যানের কাজ পরিচালনা করেন। আদালতের কর্মকর্তারা এসব মামলায় ঘুষ নিয়েছেন কি নেননি, তারও কোনো বাস্তব প্রমাণ তার হাতে ছিল না। অ্যালান ওই কর্মকর্তাদের অর্ধেকের ওপর আরেকটি জরিপ পরিচালনা করেন। সেখানে অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে তিনি ঘুষ নেওয়ার প্রসঙ্গটিও জুড়ে দেন। সেই কর্মকর্তাদের অধিকাংশই কিন্তু ধর্মীয় আদালতে ঘুষের অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে নেন। এভাবেই প্রতি পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে তিনি এগিয়ে যাওয়ার একটি পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি এমনভাবে দাবি উত্থাপন করেছেন যে মনে হয় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকার রয়েছে। পরিশেষে কাজটা শেষ হয়েছে সফলভাবে এবং কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। তার প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়েছে 'অ্যারাব রিপোর্টার্স ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম' (এআরআইজে)। তারা এই কাজের জন্য অ্যালানকে যেমন অর্থ সহায়তা দিয়েছে, তেমনি সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষক সা'দ হাতারকে দিয়ে তাকে প্রশিক্ষণও দিয়েছে।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালের ৯ আগস্ট জর্ডানের আলগাহাদ পত্রিকায়।

জর্ডানের একটি ধর্মীয় আদালতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে আইনি লড়াই চালানোর পর ৩৩ বছর বয়সী উম্মে সামিরা হাল ছেড়ে দেন। ২০০৯ সালে তিনি তার আগের পক্ষের চার সন্তানের অভিভাবকত্বের দাবিও পরিত্যাগ করে আরেকজনকে বিয়ে করেন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী। সাবেক স্বামীর কাছে আম্মান অঞ্চলের বাসিন্দা সামিরার দাবি ছিল প্রতি মাসে ২০৫ (জর্ডানীয় মুদ্রা) দিনার, যা ৩১০ মার্কিন ডলারের সমতুল্য।

২৮ বছর বয়সী সাদিয়া মোহাম্মদও এই একই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। ২০০৯ সালে মধ্য আম্মানের একটি ধর্মীয় আদালতের বিচারক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে সাদিয়ার মামলাটি পাঠায় সমাধানের জন্য। তারা সিদ্ধান্ত দেয় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত সাদিয়া তার তিন সন্তানের প্রত্যেকের জন্য মাসে ২৭ দিনার পাবেন এবং মাতৃ হেফাজতের জন্য পাবেন আরও ১৫ দিনার। সেই সামান্য পরিমাণ অর্থও তাকে ভেঙে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক বছর আগে তালাকপ্রাপ্ত সাদিয়া জানান, তার সাবেক স্বামীর কাছ থেকে ছয় মাসে ছয়বার অর্থ প্রদানে অপারগতার নোটিশ আসে তার কাছে। এই নোটিশ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। উল্টো দিকে একবারই মাত্র সাবেক স্বামীকে অর্থ প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছিল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার আশ্রয় নিয়েছে অপারগতার নোটিশের।

জর্ডানে ১৯৭৬ সালের 'বৈবাহিক অবস্থা এবং পারিবারিক আইন' অনুযায়ী কোনো বিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত নারীর পরিবারকে তার বর্তমান বা সাবেক স্বামী যদি অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সেই নারী ধর্মীয় আদালতে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এ ধরনের সুরাহায় দেশটিতে দুটি ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমত, একটি নির্দেশের মাধ্যমে স্বামীকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার জন্য বলা হয়; দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় আদালতের নোটিশ প্রদান বিভাগের মাধ্যমে বিবাদীপক্ষকে এ নোটিশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই নারীরা দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় এসে সহায়তা ভাতা আদায়ে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘসূত্রতার শিকার হন। যে সংকট ও প্রতিবন্ধকতায় উম সামিয়া এবং সাদিয়াকে পড়তে হয়েছে, সেই একই সংকট আর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন হাজার হাজার নারী ও শিশু। জর্ডানের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৭ সালে দেশটির ধর্মীয় আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়ে শিশুদের আর্থিক সহায়তার মামলার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২৪টি। পাশাপাশি ৪ হাজার ৯৫৭ জন নারী বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীদের আর্থিক সহায়তা না পেয়ে মামলা করেন।

এ ধরনের মামলার সমুদ্রে সমাধানের পন্থাগুলো ছোট্ট ঢেউয়ের মতো। উচ্চ আদালতের নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শুধু ২০০৭ সালেই জর্ডানের ধর্মীয় আদালতগুলোতে ৫০ হাজার মামলা প্রক্রিয়াধীন ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মাত্র ৬২ জন বিচারক এই বিপুলসংখ্যক মামলার বিচারকাজ পরিচালনা করেন। ওই একই বছরে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (এনসিএইচআর)' থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আদালতগুলোর বিচারকেরা এক দিনে হয়তো ৪০টি মামলার রায় দিতে পারেন। আর এই বিপুলসংখ্যক মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া চালানোর জন্য তাদের সহায়তা করেন একজন করে অফিস সহকারী। একজন সাবেক বিচারক এবং শরিয়াবিষয়ক আইনজীবী রাতিব আল দাহার জানান, ন্যায্য এবং সঠিক রায় প্রদানের জন্য একজন বিচারকের এক দিনে ১৫টির বেশি মামলা নিয়ে কাজ করা উচিত নয়। আদালতে মামলার চাপ বেড়ে গেলে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটার শঙ্কাও বাড়ে। প্রধান বিচারক ড. হেলায়েল অবশ্য আদালতগুলোতে মামলার চাপের বিষয়টা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, বিচারব্যবস্থাকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং কর্মচারী সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আদালতগুলোর কাঠামোগত অবস্থা বিশৃঙ্খলতাকেই উন্মোচন করে। এনসিএইচআরে বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু সহায়তা এবং হেফাজত বিভাগের আইনজীবী বুথানিয়া ফিরহাত বলেন, "ধর্মীয় আদালতগুলোতে আগত মানুষদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাদের জন্য এই আদালতগুলোতে নেই ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা।" আমরা নিজেরা ঘুরে দেখেছি সাহাব শহরতলি এবং মধ্য আম্মানের ধর্মীয় আদালতগুলোর বাথরুমের অবস্থা করুণ। সেখানে এই মানুষগুলোর জন্য কোনো অপেক্ষাগারও নেই। আম্মানের ১৩টি ধর্মীয় আদালতের মধ্যে ১০টি পরিদর্শন করে আমরা দেখেছি, আটটি আদালতে পৃথক কোনো অপেক্ষাগার নেই, নেই কোনো লিফটের ব্যবস্থা। সরকারি ভবন ধোঁয়ামুক্ত রাখার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ১০টি আদালতের মধ্যে মাত্র তিনটি আদালত ভবন ছিল ধোঁয়ামুক্ত।

এ ধরনের অবস্থা আদালতে আসা বাদীপক্ষের জন্য অগ্নিপরীক্ষার মতো হয়ে ওঠে। ৫৭ বছর বয়সী উম্মে ফাদেল প্রতি মাসে তার বিবাহবিচ্ছেদ ভাতার ৪০ জেডির জন্য আসেন মধ্য আম্মানের একটি ধর্মীয় আদালতে। সেখানে লিফটের ব্যবস্থা না থাকায় তাকে বহু কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। ফাদেল বহুদিন ধরে হাড়ের ক্ষয় রোগে ভুগছেন। ভাতা নিতে এসে তাকে আদালতের অর্থ বিভাগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বসার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো তাকে আদালতের কর্মচারীরা জোর করে মেঝেতে বসিয়ে রাখার ঘটনাও ঘটেছে।

বহুদিন ধরে অসংখ্য মামলার চাপে গোটা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। ২০০৬ সালে এনসিএইচআরের একটি প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে খোদ রাজধানীর আদালতগুলোতে কাজের ধীরগতি এবং কর্মচারীদের কাজের নিম্নমানকে। আইনজীবীদের হাতে অসংখ্য মামলা জমে থাকাকে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "মামলার কবরস্থান"। জর্ডানের 'ন্যাশনাল কমিশন ফর ওমেন অ্যাফেয়ার্স'-এর মহাসচিব আসমা খোদর বলেছেন, "এমন ঘটনাও আদালতে ঘটেছে যেখানে তালাকপ্রাপ্ত একজন নারীর সাবেক স্বামী বারবার ভাতা দেওয়ার আদেশ লঙ্ঘন করলে প্রতিবার ওই নারীকে আইনজীবীরা নতুন মামলা শুরু করার কথা বলে বাড়তি অর্থ আদায় করেছেন।"

যেসব পুরুষ তালাক দেন, তারা গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। তাদেরই একজন আমাদের জানিয়েছেন, তিনি আইনজীবীকে বলেছেন, "আইনের যেকোনো একটি ফাঁক ব্যবহার করে শিশু প্রতিপালনের ভাতার পরিমাণ কমানোর সমঝোতায় যেতে অথবা বিষয়টা এড়িয়ে যেতে।" ৩০ বছর বয়সী যে ব্যক্তি আমাদের কথাগুলো বলেছেন, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। তারপরেও তিনি আইনজীবীর পেশাগত দক্ষতার ওপর বাজি ধরে বলেছেন, আইনজীবী আইনি বা বেআইনি– যেকোনো পথেই আদালতকে ভুল বুঝিয়ে মামলা থেকে বের করে নিতে পারবেন।

এ ধরনের ঘটনায় পরিণামে নারী ও শিশুদেরই বেদনার অংশটুকু বহন করতে হয়। আর সে বেদনা টাকার পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে ১৩ বছরের সামিরা আম্মানের আল আবদালি শারিয়াহর আদালতেই অজ্ঞান হয়ে যায় রায় শুনে। সামিরা তার মায়ের হেফাজত থেকে বাবার কাছে চলে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। আদালত তার আবেদনের বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং সামিরার বাবা শিশুর ভরণপোষণের জন্য ভাতা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মেয়ের বিরুদ্ধেই মামলা ঠুকে দেন। সামিরা তার বাবার ব্যবহারে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামিরার মায়ের কাছ থেকে জানা যায়, ওই ঘটনার পর থেকে স্কুলে সামিরার লেখাপড়ার অবনতি ঘটে এবং সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং নিঃসঙ্গতায় ভুগতে থাকে।

সহায়তা ভাতায় সংসারের ব্যয় চলে না

উম্মে আহমেদ চার সন্তানের জননী। আম্মানের একটি ধর্মীয় আদালতে ২০০৭ সালে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে করা এক মামলায় আদালত তাঁকে সহায়তা ভাতা হিসেবে ২০০ দিনার দেওয়ার নির্দেশ দেন। ওই অর্থ থেকে তার ১১০ দিনার ব্যয় হতো বাড়িভাড়ায়। বাড়ির অন্যান্য ব্যয় মেটাতে লাগত আরও ৪০ দিনার। ওই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পর তার হাতে যে ৫০ দিনার থাকত, তা দিয়ে চার সন্তানের লেখাপড়া, খাবার, চিকিৎসা, পোশাক এবং হাতখরচ মেটাতে হতো। সহায়তা ভাতার জন্য আদালতে মামলার শুনানির এক সপ্তাহ আগে সাবেক স্বামীর নতুন মডেলের গাড়ি কেনার খবরে ক্ষিপ্ত হন উম্মে আহমেদ। তিনি বলেন, তার সাবেক স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। তাই সে অন্য এক নারীকে বিয়ে করে মিসরে গেছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে।

রাশা আদেলের সন্তান স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তিনি শিশু সহায়তা ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে পান ৫০ জেডি। অথচ তার স্বামী বেতন পান ১ হাজার দিনার এবং এর বাইরেও নিজস্ব ব্যবসা থেকে তার বাড়তি আয় হয়।

বৈবাহিক অবস্থা এবং পারিবারিক আইন অনুযায়ী সহায়তা ভাতায় অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সাবেক স্বামীর আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। আর্থিক সংগতির ওপর নির্ভর করে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পেতে পারে। তবে এই টাকার পরিমাণ কখনোই এত কম হবে না যাতে সাবেক স্ত্রী এবং সন্তানেরা জীবনযাপনের একেবারে ন্যূনতম মান বজায় রাখতে না পারে।

কিন্তু সেটাই ঘটে থাকে। ১৮০ জন নারীর ওপর আমাদের পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের জরিপের ফলাফল বলে, তাদের ৯৩ শতাংশই মনে করেন, ভাতার অর্থের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ বিচারকের বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সহায়তা ভাতায় অর্থের পরিমাণ সাবেক স্ত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫০ দিনার এবং প্রতিটি সন্তানের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ দিনার। প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, এই অর্থ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখা কঠিন। অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হুসনি আয়েশ বলেন, "এই ভাতার যারা সুবিধাভোগী, তাদের যদি আয়ের আর কোনো উৎস না থাকে, তাহলে অচিরেই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাবে।"

দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের ভূত

নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন একজন আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাদের জানান, আদালতে শুনানির জন্য আসা একজন নারীকে রায় তার পক্ষে নেওয়ার জন্য আদালতের অফিস সহকারীরা কী ধরনের ব্যবহার করেছিল। সহায়তা ভাতার টাকা তুলতে আসা সেই নারীকে বিনা কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জোর করে বসিয়ে রাখা হতো। কখনো এই সহায়তা ভাতার অর্থ কোর্ট থেকে নগদে দেওয়া হয়। আবার এই অর্থ কখনো চেকের মাধ্যমেও আসত। সেই নারীর নিজের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকায় তার পক্ষে চেক ভাঙানো সম্ভব হতো না। অন্য কথায় বলা যায়, কোর্টের ওই কর্মচারীরাই নির্ধারণ করত একজন নারী কখন এবং কীভাবে ভাতার অর্থ ছাড় করাবেন।

আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা হাজার হাজার মামলার তুলনায় অপ্রতুল। রাজধানী আম্মানের ১৩টি আদালতে মাত্র ৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিবছর কয়েক হাজার মামলা নিয়ে কাজ করেন। তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো মামলার প্রক্রিয়াই সফল হতে পারে না। আবার বহু নারী আদালতে এসে সেখানকার নানান প্রক্রিয়া ভালোভাবে বুঝতেও পারেন না।

এ রকম পরিস্থিতি দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য খুবই উৎকৃষ্ট। ন্যায়বিচারের আশায় আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যে ১৮০ জন নারীর আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের ১৮ শতাংশ আমাদের বলেছেন, আইনি বিষয়ে তাদের জানাশোনা না থাকায় তারা আইন প্রয়োগকারী এই সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছেন। এনসিএইচআর তাদের প্রতিবেদনে আদালতের কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়ার প্রচুর ঘটনার দিকে আঙুল তুলেছে।

আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এমন নারীদের অর্ধেকই বলেছেন, আদালতের একজন কর্মকর্তা বিবাদীপক্ষের কাছে আদালতের নির্দেশনা (রায়) পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে অর্থ দাবি করেছেন। আমি আম্মানের ২০ জন আদালত কর্মকর্তার সঙ্গে এই অভিযোগ নিয়ে কথা বলেছি। তাদের মধ্যে পাঁচজন বাদীপক্ষের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন বিবাদীকে নোটিশ পৌছানোর জন্য। বিপরীতভাবে এদের মধ্যে ছয়জন আমাকে বলেছেন, তারা উপহার বা কাজের বিনিময়ে কোনো মামলায় বিবাদীপক্ষকে নোটিশ না পৌঁছানোর প্ররোচনায় সাড়া দিতেও পারেন।

রাষ্ট্রের মুফতি ড. নোয়া আল-কুদাত মনে করেন, একজন দাবিদারের কাছ থেকে অর্থ চাওয়া অপরাধ এবং অনৈতিক কাজ। তিনি মনে করেন, একজন দাবিদারের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া শরিয়া আইন থেকে বিচ্যুত হওয়ার শামিল।

আদালতের কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘুষের ছড়াছড়ির যে চিত্র উঠে আসছে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ বিচারকের মন্তব্য জানতে চাইলে ওই বিভাগ থেকে আমাদের জানানো হয়, "যেকোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয় অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তারা দ্বিধা করবে না।"

আমরা রুবা হাসান নামের আরেকজন নারীর সাক্ষাৎকার নিই। তিনি জানান, যতবার তার সাবেক স্বামীকে সন্তানের ভরণপোষণের ভাতা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে আদালতের নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে, ততবারই তাকে ৫ জেডি ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি আরও জানান, কিছু কর্মচারী তার প্রতি "অমানবিক" আচরণও করেছেন। অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা বারবার রুবার "ব্যক্তিগত ফোন নম্বর" চাইত। আদালতের কাগজপত্র তৈরি করতে রুবার তাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

আদালত কর্মকর্তা: "ঘুষ নিয়ে আমরা যানবাহনের ভাড়া দিই"

একজন আদালত-কর্মচারী আমরা যার নাম প্রকাশ না করে এখানে সংক্ষেপে এ. কে. বলব, তিনি আদালতে সহকর্মীদের মাঝে ঘুষের ছড়াছড়ির বিষয়টা স্বীকার করেই বলেন, "কোর্টের কর্মচারীরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো যানবাহনের সুবিধা পান না।" আল বালকা জেলা আদালতের একজন কর্মকর্তা এবং অন্য একজন আদালত কর্মচারী (চাকরির নিরাপত্তার কারণে যাদের নাম এখানে প্রকাশ করা হলো না।) অভিন্ন সুরে জানান, যানবাহনের সংকটের কারণে বেশির ভাগ সময় তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। যাতায়াত ভাতা হিসেবে তাদের মাসিক বরাদ্দ ২০ দিনার। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে এক সপ্তাহও কাজ করা সম্ভব হয় না, যেখানে এক দিনে গড়ে একজন কর্মচারীকে আটটি নোটিশও বিতরণ করতে হয়। তাদের যাতায়াত ভাতা বছরে মাত্র ১ দিনার বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, যানবাহনের ভাড়া ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে, যা এই সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

এ. কে. আমাদের বলেন, সর্বোচ্চ বিচার বিভাগে নিজের দপ্তরকে তিনি একটি দুই চাকার বাহন কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কাজের সুবিধার্থে তিনি নিজের ব্যক্তিগত অর্থে বিভাগের নামে বাহনটি কেনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার প্রস্তাবে কেউ সাড়া দেয়নি। তিনি এবং তার সহকর্মীরা জানান, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আদালতের নোটিশ বিলি করার সময় যানবাহনের অভাব একটি বড় বাধা তাদের জন্য। ২০ জন কর্মকর্তার ওপর পরিচালিত আমাদের পরিসংখ্যান বলছে, তাদের মধ্যে নোটিশ বিলি করার কাজে নিয়োজিত আটজন কর্মচারীই কাজটা করেন না নিজেদের বাহন অথবা গণপরিবহন ব্যবহার করতে হবে বলে।

এ রকম একটি ঘটনায় আম্মানের একটি ধর্মীয় আদালতের একজন কর্মচারী সামিয়া আল হারাসিসের কাছে তার সাবেক স্বামীকে নোটিশ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাতায়াত ভাড়া দাবি করেন। অন্যথায় তিনি সামিয়াকেই নোটিশটি পৌঁছে দিতে বলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি।

মোহাম্মদ নাঈম একজন শরিয়াহ আইনজীবী। তিনি বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু সহায়তা এবং হেফাজত বিষয় নিয়ে কাজ করেন। তিনি মনে করেন, "আদালতের যেসব কর্মচারী নোটিশ বিলি করেন, তাদের যাতায়াত ভাতা অত্যন্ত কম হওয়ায় তারা নোটিশ বিলির কাজে গড়িমসি করতেও পারেন।" তিনি জর্ডানের আদালত-কর্মকর্তাদের অবস্থার সঙ্গে উপসাগরীয় অন্যান্য দেশের আদালত-কর্মকর্তাদের অবস্থার তুলনা

করতে গিয়ে বলেন, অন্যান্য জায়গায় এ ধরনের কর্মচারী দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি যানবাহন পান। সে তুলনায় জর্ডানের চিত্রটা ভিন্ন। এখানে এ ধরনের কর্মচারীদের আলাদা পোশাক বা সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোনো পরিচয়পত্রও দেওয়া হয় না। নাঈম বলেন, "জর্ডানে আইন মন্ত্রণালয়ের মতো সর্বোচ্চ আদালত বিভাগও নোটিশ বিলি করার জন্য নির্দিষ্ট মাশুলের বিনিময়ে কোনো বেসরকারি ডাক ব্যবস্থার সহায়তা নিতে পারেন।" সর্বোচ্চ বিচারক ড. আহমেদ হিলায়েল লিখিতভাবে এসব অভিযোগের উত্তরে বলেন, "আদালতের কাজে দীর্ঘসূত্রতা যদি থেকে থাকে, তার বড় একটি কারণ হচ্ছে, একটি যথাযথ দরখাস্ত তৈরি করার ক্ষেত্রে যথাযথ কাগজপত্রের অভাব। এসব সমস্যার সমাধান আদালতের এখতিয়ারের মধ্যেও থাকে না। এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিবাদীপক্ষ প্রায়শই ভুল ঠিকানা দিয়ে থাকেন দরখাস্তে। এতেও নোটিশ পৌঁছাতে দেরি হয়।" তিনি তার লিখিত উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "ধর্মীয় আদালতগুলো তাদের কাজের সঠিকতা এবং সাম্যাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। আদালতের কর্মচারীদেরও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।" যদিও আদালতের একজন প্রয়োগকারী কর্মচারী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, তিনি তার ১৫ বছরের চাকরিজীবনে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেননি।

আইনে কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য রয়েছে

১৫ বছর বয়সী কিশোরী নাসরিন মায়ের সঙ্গে গাড়িতে কোথাও যাওয়ার সময় তার বাবার গাড়িটি দেখতে পেলেই সিটের নিচে লুকিয়ে পড়ে। নাসরিন তার মায়ের হেফাজতে থাকতে চাওয়ায় তার বাবা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সন্তান ভরণপোষণ ভাতা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন।

নাসরিনের বাবা কিন্তু কোনো নিষ্ঠুর অথবা বেআইনি কাজ করেননি। কারণ, পারিবারিক আইনের ১৬৫ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, "একজন কন্যাসন্তানকে তার আইনগত অভিভাবকের কাছেই থাকতে হবে। যদি সে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়া সেই অভিভাবকের সঙ্গে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সেই কন্যাসন্তান তার সেই অভিভাবকের কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক সহায়তার ওপর অধিকার হারাবে।" আইনের দৃষ্টিতে পিতাই হচ্ছেন কন্যাসন্তানের প্রকৃত অভিভাবক। আইনের এই ধারার কারণেই উম সামিরা তার সব সন্তানকে সাবেক স্বামীর হেফাজতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তার কন্যাসন্তান তখন তার বাবার হেফাজতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। ওই সময়ে সামিরার সহায়তা ভাতা ২০০ দিনার থেকে কমিয়ে ১৬০ দিনার নির্ধারণ করা হয়। এই পরিমাণ সহায়তা ভাতায় তার পক্ষে সন্তান লালন-পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই রিপোর্টার আদালতের শুনানির পর সামিরার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সে বারবার শুধু একটি কথাই বলছিল, "আমার বাবা এ রকম কেন করলেন! আমি কি তার মেয়ে নই?"

'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স'-এর মহাসচিব ড. হাইফা আবু গাজাল্লা বলেন, "কন্যাসন্তান যখন বাবার পরিবর্তে মায়ের হেফাজতকে বেছে নেয়, তখন আইন এভাবেই তাকে শাস্তি দেয়।" তিনি বলেন, "এই আইনের ধারাটি জাতিসংঘের শিশু অধিকারবিষয়ক কনভেনশনের ২৭ ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদিও জর্ডান ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের ধারাটিকে অনুসমর্থন দিয়েছে। এই ধারায় প্রত্যেক শিশুর শারীরিক, মানসিক, পারমার্থিক, নৈতিক এবং সামাজিকভাবে উন্নত একটি জীবনমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং শিশুদের পিতামাতাদের সামর্থ্য এবং আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে সেই জীবনমান নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।"

শরিয়া আইনজীবী সা'আদি উশতা মনে করেন, আইনপ্রণেতারা জর্ডানের এই আইন তৈরির সময় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না। সর্বোচ্চ বিচারক ড. আহমেদ হিলায়েল অবশ্য এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন, আইনটি একই সঙ্গে কন্যাসন্তান এবং পিতার অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। কারণ, বয়ঃসন্ধিকালে একজন কন্যাসন্তানের হেফাজতের বিষয়ে পিতারই অধিকার রয়েছে। কন্যাসন্তান যদি কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া এই অধিকারকে সম্মান না জানায়, তাহলে সেই অস্বীকার করার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে।

তবে তিনি বিশ্বাস করেন, মায়ের সাবেক স্বামী অর্থাৎ কন্যাসন্তানের পিতার হেফাজত অস্বীকার করার বিষয়টিকে আইনে যেভাবে "বিদ্রোহ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত। শব্দটির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

একটি স্থবির সমাধান

তালাকপ্রাপ্ত নারী খাওলা আল আলি খুব প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন তুলেছেন, "তারা একটি পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করছে না কেন? এ রকম একটি আলাদা ব্যাংক থাকলে তো আমাদের সহায়তা ভাতার জন্য বারবার আদালতে যেতে হয় না এবং তাতে সবার পরিশ্রম এবং সময় বাঁচে।" খাওলা জানতেন না বহু বছর ধরে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই প্রশ্ন উত্থাপন করে আসছে এবং একটি সম্ভাব্য সমাধানের পরিকল্পনাও উপস্থাপন করে চলেছে।

জর্ডানের 'ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন' এই সমস্যার সমাধানে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাবে সহায়তা ভাতা ঋণ তহবিল গঠনের কথা বলেছে। এ ধরনের একটি ঋণ তহবিল গঠিত হলে তালাকপ্রাপ্ত নারীরা ঋণ নেওয়ার সুবিধা পাবেন। সাবেক স্বামীরা অনুপস্থিত থাকলে, বা তাদের বর্তমান ঠিকানা খুঁজে বের করা কঠিন হলে, বা তাদের ভাতা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে অথবা ভাতা দেওয়ার বিষয়টা তারা এড়িয়ে চললে নারীরা এ ধরনের একটি তহবিল থেকে ঋণ পেতে পারেন।

তহবিলের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সরকারের বাজেট থেকে আসতে পারে। এটি 'আর্থিক তহবিল' নামে চিহ্নিত হতে পারে, যার ঋণের অর্থ সাবেক স্বামীদের কাছ থেকে আদায়ের দায়িত্ব সরকারের ওপর থাকবে। তারা সরাসরি সরকারের কাছে দেনাদার থাকবেন।

কিন্তু বাজেট থেকে এই তহবিলে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়। আইনের এই খসড়া প্রস্তাব লম্বা আলোচনার আবর্তে পড়ে একটা পর্যায়ে বিস্মৃতির মধ্যে ঢুকে যায়। প্রধান বিচারপতি ড. হিলায়েল বিশ্বাস করেন, এ ধরনের একটি তহবিল সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু কবে তা গঠিত হতে পারে অথবা তহবিল গঠনে কী কী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেসব ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেননি।

পরিশিষ্ট

মাজদোলিন অ্যালান

এ রকম একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার ভাবনাটা আমার মাথায় প্রথম আসে সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ১০ বছর আগে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া আমার বোন ধর্মীয় আদালতগুলোতে এ ধরনের নারীদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয় এবং তাদেরকে যে বৈরী অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে আমাকে জানান। এই আদালতগুলো জর্ডানে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা তদারক করে থাকে। আমি তখন পুরো বিষয়টা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজটা করার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি তখন সহায়তার জন্য 'আরব রিপোর্টার্স ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম' সংস্থার রানা সাবার সঙ্গে দেখা করি। যারা ঘটনার শিকার হয়েছিলেন তাদের যন্ত্রণা ছিল গভীর এবং বেদনাদায়ক। অনুসন্ধানের ফলাফল দেখে আমিও বিস্মিত হয়ে যাই।

এই প্রতিবেদন আমার জীবনের প্রথম অনুসন্ধানী কাজ ছিল। তাই কাজটা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারিনি। আমি শুধু নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করেছি।

আমার প্রথম কাজ ছিল প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য একটি তথ্যাগার গড়ে তোলা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি ঘটনার শিকার অনেক নারী ও শিশু, এই সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলি।

সমস্যার একেবারে মূল জায়গা চিহ্নিত করার পর আমি বিষয়টি নিয়ে অতীতে কী কী কাজ হয়েছে, সেসব বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। এই অনুসন্ধানের সময় আমি ২০০৬ ও ২০০৭ সালে এনসিএইচআরের দুটি প্রতিবেদন হাতে পাই, যেখানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গলদগুলো স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। সেগুলো পাঠ করার পর চলমান অন্যায়ের জন্য মূলত কারা দায়ী, তা নির্ণয় করাটাই আমার প্রধান কাজ হয়ে ওঠে।

এই কাজ করার সময় আমি নির্ভর করেছি পারিবারিক ও বৈবাহিক অবস্থার বিবরণ এবং পারিবারিক আইন, আম্মানভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস'-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনের ওপর। এই প্রতিবেদনগুলোতে যে পদ্ধতিতে সাবেক স্বামীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তার অর্থ আদায় করা হয়, সেগুলোর প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হয়েছে। এই সূত্রগুলো ছিল প্রকাশ্য। আমি এগুলোর বাইরে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং নারী ও শিশুদের দেওয়া সহায়তা ভাতার গড় হিসাবের জন্য জর্ডানের শরিয়া আদালতের নিয়ন্ত্রক বিভাগের প্রতিবেদনগুলোরও সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রতিবেদনগুলোতে সহায়তা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সে বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান নেই। ঠিক এ কারণেই আমি একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে বিবাহবিচ্ছেদের শিকার ১৩০ নারীর মধ্যে বিতরণ করি। তাদের প্রত্যেকেরই মামলা শরিয়া আদালতে ঝুলছিল।

আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র জর্ডানেই 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন (এফওআই)' আইনটি প্রণীত হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে অন্যান্য আইনও রয়েছে, যেগুলো সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। যেমন গণমাধ্যম ও প্রকাশনা আইন। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও সেগুলো ছিল অকার্যকর। আমি এফওআই আইনটি ব্যবহার করে প্রধান ইসলামিক বিচারপতির কাছে কিছু প্রশ্ন পাঠাই এবং তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন।

আদালতের কর্মকর্তারা ঘুষ নেন– এই বিষয় এখানে প্রমাণ করা সবচেয়ে দুরূহ ছিল। আমি একটি ঘটনার তথ্যগত প্রমাণ পেয়েছিলাম যেখানে একজন কর্মকর্তা বিবাহবিচ্ছেদ মামলার শিকার একজন নারীর কাছে ঘুষ চেয়েছেন। পাশাপাশি আদালতের ২০ জন কর্মকর্তার কাছে প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে ১০ জনই স্বীকার করেন, তারা ঘুষ নিয়েছেন।

প্রতিবেদনটি লেখার সময় আমি একটি ধারাক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করেছি অথবা ঘটনার সঙ্গে ঘটনাস্থলের একটি যোগসূত্র দেখিয়েছি। এটি লেখার ক্ষেত্রে যত দূর সম্ভব কম শব্দ ব্যবহার করে সত্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি লেখায় একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের একটি যোগসূত্র বজায় রাখতে চেয়েছি, যাতে পুরো লেখাটি প্রাঞ্জল ও সংগতিপূর্ণ হয় এবং পাঠকেরাও সহজে লেখায় ব্যবহৃত প্রচুর তথ্য বুঝতে পারেন।

আমার মনে মামলার ভয় ছিল। কারণ, প্রতিবেদনটি খোদ বিচার বিভাগের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ছিল সমালোচনামুখর। জর্ডানে একটি আইনের ধারায় বিচার বিভাগের সমালোচনাকারী যেকোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করতে পারে। এআরআইজে-এর আইনি আশ্রয় আমাকে সমূহ জটিলতা থেকে রক্ষা করেছে।

আমরা এই প্রতিবেদন নিয়ে গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখায় উপস্থাপন করেছি। 'জর্ডান সোশ্যাল ফোরাম' নামে একটি সংগঠনের সেমিনারে এই ইস্যু নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। একটি স্থানীয় ওয়েব টেলিভিশন চ্যানেলে সেমিনারটি সম্প্রচারিতও হয়। ২০০৯ সালে আম্মানে অনুষ্ঠিত এআরআইজে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সে এই প্রতিবেদন প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় ইস্যুটি সমাজে ইতিবাচক সাড়া ফেলে।

আমার প্রতিবেদনের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এটি প্রকাশের দুদিন পর সর্বোচ্চ বিচারকের কার্যালয় থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেসব কর্মকর্তা ঘুষ নেওয়ার সঙ্গে জড়িত, তাদের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। তথ্যের সূত্র গোপন করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য আইন আছে। আমি সেই আইনের বলেই আমার মনুষ্য সূত্রদের পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানাই। প্রতিবেদন প্রকাশের আট দিন পর প্রধান বিচারপতি জর্ডানের অন্যতম শরিয়া আদালত পরিদর্শনে যান এবং অনুসন্ধানে যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে, তা নিয়ে আদালতের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেন। এই নড়েচড়ে বসার ফল হিসেবে একটি নতুন শরিয়া আইনগত ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় এবং প্রতিবেদনে সমস্যার যে জায়গাগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নতুন আইনে তালাকপ্রাপ্ত নারী ও তাদের সন্তানদের সুবিধার্থে একটি বিশেষ তহবিল গঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। এই বিশেষ তহবিলের পরিকল্পনা আমাদের রিপোর্টেও উল্লেখ ছিল।

এ ধরনের সংস্কার উদ্যোগের পরেও আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারণ, সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে।

৩.

মরু পথে ইউরোপ: আফ্রিকার অভিবাসীদের কান্না

অনুসন্ধানী রিপোর্টার ইমানুয়েল মায়াহ ৩৭ দিনে ভ্রমণ করেছেন ৪ হাজার ৩১৮ কিলোমিটার পথ। এই ভ্রমণপথে তিনি ঘুরে দেখেছেন মধ্যপ্রাচ্যের সাতটি দেশ এবং সাহারা মরুভূমিসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চল। সেই ভ্রমণে তিনি সঙ্গী হয়েছেন ইউরোপে পাড়ি দিতে চাওয়া আফ্রিকার অবৈধ অভিবাসীদের। নাইজেরিয়া থেকে বেনিন প্রজাতন্ত্র, তোগো, বুরকিনা ফাসো, মালে, নাইজার এবং সর্বশেষে লিবিয়া পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে তার কাহিনির গতিপথ। সেই পথে কী নেই! আছে মানব পাচার, ট্রানজিট ক্যাম্পে যৌন দাসী, ক্ষুধা, মরু ডাকাতদের নির্যাতন, লবণ খনিতে নির্মম শ্রম, উত্তপ্ত মরুভূমিতে পানির ভয়ংকর তৃষ্ণা আর মৃত্যু– সবই আছে তার প্রতিবেদনের কাহিনিতে।

ইমানুয়েল মায়াহ

ভূমিকা

বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী ইউরোপে এ ধরনের কাজ হলে সেটাকে বলা হতো 'মহা প্রতিবেদন'। এমন সব জায়গায় ভ্রমণ, যেখানে কম সাংবাদিকই যাওয়ার উদ্যোগ নিতেন এবং আরও কমসংখ্যক বেঁচে ফিরে আসতেন। ১৯২০ সালের দিকে এই ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। বলা যায়, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মিশেল ঘটানো 'নিউ জার্নালিজমের" পূর্বপুরুষ এটি। সাংবাদিকতার এই ধারা বর্তমান সময়ে এসে অনেকটাই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বলা যায়। কারণ, পাঠক অথবা দর্শক এখন নিজেরাই আকর্ষণীয় এবং বিপজ্জনক স্থান ভ্রমণে চলে যান। বর্তমান সময়ে যে স্বল্পসংখ্যক সাংবাদিক এই ধারার চর্চা করেন (জন ক্রাকাওয়ারের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া), তারা ১৯৯০ সাল থেকে নিজেরাই একটি নতুন ধারার সূচনা করেছেন। এই নতুন ঘরানা বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে শুধু বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরতেই বেশি আগ্রহ বোধ করে। অন্যভাবে বলা যায়, তাদের লেখা কখনো ক্ষতিগ্রস্তদের কাহিনিকেও আড়াল করে ফেলে। মায়াহর প্রতিবেদন অভিবাসীদের বেদনার্ত অভিযাত্রাকে তুলে ধরে বর্তমান এবং প্রত্নতাত্ত্বিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে বলি, "ইমানুয়েল মায়াহর প্রতিবেদন আপনাদের শুধু ওই সব দুর্গম স্থানে পৌঁছানোর পথটাই বাতলে দিয়ে থেমে যায়নি, বের হয়ে আসার পথের ঠিকানাও দেখিয়ে দিয়েছে।

দ্য সান (নাইজেরিয়া) তে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত

পথটাকে বলা চলে লম্বা দূরত্বের আত্মহত্যা। অবশ্য সে পথে ভ্রমণকারীরা বিষয়টা যতক্ষণে উপলব্ধি করেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। পূর্ব নাইজেরিয়ায় একটি প্রবচন আছে, "নরকে যাবার পথ সংকীর্ণ হয় না।" যে বৃদ্ধ মহিলা রোজ বাড়ি থেকে বের হয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ান, তার মনে প্রবচনটি কতবার ঘুরেফিরে, আসে তা বলা কঠিন। এই রিপোর্টারকে দেখে প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়লেন বৃদ্ধা অথবা হয়তো তিনি মধ্যদুপুরে নাইজেরিয়ার সূর্যের তীব্র কটাক্ষকে অনুনয় করলেন তার প্রতি বেশি বিরূপ না হতে।

তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, শোকের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। তবে তার নড়াচড়ায় আভিজাত্য পুরোটা নষ্ট হয়নি। অনির্দিষ্ট কারও উদ্দেশে বৃদ্ধা ক্ষমা চাইলেন। তারপর ম্যালেরিয়া নিয়ে কিছু একটা বললেন। কিন্তু ওই এলাকার সবাই জানে, তার সমস্যাটা আরও গভীর। বিশেষ করে মাদাম এমেয়াগু যখন জানতে পারলেন, তার কন্যা লিবিয়ায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে দিন গুনছে।

যে খবরটা ২০০৯ সালের জুলাই মাস থেকে নাইজেরিয়ার মানুষকে শোকের স্তব্ধতায় বেঁধে রেখেছে, তা হচ্ছে ২০ জন নাইজেরিয়ার নাগরিক লিবিয়ার কারাগারে ফাঁসির দড়ি আর জল্লাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। তাদের একজন নারী জুলিয়েট ওকোরো। এই জুলিয়েটের মা মাদাম এমেয়াগু। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ওই ২০ নাইজেরীয় নাগরিকের সঙ্গে জুলিয়েট ছাড়াও আরও দুজন নারী আছেন। তারা হলেন গ্লোরি পল এবং অ্যামানজে। এদের সবাইকেই খুন, মাদকদ্রব্য পাচার, সশস্ত্র ডাকাতি এবং অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চল বিশেষ করে নাইজেরিয়া থেকে বহু মানুষ সাহারা মরুভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে লিবিয়ায় যান। তাদের লক্ষ্য থাকে, কোনোভাবে ইউরোপের মাটিতে পা রাখা।

জোড়াতালি দেওয়া নৌকায় চড়ে দেশত্যাগের সময় ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীদের সলিলসমাধি লাভ অথবা টেলিভিশনে দেখা কোনো বিমানবন্দর থেকে পাচার হওয়া মানুষের প্রত্যাবাসনের নির্মম ছবির সঙ্গে নাইজেরিয়ার মানুষ খুব বেশি অপরিচিত না হলেও কোনো মধ্যবর্তী দেশে মৃত্যুদণ্ডের কাহিনি তাদের কাছে নতুন বৈকি। জুলিয়েট ওকোরো এমনই এক খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মাদাম এমেয়াগু বসে ছিলেন নিজের বাড়ির সামনে, একটা পেয়ারা গাছের নিচে। আপন মনে কারও উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন আরেকবার, "আচ্ছা, আমার মেয়ে কাকে খুন করেছে, সেই ব্যক্তির নাম কী?" প্রথমে এই রিপোর্টারের আসার কথা তাকে জানানো হলে তিনি দেখা করতে চাননি। পরে যখন বলা হলো, তার সঙ্গে একজন সেই লাগোস থেকে আনামবারা প্রদেশের লাসিকি গ্রামে এসেছেন। তখন তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন, ঠিক কোন কারণটি কাউকে এত দূর টেনে আনতে পারে।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন করেন, যিনি এসেছেন, তিনি কি কোনো সরকারি কর্মকর্তা? তিনি কি তার মেয়েকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারবেন?

আমার কাছে এমন কোনো শব্দ ছিল না, যা ওই বৃদ্ধাকে স্বস্তি দিতে পারে। এক বছর ধরে তিনি বিশ্বাস করতেন, তার মেয়ে ইউরোপ অথবা আমেরিকায় আছেন। লিবিয়া নামে দেশটার কথা তিনি কখনো শোনেননি। পাশেই তার এক কিশোর ভাগ্নে যে কাসাভা দিয়ে দুপুরের খাবার তৈরি করছিল, সে জানাল, দুঃসংবাদটি আসার পর থেকেই মহিলা বিছানা নিয়েছেন। জুলিয়েটের সঙ্গে তাদের পরিবারের সর্বশেষ যোগাযোগ হয় ২০০০ সালে।

আমি তাকে আমার সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে জানাই, তার মেয়ে যে দেশের কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি। আমি তাকে আরও জানাই, লিবিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সোশ্যাল ইকোনমিক রাইটস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রজেক্ট' (এসইআরএপি)-এর করা একটি মামলার কারণে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্থগিত হয়ে আছে। গাম্বিয়ার বানজুলে 'আফ্রিকান কমিশন অন হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস রাইটস'-এর কাছে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

আমার কাছে খবরটা জেনে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কান্না নামে চোখে। ধরা গলায় তিনি শুধু বলতে পারেন, "ওরা বলেছে, কোনো খুনই হয়নি...।" পরিবেশ এতটাই বেদনার্ত হয়ে ওঠে যে আমার সহকারী এবং দোভাষীও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ওই সময় আরও দুজন নারী সেখানে উপস্থিত হন। তারা প্রতিদিন মাদাম এমেয়াগুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনায় যোগ দিতে আসেন। অ্যাঙ্গাস এমেনিকে লিবিয়া থেকে বিতাড়িত এবং লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির একটি নির্বাসন কেন্দ্রে ১১ মাস আটক ছিলেন। তিনি আমাকে জুলিয়েট ওকোরোর কাহিনি শোনান। শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধা ১০ বছর ধরে অদেখা নিজের মেয়েকে একটি চিঠি লেখার জন্য প্রস্তুত করেন। চিঠি অবশ্য লিখে দেয় দোভাষী। সেই চিঠির সঙ্গে মেয়ের একটি পারিবারিক ছবি যুক্ত করে তিনি আমাকে সেটা হস্তান্তর করেন।

জালিয়াত কম্পিউটার একাডেমি

নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একটি ওপেল গাড়ি ধীরে 'মিলে-২' মোটরপার্ক থেকে সেমে সীমান্তের দিকে রওনা দেয়। এই মোটরপার্কের প্রাঙ্গণ সব সময় গিজগিজ করে টাউট আর প্রতারকে। এখান থেকেই হাজার হাজার নাইজেরীয় নাগরিক ইউরোপের উদ্দেশে তাদের দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত যাত্রা শুরু করেন। এদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ভাগ্যবান সেই যাত্রায় সফল হয়ে কয়েক বছর পর দেশে ফিরে আসেন। সেই গাড়িতে যাত্রী হিসেবে ছিলাম আমি আর দুই সহযাত্রী। ওই জায়গা থেকেই লিবিয়ার উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু। সঙ্গীদের মধ্যে উগোর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল; দ্বিতীয়জন ২৪ বছর বয়সী লারবার মনডে।

এ ঘটনার পাঁচ মাস আগে আমার আর উগোর পরিচয় হয় এক মানব পাচারকারীর সঙ্গে বৈঠকে। সেই ব্যক্তি নিজেকে একজন ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সবাই তাকে রাজাহ (এখানে তার প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হলো না) বলে

ডাকত। সেই মানব পাচারকারীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় লাগোসের ওকোটা অঞ্চলের আগো প্যালেস ওয়েতে মি. বিগস নামে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে। পরের বৈঠকগুলো হয় আকাপাতা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে মাতেনবাই হোটেলে এবং লাগোসের ইসলো এলাকার সেন্ট মেরি ক্যাথলিক চার্চ প্রাঙ্গণে। সেই ফাস্ট ফুডের দোকানের বৈঠকে রাজাহ আমাকে জানান, তিনি আমাকে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যেকোনো অঞ্চলের ভিসা জোগাড় করে দিতে পারবেন। সেই ব্যক্তি তার ভুয়া প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের বিশদ বিবরণ দিয়ে আমাকে জানান, তাদের নিয়ম অনুযায়ী ভিসা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের অর্থ নেওয়া হয় না। প্রাথমিক খরচ তারাই বহন করবেন।

ভিসার মূল্য পরিশোধের জন্য রাজাহ আমাকে যেকোনো একটি ব্যাংকে যৌথ হিসাব খোলার জন্য বলেন। সেখানেই ভিসা বাবদ আমার প্রদান করা অর্থ জমা থাকবে। যে মুহূর্তে দূতাবাস থেকে ভিসা অনুমোদন দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে জমা করা অর্থ তুলে নেওয়া হবে। ভিসা কেনার এই প্রক্রিয়ায় ক্রেতার যদি কোনো খটকা লাগে, তাহলে সে জমা করা অর্থ প্রত্যাহার করে বাড়ি চলে যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে একধরনের চোর-পুলিশ খেলার মধ্য দিয়ে। ইউক্রেন বা সিরিয়ার সস্তা এবং উল্টোপাল্টা ভিসা জোগাড় করে এরা গছিয়ে দেয় ক্রেতাকে অথবা দ্বিতীয় স্বাক্ষরটি জাল করার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ লোপাট হয়ে যায়। রাজাহ আরও প্রলুব্ধ করার জন্য আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে যাওয়ার ভিসা করে দেওয়ার টোপ ফেলে জানান দেন, এ কাজের জন্য তিনি সহজেই বতসোয়ানার পাসপোর্ট তৈরি করে দিতে অথবা সহজ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

রাজাহকে আমার বেকারত্বের কথা বলে নাইজেরিয়ার মুদ্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার নাইরা ভিসা ফি দিতে অপারগতার কথা জানাই। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। পরবর্তী ১০ মিনিট ধরে তিনি আমাকে নানান কথা বলে ওই পরিমাণ অর্থ আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে আরেকটি পরিকল্পনা আমার ওপর চাপানোর চেষ্টা করেন। সেটা ছিল মরুভূমি অতিক্রম করা। এই পন্থা সবচেয়ে কম খরচের হলেও কোনো ধরনের বিপদের কথা আমাকে সেই পাচারকারী বলেননি।

মরুভূমি দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর তারা আমার কাছে জানতে চান, আমি আগে কোনো দেশে গেছি কি না, আমাকে কোনো দেশ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না। তাদের প্রশ্ন ছিল, আমার কোনো ভাই বা বন্ধু কি ইউরোপে থাকে? আমি কত দূর লেখাপড়া করেছি? আমি কী ধরনের কাজ করতে জানি? চুল কাটা, ঝালাই বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি অথবা কাঠমিস্ত্রির কাজ আগে কখনো করেছি কি না? তারা আমাকে এ ধরনের কাজ লিবিয়ায় পৌঁছে দ্রুত শিখে নেওয়ার পরামর্শ দেন, তাতে আমার ইউরোপ গমন অনেক সহজ হবে।

দ্বিতীয়বারের মতো আমি তাদের জানাই, আমি স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং বেকার। আমার কথা শুনে পাচারকারী বলেন, "আপনার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে, তাতে চিন্তার স্তর অনেক উন্নত থাকার কথা। একজন নারী না হয়ে আপনার পক্ষে তো ইউরোপে গিয়ে কিছু করা কঠিন হবে। ভাই, আপনাকে মাথাটা আরেকটু খাটাতে হবে...।"

সেই মানব পাচারকারী খুব গর্বের সঙ্গে আমাকে জানান, অতীতে তিনি যেসব অভিবাসীকে দেশের বাইরে যেতে সাহায্য করেছেন, তাদের অনেকেই স্পেন, জার্মানি আর হল্যান্ডে ভালো অবস্থানে আছেন। সেই ব্যক্তি তারপর যা জানালেন, তা খুবই বিস্ময়কর। সম্ভাবনাময় অভিবাসনে ইচ্ছুকদের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। সেখানে অভিবাসনে ইচ্ছুকদের ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, ইন্টারনেটে জালিয়াতি, এটিএম জালিয়াতি, অস্ত্র ব্যবসার জালিয়াতি, অন্য মানুষের পরিচয় চুরি, শেয়ার সার্টিফিকেট দুর্নীতি এবং ঋণবিষয়ক জালিয়াতি, যা ৪১৯ নামেই বেশি পরিচিত, এগুলো শেখানো হয়।

এসব কথা শুনে প্রথমে মনে হয়েছে, একজন সাধারণ প্রতারক নিজের বাজারমূল্য বাড়ানোর জন্য এ ধরনের কথা বলছেন। কিন্তু রাজাহর হোটেলে জার্মানি থেকে প্রত্যাগত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি কৌশল পাল্টাই। সেই ব্যক্তি গাড়ি চুরি করে নাইজেরিয়ায় রপ্তানির ব্যবসা পাল্টে এখন জেনারেটর চুরি করা এবং সেগুলো রপ্তানি করার কাজ করছেন। আমি বিষয়টা বোঝার জন্য ৭০ হাজার নাইরা ব্যয় করে তিন মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ চলত রাতের বেলা একটি সাধারণ সাইবার ক্যাফেতে। হোলি স্যাভিয়র কলেজ রোডে ইসলো পাবলিক লাইব্রেরির ঠিক বিপরীতে একটি অর্ধসমাপ্ত ভবনের তিনতলায় ক্লাসগুলো নেওয়া হতো। অর্ধসমাপ্ত বাড়িটির প্রথম দুই তলা ছিল সবুজ রং করা। তৃতীয় তলাটি রং করা ছিল না এবং ঘরগুলো ছিল জানালাহীন। উগোও সেই কম্পিউটার জালিয়াতি প্রশিক্ষণ কোর্সের একজন ছাত্র ছিলেন। জিনসের প্যান্ট এবং সুতির শার্ট পরা উগোকে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে তিনি ইউরোপে যেতে চান।

আমরা সেমে সীমান্তে পৌঁছানোর পর সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা ছিল সহজ এবং স্বল্পায়ু। সেখান থেকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে মোটরবাইক নাইজেরিয়া ও বেনিন প্রজাতন্ত্রের মাঝ দিয়ে ঝোপ-জঙ্গলে আকীর্ণ একটি আঁকাবাঁকা পথে রওনা দেয়। সেই পথে কোনো উটকো অভিবাসন কর্মকর্তার আবির্ভাব ঘটলে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১০০ নাইরা। ওই পথে সাধারণত পাসপোর্টবিহীন লোকজন বেনিন সীমান্ত অতিক্রম করে থাকে। সেখানে গিয়ে তারা টমেটোর সস থেকে শুরু করে ব্যবহৃত পোশাক ও গাড়ি, হিমায়িত মুরগি কেনেন। যেহেতু আমাদের পাসপোর্টে সিল লাগানোর প্রয়োজন ছিল, তাই আমাদের নির্লজ্জ লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের মুখোমুখি হতে হয়। নাইজেরিয়ার অংশে প্রথমেই একজন অভিবাসন কর্মকর্তা পীত জ্বর বা ইয়েলো ফিভারের টিকার ছাড়পত্রের জন্য ১০০ নাইরা আমাদের কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে নিয়ে নেন।

পরবর্তী কর্মকর্তা আমার কাছ থেকে আরও ১০০ নাইরা আদায় করেন; কারণ, আমার পাসপোর্টে অন্য কোনো দেশে যাওয়ার ভিসা ছিল না। ওই সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সব ভ্রমণকারীর কাছে অন্তত একবার অবৈধ ভ্রমণ ফি বাবদ মোট অর্থের অর্ধেক দাবি করা হয়। সর্বশেষ পয়েন্টে আমাদের পাসপোর্ট একবার পরীক্ষা করার জন্য আদায় করা হয় ৫০০ নাইরা। সীমান্ত অতিক্রম করার পর বেনিনের চিত্র কমবেশি একই রকম ছিল। শুধু সেখানে তিনটি ডেস্কের পরিবর্তে ছিল দুটি ডেস্ক।

আমি, উগো আর মনডে সীমান্ত অতিক্রম করে বেনিনের কারাকে অঞ্চলে প্রবেশ করে সেখানকার নারী পাচার ব্যবসায়ীদের দালাল ধরে নাইজেরিয়ার মুদ্রা বদলে পশ্চিম আফ্রিকার মুদ্রা সংগ্রহ করি। তারপর আমরা চড়ে বসি একটা স্টেশন ওয়াগনে। সেখান থেকে ডান টপকা মার্কেটের কটনু, পার্সেলিতে পৌঁছাই এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে। সেখানে উগো ফোন করার ২৫ মিনিট পর রাজাহ আমাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ওভারব্রিজের কাছে। তিন সপ্তাহ আমাকে আমার নতুন পাসপোর্ট বুঝিয়ে দেওয়ার পর সেই প্রথম রাজাহর সঙ্গে দেখা হলো। আমার আসল পাসপোর্টে পেশা লেখা ছিল সাংবাদিক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স এবং আরও কয়েকটি দেশের ভিসা লাগানো ছিল। এ কারণে নিজের পরিচয় গোপন করতে আমাকে আরেকটি পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হয়।

আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় কটনু এলাকার জনকোয়েটের একটি ভবনে। সেখানে দেখতে পেলাম আগে থেকেই আরও চারজন তরুণী আছেন। তাদেরকে রাখা হয়েছে ভবনটির পেছনের দিকে মদের বোতলের খালি কাঠের বাক্স গাদাগাদি করে রাখা একটি ছোট ঘরে। আমাদের সেখানে রেখে রাজাহ বের হয়ে যান এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসেন সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী নিয়ে। তারা সবাই নারী। সন্ধ্যার দিকে কৃশকায় এক ব্যক্তি দুজন সেবাদাসী ধরনের কিশোরী নিয়ে ওখানে আসেন।

ঘড়িতে তখন ৭টা ২০ মিনিট। রাজাহর পেছন পেছন এক বিশালদেহী নারী দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। কিছু যাত্রীর সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় আছে বলে মনে হলো। মহিলাটি কাউকে কাউকে নাম ধরে সম্বোধন করে জানতে চাইলেন, রাতে তারা কী খেতে চায়? বিশালদেহী সেই মহিলা ঘরে মোট কতজন উপস্থিত আছে, তা গুনে নেন ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে। রাজাহ তাকে জানান, আরেকজন ব্যক্তি আসার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। সেই নারী উপস্থিত সবার উদ্দেশে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা দেন এবং জানিয়ে দেন, আমরা প্রত্যেকেই বিদেশের মাটিতে আছি। সেখানে কেউ ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে জানে না। মহিলাটি আমাদের এ-ও জানিয়ে দেন, বেনিনের সশস্ত্র পুলিশদের আচরণ খুবই অপ্রত্যাশিত ধরনের খারাপ হয়ে থাকে।

স্থূলকায় সেই মহিলা বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি না করার জন্য আমাদের সাবধান করে দেন। আমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই রাজাহ, সেই কৃশকায় ব্যক্তি; পরে যার নাম বলা হয়েছিল এসান এবং সেই মাহিলাকে জানাতে হবে বলেও নির্দেশ জারি করা হয়। আমাদের সঙ্গী কিশোরী মেয়েদের কথোপকথন এবং বাইরে মাইকে সারাক্ষণ উচ্চ স্বরে বাজতে থাকা গান শুনে আমি টের পেলাম, আমাদের কোনো একটি পতিতাপল্লিতে এনে রাখা হয়েছে। আমাদের যে ভবনটিতে রাখা হয়েছিল, সেটার কোনো নম্বর ছিল না। কিন্তু আমি আসার সময় দেখেছিলাম, জনকোয়েট এলাকায় সি-১১৫ ১১৬ এই ঠিকানায় হোটেল গোল্ড অ্যান্ড বেইজ থেকে চারটা বাড়ি দূরে এই ভবনের অবস্থান। এর উল্টো দিকে একটি ফিলিং স্টেশন এবং একটি ছোট পার্কিং এলাকা, যেখানে উন্মুক্ত শোয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

রাজাহ যে এক ব্যক্তির আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি এসে উপস্থিত হলেন পরদিন দুপুরের বেশ পরে। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের সেই অপেক্ষাগারে একটা সমস্যা দেখা দিল। প্রথম যে চারজন তরুণীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের একজন কাঁদতে শুরু করল। আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না তার কান্নার কারণ। যে মেয়েটি কাঁদছিল, তার বয়স বড়জোর ১৭। তাকে কাঁদতে দেখে প্রথমে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরে কান্নার কারণ আবিষ্কৃত হলে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। দুপুরের পর যে মেহমান সেখানে উপস্থিত হন, তাকে নিয়ে আসা হয়েছে নাইজেরিয়ার এদো এলাকা থেকে। সেই বিশালদেহী মহিলা যাকে সবাই "কুইন আন্টি" বলে সম্বোধন করছিল, অতিথির পরিচয় দেয় একজন আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে। কোনো সন্দেহ নেই সেই গুরু তার ভূমিকায় সেদিন চমৎকার অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমেই সেই গুরুর পরিচালনায় আমরা দীর্ঘ প্রার্থনাপর্বে যোগ দিই। বলা হয়, সামনে আমাদের দীর্ঘ পথ এবং সম্ভাব্য বিপদ দূর করতে

সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তবে প্রার্থনার পর ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের নামে যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হলো, তা ছিল আসলে একধরনের ডাকিনী বিদ্যার অংশ।

সেই ক্রন্দনরত কিশোরীকে ছাড়াই আমরা একজনের পর একজন ওই ভবনেরই প্যাকিং বাক্সে ঠাসা একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম নাইজেরীয় পদ্ধতিতে আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার একধরনের শপথবাক্য পাঠ করতে। যখন আমার ডাক পড়ল সেই কক্ষে রাজাহ এবং "আন্টি কুইন" বেশ কাঁচুমাচু হয়ে জানালেন, এই পথে সম্ভাব্য গ্রেপ্তার এড়ানো এবং ইউরোপ থেকে প্রত্যাবাসন আটকানোর জন্যই এই শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের শপথ অনুষ্ঠান গোপনীয়তা এবং আনুগত্যের ঘেরাটোপে থাকার জন্য আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য আমার সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা হয়েছে। সেই বৃত্তের ভেতরে পশুর চামড়ার খণ্ডাংশ, তিন মাথাওয়ালা বর্শা, একটা লাউ এবং আরও কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল। কথিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিটির শরীর আবৃত ছিল নকশাকাটা একটি সাদা কাফতান দিয়ে। তার পরনের প্যান্টের কোমরের কাছে একটি বুটিদার রেশমি কাপড় বাঁধা ছিল এবং ওপরে আরেকটি লাল রঙের স্কার্ট ধরনের কাপড় জড়ানো ছিল। ওই লাল কাপড়ের গায়ে ছিল অসংখ্য জরি দিয়ে মানুষের চোখের আকৃতির নকশা। ওই ব্যক্তি বিড়বিড় করে বেনিনের ভাষায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলছিলেন। এরপর আমাদের বলা হলো, সামনে রাখা লাউটা তুলে তিনবার কপালে এবং তিনবার বুকে ঠেকিয়ে বলতে যে আমরা যাত্রীরা সবাই পাচারকারীদের দয়ার সুবিধাভোগী। সেই আধ্যাত্মিক গুরুর বেশধারী ব্যক্তিটি আমাদের মুখে এবং মনে মনে নাইজেরিয়ার কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষের এক দেবতা অসুনেনেকে আহ্বান জানাতে বলেন। সেই দেবতাকে বলতে হবে, যদি আমরা কোনো অবস্থায় পুলিশ, অভিবাসন কর্মকর্তা বা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সামনে পাচারকারীদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিই, তাহলে যেন তার জোরালো বিষ, অসুখ, দুর্ভাগ্য এবং মৃত্যু আমাদের আঘাত করে।

চুক্তিপত্রে উল্লিখিত একটি ডলারও লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর অথবা তার আগেই যাত্রীরা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তারা যেন ওই দেবতার ক্রোধের শিকার হন এমন প্রার্থনাও আমাদের করতে বলা হয়। রাজাহর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে আরেকজন মানব পাচারকারীর সাক্ষাৎ হয়, যাকে অনেকেই আদর করে সম্বোধন করেন "থ্যাংক গড" (প্রকৃত নাম এখানে প্রকাশ করা হলো না)। লাগোসে এই সুদর্শন পাচারকারী প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে জানান, তিনি শুধু নারীদেরকেই লিবিয়া ও ইউরোপে পাচার করে থাকেন। আমার পক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের আর্থিক প্রস্তাব না পেয়ে তিনি অবাক হন। থ্যাংক গড আমাকে বলেন, এই নারীদের সম্ভাবনাময় কোনো দেশে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তাদের মুক্ত জীবন শুরু করার যে সুযোগ তিনি করে দেন, তার বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী তিনি পান ২৫ হাজার মার্কিন ডলার। এই পরিমাণ অর্থ কোনো পুরুষ একাধিক কাজ করেও তাকে পরিশোধ করতে পারবে না। এই পাচারকারীর আন্তর্জাতিক ফোন নম্বরটি আমি সংগ্রহ করি কৌশলে।

আমরা ফিরে যাই আগের কাহিনিতে। সেই ঘরে তান্ত্রিকের সামনে ডাক পড়ল আমার। লোকটা খুব অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলেন। একটা ধারালো ব্লেড নিয়ে তিনি আমাকে বললেন দুই হাত সামনে প্রসারিত করতে। আমি চমকে গিয়ে বলি, এইডস সংক্রমণের আশঙ্কায় ব্যবহৃত কোনো ব্লেড দিয়ে আমি নিজের হাতে আঁচড় দেব না। তখন রাজাহ ঘর থেকে আরেকটা নতুন ব্লেড বের করে ওই তান্ত্রিককে দেন। সেই ব্লেড দিয়ে লোকটা আমার প্রতিটি আঙুলের গাঁটে তিনটি করে পোঁচ দেন। আমার রক্ত নিজেই আঙুল দিয়ে মুছে নিয়ে একটা তরলের সঙ্গে মিশিয়ে সেই লাউয়ের ওপর ফেলেন। তারপর সেই একই ব্লেড দিয়ে তান্ত্রিক আমার ঘাড়ের পেছন দিকের কিছু চুল কেটে নেন এবং সেগুলো ওই লাউয়ের মধ্যে ফেলে দেন। তিনি আমাকে রক্তমিশ্রিত তরল পান করতে বলেন। সেই তন্ত্র সাধনার গতিপ্রকৃতি বুঝতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত আমি সেই তরল পান করি।

সেই সন্ধ্যায় ঘরের সবাই চুপচাপ হয়ে যায়। একমাত্র ১৭ বছর বয়সী সেই কিশোরী প্রায় মৃগীরোগীর মতো আচরণ করছিল। সে আমাদের সঙ্গে শপথবাক্যও পাঠ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘরের ভেতরে বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম, নারীদের বেলায় তন্ত্রসাধনার প্রক্রিয়াটা ছিল অনেক বেশি নিপীড়নমূলক। আন্টি কুইনের চাপাচাপিতে তান্ত্রিক তাদের হাতের আঙুলের নখ, যৌনাঙ্গের কেশ কেটে নিয়েছে এবং পরনের প্যান্টিও নিয়ে নিয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রলাপ বকতে বকতে মেয়েটি বলে, মনে হচ্ছে তার আত্মার একটি অংশই হারিয়ে গেছে। ২৪ বছর বয়সী উরিভা অবশ্য সেই কিশোরীর অনুভূতিটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। কারণ, তার অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ বড়। এ ধরনের রক্ত শপথ আগেও সে আরেকবার নিয়েছে। মানব পাচার ব্যবসায় আরেকজন দালাল যে "স্পন্সর" নামে পরিচিত, তার মাধ্যমে সে ২০০৫ সালে ইতালিতে চলে যায়। অবশ্য ১৮ মাস পরেই ২৪ বছর বয়সী উরিভাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে আসার পর থেকে উরিভার কাছে নিজের

অবস্থাটা ডাঙায় তোলা মাছের মতো। ইতালির টুরিন থেকে প্রায় এক কাপড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু ইতালির ওই শহরে তার কিছু সম্পত্তি এবং কয়েকজন ভালো ছেলেবন্ধুও থেকে গেছে। এসব সম্পর্ক এবং সম্পত্তি তাকে পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে। প্রথমবার উরিভা ইতালিতে গিয়েছে বিমানে চেপে। দ্বিতীয় সুযোগে সে একটু বেপরোয়া; যেকোনোভাবেই সে দেশের বাইরে চলে যেতে চায়। টুরিন থেকে প্রত্যাবাসিত হয়ে আসায় তাকে পুরো অর্থ দালালকে দিতে হয়নি। কিন্তু এখনো তার মাথার ওপর ঝুলছে কয়েকটি ঋণের বোঝা। উরিভা তাই দ্বিতীয়বার বিদেশে গিয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতে চায়। সে স্বপ্ন দেখে, প্রবাসে গিয়ে আয় করে গ্রামে ছোট একটা ঘর বানাবে। গাড়ির মালিক হবে, ব্যাংকে মোটা অঙ্কের অর্থ থাকবে, একটা বিউটি পারলার অথবা পোশাকের দোকান করতে পারবে।

গবাদিপশুর মতো আমাদের দলটাকে সেই কৃশকায় এসান তাড়িয়ে নিয়ে আসে নিকটবর্তী একটা খাবারের জায়গায়, যেখানে আমরা নাইজেরীয় খাবার খেতে পারি। আমাদের মধ্যে সেই ১৭ বছর বয়সী কিশোরী ওমোসান কোথাও যেতে রাজি হয় না। সে প্রায় সারা দিন কোনো খাবার না খেয়েই ছিল। আর তাতে "আন্টি কুইন" তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। গালাগাল করতে করতে সেই বিশালদেহী নারী বলেন, "তোমার এই ফালতু আচরণ অনেক হয়েছে। আমি তোমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেছি, কিন্তু তুমি খামখেয়ালি আচরণ করে আমার ব্যবসার বারোটা বাজাতে চাইছ। আমার কাছে আরও অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তোমার বাবা-মা অনেক অনুরোধ করায় আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি। আর তোমরা এখানে এসে শিশুদের মতো আচরণ করছ।"

ঠিক ওই সময়ে রাজাহ ঘরে ঢুকে ওমোসানকে গালাগাল করতে করতে তার সেলফোনটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো।"

ওমোসান তখন আর কান্নাকাটি করছিল না। তবে সে কিছু বলছিলও না। রাজাহ তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্যান্টের বেল্টটা খুলে তাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হয়ে বলেন, "আমি বলছি, ফোনটা ধরো। তোমার বাবা বলে দিয়েছে, অন্য মেয়েরা যা করবে, তোমাকে দিয়েও তাই করাতে।"

টোগোর পথে যূথবদ্ধ যাত্রা

আমাদের পশুর পালের মতো আবার তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটি গাড়ি পার্কিংয়ে। এবার টোগোর পথে যাত্রা। রাজাহর অনাচারী মন তখন পূর্ণ চন্দ্রের মতো বিকশিত হয়ে উঠছে। সকালবেলা আচমকাই আরও আটজন নারী তাদের ব্যাগপত্রসমেত উপস্থিত হলো। তারা কোত্থেকে এসেছে, তা অনুমান করার আগে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো জনকোয়েটে যৌনপল্লিতে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। ইউরোপ ও লিবিয়ায় মানুষ পাচার করা ছাড়াও সাহারা মরুভূমির দুদিকের দেশগুলোর যৌনপল্লিতে নতুন নতুন নারী সরবরাহ করাটাও মানব পাচারকারীদের বড় একটি ব্যবসা।

আমাদের দলের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয় উরিভাকে। ওমোসান উরিভাকে বলে, সে ইউরোপে যাবার সুযোগ পেলে খুবই আনন্দিত হবে। কিন্তু ওই ধরনের রক্ত শপথে অংশ নেওয়ার আগে সে প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবে। ওমোসান অবশ্য আমাদের বুঝতে দেয়নি যে ইউরোপে পাচার হওয়ার পর নারীদের জন্য কী ধরনের কাজ তৈরি রাখা হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইউরোপে পাচার হয়ে যাওয়ার পর এই নারীরা পুরুষদের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে বাধ্য হন। তাদের কাউকে কাউকে জোর করে পর্নো ছবিতে অভিনয় করতেও বাধ্য করা হয়। সেখানে তাদের বিকৃত যৌনতারও শিকার হতে হয়। এ ধরনের পাশবিক যৌনাচারের অংশ হিসেবে নারীদেরকে কুকুরের সঙ্গে সহবাসে বাধ্য করা হয়।

ওমোসানের ভাগ্যে কী ঘটবে, তা স্থির করার দায়িত্ব রাজাহর। টোগো-যাত্রী আমাদের ১৩ জনের দলটাকে গুছিয়ে নেন "আন্টি কুইন"। আমাদের দলে চারজন পুরুষের সঙ্গে ছিল নয়জন নারী। আন্টি কুইনের সাজটা ছিল দেখার মতো। নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারীর আদলে ঢেকে ফেলতে তিনি পরেন 'বউবউ' নামে আফ্রিকার একটি বিশেষ ধরনের পোশাক। সেটার রং ছিল কমলা। মাথা ও কাঁধ ঢেকে নেন বড় একটি স্কার্ফ দিয়ে। আমাদের যাত্রা শুরু হয় কুইদা, দোহি, আগাটোগোবো, গাডোমি, কোম, গ্র্যান্ড পেপো হয়ে টোগোর রাজধানী লোমের উদ্দেশে।

বেনিন ও টোগোর সীমান্তকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় হিল্লা কনডিজি। সেখানেও সামের মতো একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেখানে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের নির্লজ্জ চাঁদাবাজি ইসিওডব্লিউএএস (ইকোনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেট)-এর দলিলের প্রতিটি শব্দ এবং আবেগকে যেন সরাসরি অপমান করছে। এই সংগঠনের দলিল প্রত্যেক সদস্য দেশের নাগরিক এবং পণ্যের অবাধ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান করে। ওই সীমান্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দোসু গিলেস-কার্লোস ইয়াওভির সঙ্গে। জাতিসংঘের একজন দূত হিসেবে তার পিতা তখন হেতিতে কর্মরত ছিলেন।

লোমেতে আমাদের বুলভার দ্যু হাহোর পাশে দুটি ঘর এবং একটা উঠান ঘেরা বাড়িতে রাখা হয়। জায়গাটা ছিল ধূলিধূসরিত। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়, সেখানে একটি পরিবারের বসবাস। সেই দরিদ্র পরিবারের বিনয়ী অল্প বয়সী সদস্যরা ছিল ইংরেজি, ফরাসি, বেনি, ইওরুবা এবং ভাঙা ভাঙা আরবি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারা মানব পাচারকারী আন্টি কুইনের খুবই অনুগত। পরবর্তী তিন দিন ওই বাড়ির তিনটি কিশোরী এবং ৯ বছর বয়সী বালক আমাদের জন্য পানি আনা এবং দোকানে ছোটাছুটির কাজ নিরন্তর করে গেল। আমরা তিন দিন ওই পরিবারের আতিথেয়তায় ছিলাম। আন্টি কুইনের সঙ্গে এই পরিবারের পরিচয় কীভাবে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন! সেই দরিদ্র পাড়ার বাড়িগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো ঠিকানা ছিল না; তবে আশপাশে আফ্রিকা বার অথবা ইংলিশ অ্যাপস্টলিক চার্চ দেখে বাসাগুলো চেনা যেত।

পরদিন সকালে কুইন দলের আটজন মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন এবং বিকেলে ফিরে এলেন আরেক দল মেয়ে নিয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন আমাদের টোগো থেকে চলে যাবার কথা। কিন্তু কুইন ফিরে এসে আবিষ্কার করেন, আমাদের পরবর্তী যাত্রাস্থল বুরকিনা ফাসো যাওয়ার জন্য আগামী দুই দিন কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে না। হয়তো একঘেয়েমি থেকে অথবা সত্যি সত্যি ঈশ্বরের কৃপা চাওয়ার জন্য কুইন ঠিক করেন, আমরা একটি চার্চের প্রার্থনাসভায় যোগ দেব। আমাদের কারও কাছেই কুইনের পরিকল্পনাটি মন্দ লাগেনি। আমরা সবাই হেঁটে পাশেই একটি পেন্টেকোস্টাল চার্চে গেলাম, যার যাজক ছিলেন নাইজেরিয়ার অধিবাসী। চার্চের দেয়ালে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল "হাউস অব এক্সেলেন্স চার্চ"। পাশাপাশি ফরাসি ভাষায় একই কথা লেখা ছিল দেয়ালে। লোমে শহরে এ রকম ডজনখানেক চার্চ আছে নাইজেরীয়দের উপাসনার জন্য। এই চার্চগুলোতে ইংরেজিতে প্রার্থনাসভা পরিচালনা করা হয়। প্রার্থনা চলার সময় আমি ওমোসানের কথা ভাবছিলাম। মেয়েটির ভাগ্যে কী আছে, তা ভাবতে ভাবতে আমি প্রার্থনা শেষ হওয়ার আগেই চার্চ থেকে বের হয়ে একটা ফোন বুথ খুঁজে ফোন করি কটনুতে থাকা বেনিনিজ সাংবাদিক গডফ্রিয় নাকেয়ার চাবিকে।

বুরকিনা ফাসো থেকে লোমে যাওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা অনিয়মিত। গণপরিবহন চলাচলের বিষয়টা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে বুরকিনা ফাসোর ব্যবসায়ীদের ওপর, যারা লোমে শহরে আসে হাটবাজার করতে। আমরা লোমে থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে যাই সোগোদে, সেখান থেকে কারা হয়ে টোগোর সীমান্তবর্তী শহর বিটাউ ঘুরে বুরকিনা ফাসোর সীমান্তের কাছে সিকাঞ্জে হয়ে কাউপেলা, ওগুয়াডগু এবং বোবো ডিউলাসো নামের জায়গাগুলো আমরা অতিক্রম করি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আশাতীতভাবে এই দীর্ঘ যাত্রা শেষ করতে সময় লাগে তিন দিন। যাত্রাপথে অনেকবার আমাদের বাস নষ্ট হয়ে যায়। বাস মেরামত করে আমরা দিনরাত অবিরাম চলতে চলতে পথিমধ্যে একটা অজানা জায়গায় যাত্রাবিরতি করি। সেখানে একটি খামার থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমরা ফলমূল আর সেদ্ধ আলু কিনি। কৃষকেরা বেশ দূরের একটি স্থানীয় বাজার থেকে এগুলো বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। কাউপেল্লা নামের একটি শহরে এসে আমাদের বাস পুরোপুরি বিকল হয়ে যায়। আমাদের রাত কাটাতে হয় একটি চায়ের দোকানের পাশে। আমি কাছেই একটি মসজিদে ঢুকে পশ্চিম আফ্রিকার মুদ্রায় ১০০ ফ্রাঁ ব্যয় করে দাঁত মাজা, গোসল এবং পরনের পোশাক ধোয়ার সুযোগ পাই। সেখানে একটি কাঁচা পায়খানাও ছিল।

আমরা ওগুয়াডগু পৌঁছে রাজাহর দেখা পাই। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওখানে কুইন মেয়েদের আলাদা করে ফেলেন এবং আমাদের বলেন বোবো ডিউলাসো চলে যাওয়ার জন্য। সেখানে আমাদের জন্য কোনো ধরনের শোয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সবাইকে গাড়ির পার্কিংয়ে পায়চারি করেই অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী যাত্রার জন্য। বুরকিনা ফাসোতে অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা বেশ বড়; তারা এসেছে নাইজেরিয়া, ঘানা, কোতে দ্য আইভরি থেকে এবং সবাই নাইজার রিপাবলিক বিশেষ করে দেশটির রাজধানী নিয়ামেতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানেই এই রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয় কেনেথ কুইককয়ে নামে এক নাইজেরীয় নাগরিকের সঙ্গে। সে জানায়, তার যাওয়ার কথা ব্যাংককে। কিন্তু তাকে সেই ভ্রমণবিষয়ক কাগজপত্র আনতে যেতে হবে সেনেগালে। গত রাতটা সে যে একটি গাড়ির পার্কিংয়ে ঘুমিয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে সমস্ত শরীরে লেগে আছে লাল মাটি। সারা রাত ওই পার্কিংয়ে মাইকে উচ্চ স্বরে আলফা ব্লন্ডির গান বেজেছে।

পরদিন সকালে কুইন আসেন আরও ১১ জন মেয়ে নিয়ে। বুরকিনা ফাসোতে যেসব অভিবাসনপ্রত্যাশী এসে জমা হয়, তাদের অধিকাংশই নাইজেরিয়ার ইওরুবা এবং আইবো গোত্রের মানুষ। উরিভা আমাকে জানায়, নতুন আসা মেয়েদের দলটির অধিকাংশকেই আনা হয়েছে ওয়াগা দ্যু মিল নামে একটি জায়গা থেকে। জায়গাটা রাজধানীরই একটি অংশ। স্থানীয়দের কাছে নারী পাচার কারবারে এটি একটি ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে বেশি পরিচিত। ওয়াগা ২০০০ নামে জায়গাটাকে সবাই চেনে। জনকোয়েটের মতো কোটোনুর এই জায়গায় অসংখ্য যৌনপল্লি গড়ে উঠেছে। অনুমান করা হয়, প্রায় ২৫০ জন নাইজেরীয় নারী ওয়াগা দ্যু মিলের যৌনপল্লিগুলোতে দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে।

সুবিধাজনক নয় জেনেও আমরা 'ফ্যাসোকার' নামে একটি পরিবহন কোম্পানির বাসে চড়ে মালে ত্যাগ করলাম। বুরকিনা-মালে সীমান্তে এমন এক ঘটনা ঘটল, যাতে আমার গোপনীয়তার পর্দা প্রায় ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়। সীমান্তে আমার পাসপোর্টে পশ্চিম আফ্রিকার মুদ্রা ৩০০০ সিএফএ-এর বিনিময়ে সিল দিচ্ছিলেন এক কর্মকর্তা। সেখানেই আরেক কর্মকর্তা আমার পরনের জ্যাকেটের গোপন পকেটে রাখা একটি ক্যামেরা আবিষ্কার করে ফেলেন। ক্যামেরা দেখে তাদের সন্দেহ হয় এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাগ খুলে পেয়ে যান নোটবুকটি। তারপরেই শুরু হয় আমার প্রতি তাদের প্রশ্নবাণ। আমি আসলে কে, কোথায় যাচ্ছি, আমার উদ্দেশ্যই-বা কী– এ রকম অসংখ্য প্রশ্নে তারা আমাকে জর্জরিত করে তোলে। তারা আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে হাজির করে উরবেইন গনুমউ নামে এক পুলিশ কর্মকর্তার সামনে। তার টেবিলের পেছনের দেয়ালে ঝুলছিল দেশটির প্রেসিডেন্ট বালাসি ক্যাম্পরির একটি ছবি আর তার কোমরে ঝোলানো ছিল পিস্তল। ওই কর্মকর্তার কাছে ফরাসি ও ইংরেজি মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে বলি যে, আমি একজন স্কুলশিক্ষক। আমি মালিতে যাচ্ছি একজন অসুস্থ নাইজেরীয় নাগরিককে দেখতে। কর্মকর্তা আমাকে প্রথমেই জানালেন, একজন সাংবাদিককে তাদের দেশে প্রবেশ করতে অথবা সে দেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশে যেতে চাইলে অবশ্যই নিজ দেশের দূতাবাস থেকে একটি লিখিত অনুমতিপত্র আনতে হবে। আমি আমার বক্তব্যে অনড় থাকলেও তারা কেউ বিশ্বাস করল না। শেষে তারা বিষয়টা সমাধান করার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেয় মালে সীমান্তের হেডামাকুনুতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মালে সীমান্তের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা বিষয়টা নিয়ে মাথাই ঘামাল না। আমি আবার যাত্রা করলাম হেডামাকুনু থেকে সিকাজউয়ের উদ্দেশে। সেখান থেকে বোগোনি হয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম বামাকোতে।

প্রথমেই মরে যায় স্বপ্ন

আমরা বামাকো পৌঁছলাম ভোর চারটায়। সাদিয়ানকোরো নামের বাসস্ট্যান্ডে নেমে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে এ পথে পাচার হয়ে আসা আফ্রিকান মানুষদের পরিণতিটা স্পষ্টই বোঝা যায়। সেখানে প্রায় ৪০ জন তরুণ গাদাগাদি করে শুয়ে ছিল। খবর নিয়ে জানা গেল, তারা প্রত্যেকেই অভিবাসী এবং মালেতে এসে তারা সবাই যেন এক অন্ধ গলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই তরুণদের বেশির ভাগই ছিল নাইজেরিয়া থেকে আগত। তাদের হাতে কোনো অর্থকড়ি ছিল না, ছিল না কোনো গন্তব্যও। বেঁচে থাকার জন্য তারা নানান ধরনের দালালি আর অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমি পরবর্তী সময়ে গেকোরনি, জেবেনিকোরো এবং দাবানানি নামের শহরগুলোতে এ ধরনের মানুষ অনেক দেখতে পেয়েছি। তাদের সঙ্গে যে নারীদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের বেশির ভাগেরই জায়গা হয় ইয়ামাকোরোর হোটেল কোকোতি, আমাদিনা, ডোমিনো, কায়ে এবং মানির মতো বারগুলোতে যৌনকর্মী হিসেবে। তাদের বেশির ভাগই ছিল নাইজেরিয়া থেকে আসা। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মালেতে এ ধরনের ভাসমান নাইজেরীয় নারীর সংখ্যা ১ হাজার ৪০০। তারা প্রত্যেকেই ইউরোপ যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ওই শহরে এসেছিল।

আমাকে শহরটা ঘুরে দেখতে সহায়তা করে 'রাসতাফারিয়ান' স্টাইলে চুল কাটা এক গায়ানিজ নারী। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে আমি জানতে পারি, মালের এই পরিস্থিতি অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশীর চোখ খুলে দিচ্ছে। ২৭ বছর বয়সী নাইজেরীয় তরুণ আজিজ আবিওলার সঙ্গে কথা হয় আমার। সে জানায়, ২০০৭ সালে সে প্রথম যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছিল, তখন একজন মানব পাচারকারী তাকে বলেছিল, বামাকো পৌঁছানোর পর তাকে ইতালিগামী একটি বিমানে তুলে দেওয়া হবে। আজিজ সেই ব্যক্তিকে ৬ লাখ নাইজেরীয় মুদ্রা দিয়েছিল খরচ হিসেবে। কিন্তু মালেতে আসার পর থেকেই সেই পাচারকারী তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। তারপর একটা সময়ে সে ছাড়াও আরও চারজনকে ভাগ্যের হাতে ফেলে দিয়ে সেই লোক উধাও হয়ে যায়। আজিজের ভাষ্য অনুযায়ী, মালেতে নিয়ে আসা বেশির ভাগ নারীকেও এই একই গল্প গেলানো হয়েছে। একদা পেশায় কাঠমিস্ত্রি আজিজ এখন আক্ষেপ করেন তার আগেকার গোছানো জীবনের জন্য। নাইজেরিয়ার ওগুয়ান রাজ্যের আইফোর বাসিন্দা আজিজ এখন বাসস্ট্যান্ডে একটি বাস কোম্পানির হয়ে যাত্রী ডেকে ডেকে বাসে তোলার কাজ করেন।

আজিজের মতো আমিও সেখানে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ি। উগো আর মনডের সঙ্গে আরও তিনটা দিন কেটে যায় ওই বাসস্ট্যান্ডেই। যথারীতি আন্টি কুইনও নারীদের নিয়ে উধাও হয়ে যান। বুরকিনা সীমান্তের ওই ঘটনার পর থেকে তাকে সব সময় উদ্বিগ্ন দেখতাম। সীমান্তের ওই ঘটনার বিষয়ে তিনি আমাকে কোনো প্রশ্নও করেননি। ওগুয়াডগুর ঘটনার পর আমরা কেউ রাজাহকেও দেখিনি। রাজাহকে আমি আমার খরচ হিসেবে দিয়েছিলাম ২ লাখ নাইজেরীয় মুদ্রা।

সাদিয়ানকোরোতে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষের আগমন ঘটছে। তাদেরই একজন গিনি থেকে আসা দিয়াওয়ারা বোহ। ২৯ বছর বয়সী দিয়াওয়ারাকে কয়েক বছর আগে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করে লাইবেরিয়ার বিদ্রোহীরা। এই তরুণ যুদ্ধ শেষে পরবর্তী দশ বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে একটু ভালো আর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায়। দিয়াওয়ারা কোতে দ্য আইভরি, ঘানা, সিয়েরা লিওনে বসবাস করেছে কিছু সময়। নাইজেরিয়ায় সে মিকানো নামে লেবাননের একটি কোম্পানির বিশাল বিশাল জেনারেটর বহনকারী ট্রাকের চালক ছিল। কিন্তু ২২ হাজার নাইজেরীয় মুদ্রা মাসিক বেতনে তার পেট চলত না।

দিয়াওয়ারা নিজের জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন, "জীবনের উত্থানপতন আমাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ১০ বছর বাবা-মায়ের দেখা পাইনি। লেবাননি মালিকের কোম্পানিতে দাসের মতো জীবন কেটেছে। আপনার কাশি হলেও সেখানে টাকা কেটে রাখা হতো। আপনার অসুখ হলে এবং আপনি কাজ করতে না পারলে তারা টাকা দেয় না। কাজ করতে গিয়ে আহত হলেও তারা বেতন থেকে চিকিৎসার ব্যয় কেটে রাখে। নাইজেরিয়াতে আমার জীবনটা সুখের না হলেও লাইবেরিয়ার জীবনের মতো এতটা খারাপ ছিল না। বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ার পর তারা দেখে যে আমি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি। তখনই তারা আমার হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেয়। আমি গিনির জেজেডোর মানুষ। লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওনের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত আছে। দুই মাস আমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিলাম। তারপর একদিন একটা নদীকে অনুসরণ করে গিনিতে পালিয়ে গেলাম।"

আফ্রিকা থেকে আগত এই তরুণদের মধ্যে আরও দুজনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। তাদের একজন পেট্রস মাসাগেলোই এবং অন্যজন সিসে কোনি। দুজনেই সিয়েরা লিওনের নাগরিক এবং অনেক বছর নাইজেরিয়ার ওরু ক্যাম্পে শরণার্থী হিসেবে ছিলেন। তারা সেখান থেকে এদিকে এসেছেন নতুন জীবনের সন্ধানে।

যুদ্ধ চলাকালে দুজনের মধ্যে একজন নৃশংস নারী হত্যা আর শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে ফেলার দৃশ্য দেখেছেন। তিনি দেখেছেন নাইজেরিয়ানদের কীভাবে গলায় দড়ি বেঁধে দড়ির আরেক মাথা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে চলন্ত গাড়ির পেছনে। তারপরেও ঝুঁকি নিয়ে সেই ব্যক্তি তার বোনের স্বামীর জীবন রক্ষা করেন। পরে একদিন কয়েকজন বিদ্রোহী যখন তার খালাকে রকেট প্রোপেলড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে উড়িয়ে দেয়, তিনি পালিয়ে নাইজেরিয়ায় চলে আসেন। সেখানেই তিনি স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেন। কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও চাকরি জোটে না তার কপালে। তাই রঙের কাঁচামাল বিক্রি শুরু করেন তিনি। তারপর একদিন তার হাতে শেষ খড়কুটো হিসেবে আসে ইউএনএইচসিআর কর্তৃক প্রদত্ত শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য কিছু অর্থ, যার পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার নাইজেরীয় মুদ্রা। অবশ্য তিনি আশা করেছিলেন, ৩ লাখ ৫০ হাজার নাইজেরীয় মুদ্রা তিনি পাবেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আগাদেজ। জায়গাটা উত্তর নাইজারে অবস্থিত। কুইন আন্টি এসে জানান, আমরা পরের দিন রওনা দেব এবং তিনি আরও জানালেন, আমাদের দলটাকে দুভাগে বিভক্ত করা হবে সমন্বয়ের সুবিধার জন্য। যাত্রা শুরু করার আগে গির্জায় যাওয়া এদের কাছে সংস্কারের মতো। এবারও আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো চ্যাপেল দে ভ্যানকিউয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি গির্জায়। রাতে বাসস্ট্যান্ডে থাকার সময় আমি অভিবাসনের জন্য নকল কাগজপত্র তৈরির একটি চক্র আবিষ্কার করে ফেলি। লাগোসের একদা কুখ্যাত ওলুওয়ালে অঞ্চলে জাল কাগজপত্র তৈরি বিষয়টা প্রায় শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এখানেও সেই চক্র একই কায়দায় অভিবাসনপ্রত্যাশী এবং দালালদের ভুয়া পাসপোর্ট থেকে শুরু করে নানা ধরনের রোগের টিকার মিথ্যা সনদ সরবরাহ করে।

কুইন বামাকোতে কতজন নতুন নারীকে নিয়ে এসেছেন, তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, তারা একটি আলাদা বাসে ভ্রমণ করছিল। আমিসহ চারজন পুরুষ আর দুটি মেয়ে ছিল আরেকটি বাসে। দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল এসান। আগাডেজে এসে আমাকে ভাড়া হিসেবে গুনতে হলো মধ্য আফ্রিকার মুদ্রা ৮০ হাজার সিএফএ। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় গাও নামে একটি জায়গায়। সেখান থেকে আমাদের আরেকটি নতুন বাসে চড়ে যাত্রা করতে হবে। বলে দেওয়া হলো গাওতে এক ব্যক্তি আমাদের নতুন বাসে তুলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে, যার নামটা টিকিটের পেছনে লেখা আছে। বামাকো থেকে সেখানকার দালালটি ওই ব্যক্তিকে ফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছিল। সকাল ১০টায় আমরা মোটরবাইকে চড়ে পার্ক থেকে সোনেফ ট্রান্সপোর্ট ভয়েজার্সের বাস টার্মিনালে যাই। সোনেফ লাইনের গাও যাওয়ার বাসের টিকিট ১৫ হাজার সিএফএ। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক আওয়াইলে আরও ১০ হাজার সিএফএ ওই বাসের কন্ডাক্টরকে দিতে প্রায় বাধ্য করে। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণ হিসেবে আমাদের বলা হয়, পথে চেক

পয়েন্টগুলোতে কোনো ঝামেলা হবে না। আমরা বামাকো থেকে ফানা হয়ে সেগু, বালা, মপটি, সেভারে, ডুয়ানজা এবং গসি হয়ে পৌঁছাই গাওতে। গন্তব্যে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগে দুদিন।

ফোনে যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে স্টপেজে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে তার লোকজনও ছিল মোটরবাইক নিয়ে। গাওতে নেমে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ, গাও প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক একটি শহর। প্রাচীন সময়ের আসকিয়া মোহাম্মদ মালের এই পুরো অঞ্চল শাসন করতেন। তবে পুরোনো শহরটি আমার ভালোভাবে দেখা হয়নি। মোটরবাইক চালক নানান আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমাকে শহরটি অতিক্রম করে অন্য জায়গায় নিয়ে আসে। সেটা ছিল একটি গোপন আস্তানা। পুরো জায়গাটা ছিল বালুর রাজ্য। একই রকম দেখতে ঘরবাড়িগুলো ছিল কাদা আর ইট দিয়ে তৈরি। সেখানেই আমাদের আচমকা ঘেরাও করে গুন্ডা শ্রেণির একদল লোক। তাদের নেতা ছিল মোহাম্মদ নামে একজন আলজেরিয়ান। সেই ব্যক্তি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করে, "তুমি কি নাইজেরিয়ান? তুমি ইবো?"

মোহাম্মদ প্রথমেই একধরনের অনুশোচনামাখা কণ্ঠে আমাকে জানায়, আমি মন্দ লোকেদের পাল্লায় পড়ে গেছি। তবে সে আমাকে সাহায্য করবে। কারণ, নাইজেরীয়দের মরুভূমি পার করে দেওয়ার কাজটা সে করে এবং ইবো সম্প্রদায়ের বহু লোক তার বন্ধু। পরবর্তী ১০ মিনিট নিজের দলবলের সঙ্গে আলোচনা করে মোহাম্মদ জানায়, এরা আমাকে আটক করেছে; তাদের অর্থকড়ি দিতে হবে। পাশাপাশি সে এই ফরমানও জারি করে যে, তার দলের লোকেদের ৪০ হাজার বা ৭০ হাজার সিএফএ দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি আমাদের বাস স্টপেজ থেকে নিয়ে এসেছে, সে ঠিক ওই মুহূর্তে আমাকে একটা চড় মারে। তারপর আমার মুখে আর পেটে ঘুষি মারে। সে আমার কাছে থাকা সব ইউরো অথবা ডলার তাকে দিয়ে দিতে বলে। এই ব্যক্তির সঙ্গে তখন মোহাম্মদের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। আমি তখন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কায় ওই ব্যক্তিকে আমার সব সিএফএ এবং ডলার দিয়ে দিই। আমার কাছে অবলম্বন হিসেবে পড়ে থাকে ৯ হাজার নাইজেরীয় মুদ্রা নাইরার নোট। দুজনের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানেই মোহাম্মদ আমাকে টানতে টানতে একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে মাটিতে কম্বল পেতে দুজন তরুণী শুয়ে ছিল। দৃশ্যটা দেখে আমার আর বোঝার কিছু বাকি ছিল না। তাদের দেখেও মনে হলো, ঘরের বাইরে যে এত হইচই হচ্ছে, তারা সেটা টেরই পায়নি অথবা এ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা অভ্যস্ত। ইতিমধ্যে আমার ভ্রমণসঙ্গীদেরও আর কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত তাদেরকেও আলাদা করে অন্য একটি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আধঘণ্টা পর মোহাম্মদ আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। সেখানে আরেকটি মোটরবাইক অপেক্ষা করছিল। মোহাম্মদ আমাকে তড়িঘড়ি করে সেই বাইকে তুলে দিয়ে বলে, "এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করো।" সেই চালক আমাকে গাওয়ের একটি কাস্টমস পোস্টে নিয়ে আসে এবং মৌলে ওলুদ নামে একজন অফিসারের কানে কানে কিছু বলে দেয়। সেই অফিসার আমাকে একটি মিনিবাসে তুলে শহর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

একজন পরোপকারীর সঙ্গে

সেই অগ্নিপরীক্ষা থেকে বাসে চড়ে পলায়ন আমার জন্য স্বস্তিদায়ক হয়নি। গাও থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামের পথে বাসটির যাত্রা শেষ হয়। সেই গ্রামের কোনো বাসিন্দা ইংরেজি ভাষা জানে না। আমার পকেটে যে কয়েকটা মুদ্রা অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে ৩০০ সিএফএ রেখে বাকিটা দিলাম গাওয়ে ফিরে যাবার জন্য। কারণ, ওই শহরটাই তখন আমি চিনি। পরের দুই দিন আমার কাটল কোনো খাবার এবং পানি ছাড়া। আমার কাছে যে কয়েকটি নাইরা ছিল, সেগুলো এই অঞ্চলে অচল। ফলে কিছু কিনে খাবার উপায় নেই। সেই গভীর নিঃস্বতার অনুভূতির মধ্যে দ্বিতীয় দিনের শেষে আমি পানি ভিক্ষা চাওয়ার জন্য পথে নামি।

প্রকৃতপক্ষে মালে শহরের বাসিন্দারা আলজেরিয়া অথবা লিবিয়া যাওয়ার পথে অভিবাসী মানুষের এই করুণ চিত্র দেখে দেখে অভ্যস্ত। হয়তো এটা কিছুটা একঘেয়েও তাদের কাছে। তবে তখন আমার দুর্দশা চরমে। এ সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন আলিউ মেগা নামে ৬২ বছর বয়সী এক পরোপকারী ব্যক্তি। এই বয়স্ক মালেবাসী ভদ্রলোক জানান, তিনি দীর্ঘদিন নাইজেরিয়ার লাগোস, বেনিন সিটি এবং আবুজায় ছিলেন। তিনি আমার জন্য খাবার, পানি আর মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করে দেন। আমার নাইরা মুদ্রা বদলে সিএফএ মুদ্রাও জোগাড় করে দেন লোকটা। সেই দয়ালু মানুষটি আমাকে আগাদেজগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাকে তুলে দেন। আমার কাছে এটা স্বপ্নের মতো। আমি তার ফোন নম্বর নিলাম জরুরি প্রয়োজনের জন্য। সেনা ফাঁড়ি আর মরু শহর কিদাল্লি ও কালিল্লি পার হয়ে আগাদেজ পৌঁছাতে আমার চার দিন সময় লাগে।

আগাদেজ

লাগোস থেকেই আমাকে উত্তর নাইজারে টুয়ারেগ বিদ্রোহীদের প্রলম্বিত যুদ্ধের বিষয়ে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, এই যুদ্ধের কারণ আগাদেজ ভ্রমণকারীদের জন্য খুবই অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। টুয়ারেগ জনগোষ্ঠীর কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে। পূর্ব নাইজার এলাকায় ভ্রমণের জন্য সবারই সরকারি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। তবে ধনী ভ্রমণকারীদেরকেও ওই অঞ্চল ভ্রমণের ছাড়পত্র সহজে দেওয়া হয় না। আগাদেজ ভ্রমণের একমাত্র উপায় বেআইনি পন্থা। সেখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মনে করে, যেকোনো ভ্রমণকারী বিদ্রোহীদের সাহায্য-সহযোগিতা দিতে পারে। তাই যে কাউকেই তারা বিনা কারণে আটক করার ক্ষমতা রাখে। সেখানে প্রায়ই দেখা যায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা মরুভূমির মাঝখানে যাত্রীদের জোর করে বাস থেকে নামিয়ে আরেকটা বাসে তুলে যেদিক থেকে এসেছে আবার সেদিকেই পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেও আগাদেজ ইউরোপে যাওয়ার জন্য অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি অবধারিত ট্রানজিট পয়েন্ট। এই শহর মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী এবং যৌনকর্মীদের জন্যও স্বর্গরাজ্য।

ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ ওই শহরে পৌঁছানোর পর আমি নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, ঘানা, মালে, লাইবেরিয়া, গিনি বিসাউ, টোগো এবং গ্যাবন থেকে আসা শত শত অভিবাসীকে দেখতে পাই। তাদের কেউ কেউ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ হলো সেখানে এসেছে। আবার কেউ কেউ কয়েক মাস ধরে আটকা পড়ে আছে শহরটাতে। তারা সেখানে বসে মরুভূমি অতিক্রম করে চলে যাওয়ার সম্ভাব্য অকার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করছে। এমন অভিবাসীও এই শহরে আছে, যারা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে আটকা পড়ে আছে। তাদের লম্বা চুল আঁচড়ানো দেখে সহজেই চেনা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়া অথবা আলজেরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মরুভূমি অতিক্রম করার সময় আটক হয়। তারা আবার প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার পথ পার হয়ে নাইজারে ফেরত আসতে বাধ্য হয়। এই প্রত্যাবাসিত মানুষদের অবস্থা এমনিতেই বেশ করুণ। আমি ওই শহরে এমন অনেক নাইজেরীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, তারা গভীর মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

২১ বছর বয়সী ওলু (তার পুরো নাম প্রকাশ করা হলো না) নাইজেরিয়ায় ছিলেন একজন অপেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি আগাদেজে আছেন ১৬ মাস। ফুটবলের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তি ওলু এবং আরও ১৪ জন তরুণ খেলোয়াড়কে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে পেশাদার লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার লোভ দেখায়। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে সেই ব্যক্তি ওই ফুটবলারদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দুই দফায় নাইজেরীয় মুদ্রায় একবার ১ লাখ ২০ হাজার নাইরা এবং ২ লাখ নাইরা হাতিয়ে নিয়ে নাইজারের কাটসিনায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের মারাদিতে নিয়ে গিয়ে সেই ব্যক্তি উধাও হয়ে যায়। তখন ওলু, সহযোগী ফুটবলার মরুফ এবং আরও ছয়জন পিছিয়ে যাওয়ার কথা না ভেবে আগাদেজে চলে আসে। তাদের ধারণা হয়, এখান থেকে তারা তাদের ইউরোপের যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। ওলু আমাকে বলে, যে আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না লজ্জায়। কারণ, ইউরোপে যাবে শুনে আসার আগে তার পরিবার ও বন্ধুরা তার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাদের কাছে সে আর মুখ দেখাতে পারবে না।

ওলু আর মরুফ মিলে আমার জন্য ওই শহরে একটা কুঁড়েঘর ভাড়া করে দেয়। তাদের অবস্থাটাও সেখানে ছিল দিন আনি দিন খাইয়ের মতো। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে আরব, মৌরিতানিয়া ও হাউসা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা। ফলে চট করে কাজ পাওয়ার আশাও ছিল মরীচিকাপ্রায়। কৃষিকাজ, পশুপালন আর বাগান করার কাজের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বেশ হলেও আগাদেজের বিরূপ পরিবেশ সে সম্ভাবনার বড় শত্রু। এ ধরনের আটকে পড়া অভিবাসীদের জন্য আগাদেজে পেশা বলতে রয়েছে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে হাড়ভাঙা খাটুনি, যৌনকর্মী হওয়া, চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, কোকেন ও হেরোইনের খুচরা বিক্রেতার কাজ। অভিবাসীরা তাদের পথের খরচ তোলার জন্য এ ধরনের কাজই করে থাকে।

ঘানার নাগরিক ফ্রাংকলিন ওনুসু থাকে আমার ঠিক উল্টো দিকের ঘরটাতে। এক রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করে সে দৈনিক ৪০০ সিএফএ আয় করে। ফ্রাংকলিন আমাকে বলে, আরও ১২ জন অভিবাসীর সঙ্গে সে লিবিয়া প্রায় চলেই গিয়েছিল। কিন্তু লিবিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তারা ধরা পড়ে যায়। তারা তাদের পুরো দলটিকে উত্তর নাইজারের একটি সেনাচৌকিতে ফেরত পাঠায়। তারপর নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী তাদেরকে আবার আগাদেজে ফিরিয়ে দেয়। এখন আবার লিবিয়া যেতে ফ্রাংকলিনের প্রয়োজন ১ লাখ ৫০ হাজার সিএফএ। আবার সে যদি ঘানার রাজধানী আক্রায় ফিরে যেতে চায়, তাহলে তার খরচ হবে ৮০ হাজার সিএফএ। এদিকে যে কাজটা সে করে, সেটাও নিয়মিত নয়। ফলে সে এখন এক বিরাট দোলাচলে পড়ে গেছে। এই শহরে পঞ্চম দিনে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় উরিভার সঙ্গে। তার কাছ থেকে জানতে পারি, রাজাহ এই শহরেই আছেন। আর আন্টি কুইন কোনো একটা কারণে বামাকোতেই রয়ে গেছেন। উরিভা সেই কারণটা আমাকে বলে না। মালেতে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা তারা এখন জানে। উরিভা আরও জানায়, এসানও আগাদেজে আছে। উগো আর মনডে এখান থেকে আরলিট যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

আগাদেজের যৌনপল্লিতে উরিভার সূত্রে আমার সঙ্গে আরেক নাইজেরীয় নারীর পরিচয় হয়। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা লিন্ডা (তার প্রকৃত পদবি এখানে উল্লেখ করা হলো না) আমাকে জানায়, কীভাবে সে আকওয়া ইবম রাজ্যের 'ন্যাশনাল ইউথস সার্ভিস প্রোগ্রাম (এনওয়াইএসসি)' শেষ করার পর একটি মিথ্যা বিয়েতে জড়িয়ে যায়। ইউরোপের মাটিতে পা রাখার জন্য লিন্ডা এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, সে ইকেতি রাজ্যের পরম্পরাগত শাসকের দীর্ঘ স্ত্রী তালিকার একজন হয়ে যায় নিজের নামটা তার ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে নথিবদ্ধ করানোর জন্য। তার লক্ষ্য ছিল লন্ডন যাওয়া। সেই মিথ্যা বিয়ের সনদ এবং বিয়ের ছবিরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। সেই শাসক মিথ্যা বিয়ের সূত্র ধরে শারীরিক সম্পর্কও স্থাপন করে লিন্ডার সঙ্গে। কিন্তু দেশের বাইরে যাওয়ার সময় লিন্ডার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

নাইজেরিয়া থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশী আরেকজন নারী (তার নাম প্রকাশ করা হলো না) আলাপকালে আমাকে জানান, তিনি ছিলেন একজন গৃহবধূ। কিন্তু এখন তিনি আগাদেজে যৌনকর্মীর পেশায় জড়িত। তার ভাষায়, এ উদ্ভট বৈবাহিক সম্পর্কের ঐকমত্যে জড়িয়ে আজকে তার এই পরিণতি। মধ্য তিরিশে পৌঁছানো সেই নারী দাবি করেই বলেন, তার স্বামী 'নাইজেরিয়া পোর্টস অথরিটি (এনপিএ) '-এর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর স্থির করেন, ইউরোপ যাওয়ার ব্যয় দেখানোর জন্য তার অবসরকালীন ভাতার কিছু অংশ তার স্ত্রী ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর ইউরোপে পৌঁছানোর জন্য তার প্রাণান্ত চেষ্টা আগাদেজে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। তার বৈবাহিক সম্পর্ক এখনো বহাল আছে। চার সন্তানের জননী সেই নারী এখনো টেলিফোনে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তার আক্ষেপ হচ্ছে যে মহিলাকে তিনি ইউরোপে প্রবেশের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন, সে আর দশজন মানব পাচারকারীর মতোই উধাও হয়ে গেছে। আগাদেজে তিনি তিন মাস ধরে আটকা পড়ে আছেন। সে তাকে এই পথের বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানায়নি।

এভাবে আরও কিছুদিন পার হওয়ার পর আমি ফিরে যাওয়ার নিরাপদ একটি পথ বের করার জন্য শহরে কোনো একটি সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু করি। ওলু আমাকে প্রতারক ট্রাভেল এজেন্সি এবং গাড়িচালকদের বিষয়ে সতর্ক করে। কারণ, বেশির ভাগ সময়ে এদের কাগজপত্রহীন গাড়ি জব্দ করা হয় এবং অভিবাসীরা অজানা মরুভূমির পথেই আটক হয়ে যায়। লিবিয়া নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তারা ভাড়া আদায় করে ঠিকই, কিন্তু সেই দীর্ঘ যাত্রা কখনোই আর শেষ হয় না। সেখানে তিনটি বৈধ পরিবহন কোম্পানি আছে, যারা সেনাবাহিনীর সহায়তায় আরলিট নামক শহর পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন করে। এই শহর হচ্ছে সীমান্তের শেষ শহর, যেখান থেকে অভিবাসীরা আলজেরিয়ার তামানরাসেত শহরে প্রবেশ করতে পারেন। যেহেতু খুব কমসংখ্যক অভিবাসীই ১ লাখ ৫০ হাজার সিএফএ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাই তাদের বেছে নিতে হয় সস্তা ও বিপজ্জনক বিকল্প রাস্তা। বিদ্রোহীরা অধিকাংশ সময় সেই পথে মাইন পুঁতে রাখে। এ ধরনের স্থলমাইনের আঘাতে অভিবাসীসমেত একটি ট্রাক উড়ে যাওয়ার খবরও আমি জানতে পারি।

এক সন্ধ্যায় 'ওয়েসিস' নামের একটি ব্যস্ত পানশালার বাইরে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় উগো ও মনডের। তাদের দেখে আমার মনে হলো, অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের বয়স বেড়ে গেছে। সেখানে তাদের সূত্রে পরিচয় হয় কসমাস নামে আরেক নাইজেরীয় নাগরিকের সঙ্গে। দুই সন্তানের পিতা কসমাস সারা দিন শুধু চোখের জল ফেলেন দেশে রেখে আসা স্ত্রী আর সন্তানদের কথা ভেবে। কসমাস নাইজেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন ঋণের বোঝা ফাঁকি দিতে। কসমাস আমাকে বলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলাম, বিদেশে চলে যাওয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। কিন্তু আমার অবস্থা দেখুন, এপ্রিল মাস থেকে আমি এখানে আছি। মার্চ মাসে আমি আলজেরিয়ায় প্রবেশ করি। কিন্তু একদিন রাস্তায় হাঁটার সময় পুলিশ আমাকে আটক করে আরলিটে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমি দুকুরুতে লবণের খনিতে কাজ করেছি। আমার এখন একটাই উদ্দেশ্য, কিছু অর্থ জোগাড় করে দেশে ফিরে যাওয়া।" তিনি বলেন, "দুকুরুতে বহু নাইজেরীয় নাগরিক পশুর মতো জীবন কাটাচ্ছে। সেখানকার পরিস্থিতি এতটাই মানবেতর যে আপনি সেখানে চার দিন বসবাস করার পর আপনার জন্মদাত্রী মা-ও আপনাকে চিনতে পারবে না। আমি বিলমা লবণের খনিতে কাজ করেছি; কারণ, সেটাই ছিল সবচেয়ে সহজে খুঁজে পাওয়া চাকরি। কিন্তু এই কাজ করে কত অর্থ আমি রোজগার করতে পারব? আমি ঋণ শোধ করতে না পেরে দেশ থেকে পালিয়েছি, কিন্তু আমি আমার ভালোবাসার মানুষগুলোকে সেখানে ফেলে এসেছি। আমি এখানে কষ্ট পাচ্ছি; কারণ, তাদের মঙ্গলের জন্য দেশ ছেড়েছি। তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই হয়তো আমাকে এখানে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

সেই পানশালায় বিপুল মানুষের ভিড়। তাদের কাছে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল আফ্রিকার রাজনীতি। পরিবেশটা দেখে আমার মনে হলো, কোনো সংসদ অধিবেশনে ঢুকে পড়েছি। চারদিক থেকে তীরের মতো সব মন্তব্য ছিটকে আসছে। কেউ বলছেন, "নাইজেরিয়ায় একজন মুক্ত নাগরিক হওয়ার চেয়ে ইউরোপে বন্দি হয়ে থাকা ভালো...অন্তত তিন বেলা খাবার তো জুটবে।" আবার কারও মন্তব্য আরও তির্যক: "চাল ও দাঁত খোঁচানোর কাঠি আমদানিতে নাইজেরিয়া পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তারপরেও আমরা বলি, নাইজেরিয়া হচ্ছে আফ্রিকার দৈত্য। অথচ নাইজেরিয়ার স্বৈরশাসক সানি আবাচার ছেলের সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার আছে...কোন কাজটা করে সে এত বিশাল অঙ্কের অর্থ পেয়েছে...এ দিয়ে তো নাইজেরিয়ার আস্ত রেলওয়েকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব...অবশ্য এই অর্থ উদ্ধার করেই-বা কী লাভ! অন্য কেউ আবার তা চুরি করবে। আবার চালান করবে সুইস ব্যাংকের অন্য কোনো

গোপন অ্যাকাউন্টে। আমার বাবা বলতেন, ঔপনিবেশিক শাসনামলটাই আসলে ভালো ছিল...আফ্রিকার তথাকথিত নেতৃত্বের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমাদের আসলে প্রয়োজন জেরি রাউলিংস অথবা টমাস সানকারার মতো মানুষদের... ।”

মরুভূমিতে

ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ আমি দিরকুগামী মালপত্র ভর্তি একটা ট্রাকে নিজেকেও গুঁজে দেওয়ার সুযোগ পেলাম। ট্রাকের চালক ছিল মৌরিতানিয়ার অধিবাসী। আমার পকেটে থাকা শেষ কয়েকটি নাইরা পাল্টে সিএফএ করতে সহায়তা করল উরিভা। উত্তর আফ্রিকায় পীর-ফকির ধরনের মানুষকে বলা হয় মারাবাউত। ঘানার ফ্রাংকলিন আমাকে পরামর্শ দিল, আমার যাত্রার ভবিষ্যৎ কী, তা জানার জন্য একজন মারাবাউতের কাছে যাওয়ার জন্য। ৮০০ সিএফএ ব্যয় করে আমিও গেলাম সেই পীরের কাছে। তিনি আমাকে জানালেন, ভয় নেই, আমাদের যাত্রাপথে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে না। রওনা হবার আগ মুহূর্তে আমার কাছে খবর এলো, মানব পাচারকারী ইকেচুকুউ আগাদেজে অবস্থান করছে এবং আটজন নারী নিয়ে সে লিবিয়া যাবে। আমি আরলিট থেকে সদ্য ফিরে আসা মার্সেল (পুরো পদবি এখানে প্রকাশ করা হলো না) নামে পাচারকারী চক্রের একজন দালালের সঙ্গে কথা বলি। মার্সেল এর আগে দুই বছর লিবিয়ায় ছিল। সে আমাকে জানায়, নাইজেরিয়ার পাচারকারীরা সেখানকার একটি গোপন যৌনপল্লি থেকে তাদের কারবার পরিচালনা করে। আগাদেজে সেই পল্লিটি ‘বাংকার’ নামে সুপরিচিত।

সে আমাকে বলে, “এই পাচারকারীরা অর্থশালী। লিবিয়ায় তারা বাড়ি ভাড়া করে পাচার করে আনা নারীদের রাখে নিজেদের স্ত্রী পরিচয়ে। লিবিয়ায় নারীদের বাইরে যাবার অনুমতি নেই। তাই এরা বেশির ভাগ সময়েই অন্দরমহলে থাকে। খদ্দের খুঁজতে বের হয় দালালেরাই। দালালদের হাতে অর্থ দিয়ে খদ্দেররা নির্দিষ্ট বাড়িতে প্রবেশ করে। নারীরা সেখানে দাসীর জীবন কাটালেও তাদের খাবার এবং সব ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে বাড়ির মালিক। প্রাথমিক চুক্তিতে নারীরা যে অর্থ সেই কারবারিকে দেবে বলে শপথ করেছিল, তা পরিশোধ হওয়ার পর তাদের মুক্তি দেওয়া হয় স্বাধীনভাবে কারবার চালানোর জন্য। তবে সেই ‘বাংকার ব্যবহার এবং খদ্দের জোগাড় করে দেওয়ার জন্য কারবারির হাতে পাওয়া অর্থের অংশ তাদের তুলে দিতে হয়।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও জানতে পারি, নাইজেরিয়ার বেনিনের একজন নারী পাচার হওয়া নারীদের আগাদেজ থেকে আলজেরিয়া ও মরক্কোতে নিয়ে যান। তারপর তাদের ইতালিতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে কিছু সংঘবদ্ধ ইতালীয় অপরাধী চক্রের কাছে বিক্রি করে দেন। এ ধরনের দলের সদস্যরা বেআইনি ব্যবসা চালানোর জন্য সেখানে আসে। কখনো কখনো সেই পাচার হওয়া নারীদের বিক্রি করে দেওয়া হয় যৌনকর্মীর পেশা থেকে অবসর নেওয়া কিছু বয়স্ক নারীর কাছে। এই নারীরা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রগুলোকে সহায়তা দেয় পাচার হয়ে আসা নারীদের ইউরোপে নিয়ে যেতে।

মার্সেলই আমাকে জানায়, লিবিয়াতে সেই পাচারকারী যে যৌন ব্যবসা পরিচালনা করে সেটার যৌথ অংশীদার তার স্ত্রী। লিবিয়ার বাড়িতে যৌনকর্মীর সংখ্যা ১০ জন করার জন্য ব্যক্তিটি মার্সেলকে টাকা দেয়। মার্সেলের কাজ ছিল, মরক্কোর পথে যাত্রা করা দুটি মেয়েকে ভুলিয়ে লিবিয়ায় নিয়ে আসা। আমি লাগোসে ফিরে সেই পাচারকারীকে ফোন করার পর সে “রং নাম্বার” বলে ফোন বন্ধ করে দেয়।

দুই বছর আগে লিবিয়ায় যাওয়ার পথে মরুভূমিতে চিনেদু ওকোরো নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। চিনেদুসহ আরও আটজনের দলটির প্রত্যেকে সে যাত্রায় রোল্যান্ড চিদে নেদেম নামের এক মানব পাচারকারীকে ১ লাখ ৩০ হাজার নাইরা দিয়েছিল। কিন্তু চিনেদু যাত্রা শেষ করতে পারেনি। রোল্যান্ড তাকে সেই মরুভূমিতেই কবর দেয় এবং জানায়, পা ফুলে গিয়ে চিনেদুর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার পরিবারের লোকজন এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি। রোল্যান্ড বিয়ে করার জন্য নাইজেরিয়ায় ফিরে এলে পুলিশ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটক করে।

সেই ট্রাকের যাত্রী ছিল ৪০ জন। তার মধ্যে সাতজন নারী। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য গারি নামে একধরনের আটা, রুটি, চিনি এবং পাঁচ লিটারের একটি ক্যানে পানি নিয়ে নিই। ভেড়ার চামড়ার তৈরি একটা ব্যাগে লুকিয়ে রাখি ক্যামেরাটা। গাওতে আমরা যখন ডাকাতের কবলে পড়ি, তখন খুব আশ্চর্যজনকভাবে ক্যামেরাটা মোহাম্মদ আর তার লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমাদের যাত্রা শুরু হয় আগাদেজ থেকে বিলমার উদ্দেশে। পথে লবণ বহনকারী ২০০ উটের দল দেখতে পাই। উটগুলো আচেগউ এবং দিরকুর পথে যাচ্ছিল। মরুভূমি অদ্ভুত এক জায়গা। চলার কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই, বৃক্ষ নেই, ঘরবাড়ি নেই। নেই পথের দিকচিহ্ন, নেই কোনো বন্ধুও। আমরা একটানা চার দিন ধরে পথ চললাম মরুভূমির ওপর দিয়ে। দিনে তীব্র গরম আর রাতে দুঃসহ ঠাণ্ডায় আমাদের পথচলা। পথের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলছিল চলন্ত ট্রাকের ভেতরে প্রস্রাবের তীব্র গন্ধ। চলতে চলতে মাঝেমধ্যেই চোখে

পড়ছিল মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, মানুষের কঙ্কাল এবং তাদের ব্যবহৃত পরিত্যক্ত জিনিসপত্র, পাসপোর্ট আর বাইবেল। চলন্ত ট্রাক থেকে পড়ে গিয়ে বহু অভিবাসীর মৃত্যু ঘটে এই পথে। তাদের কেউ কেউ মরুভূমির বিষধর সাপের ছোবলে অথবা অচেনা ভয়ংকর কোনো প্রাণীর আক্রমণেও প্রাণ হারান। তারপর তো আছে পানির পিপাসায় মৃত্যু। মরুভূমিতে বাহন বিকল হলে বা চালক পথ হারিয়ে ফেললে মানুষ পানির অভাবে পড়ে মারা যায়। আমাদের বেলায় এ ধরনের কোনো বিপত্তি না ঘটলেও এমন ঘটনা ঘটেছিল, যার কোনো পূর্ব সংকেত আমরা পাইনি। দিরকুর কিছু পরে আমাদের ট্রাকের গতিরোধ করে মরু ডাকাতের দল। যাত্রীরা সবাই তড়িঘড়ি ট্রাক থেকে নেমে তাদের কাছে থাকা টাকাপয়সা বের করতে শুরু করে।

আমি পরনের সব জামাকাপড় খুলে ফেলতে সময়ক্ষেপণ করি না। কারণ, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক ব্যক্তিকেও তাই করতে হচ্ছিল। ডাকাতেরা প্রথমেই নারীদের থেকে পুরুষদের আলাদা করে ফেলে। তারপর তারা মনুষ্য দেহের সমস্ত ফাঁক (পায়ুপথসহ) সন্ধান করতে থাকে লুকিয়ে রাখা অর্থের জন্য। কারণ, অভিবাসীরা এ ধরনের বিপদে পড়তে পড়তে তাদের সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে শিখে ফেলেছে। এমন বিবরণও শোনা যায় যে, কখনো এই অভিবাসীরা এই অস্থির আর ভয়ংকর ডাকাতদের হাতে মারা যায় অথবা খোঁজাখুঁজির নামে তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করে।

এক নাইজেরিয়ান সঙ্গে করে কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এগুলো লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারলে তার লাভ হবে। ডাকাতেরা তাকে জোর করে ওই সব ওষুধের প্রতিটার দুটো করে ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করে। আমি পুরোটা সময় মাথা নিচু করে বসে ছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম না এই বর্বরতা কতক্ষণ চলবে। সবার সামনে এক পাষণ্ড নাইজেরীয় এক মেয়েকে বালুর ওপর ফেলে ধর্ষণও করে। পরে জানতে পারি, মেয়েটির নাম রোজ। ওই সময়ে রোজ চিৎকার করেনি।

ডাকাতেরা আমাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু ট্রাকের পরিবেশ আর আগের মতো রইল না। দিরকু থেকে দাও তিমনি হয়ে মাদামার একটি সেনাচৌকি হয়ে সীমান্তের ওপারে লিবিয়ার তাজারিহ হয়ে শেষে আল গাতরুন পর্যন্ত আমরা কেউ তেমন কোনো কথাই বলিনি। জানতে পারলাম, গন্তব্যে পৌঁছাতে আমাদের আরও পাঁচ দিন লাগবে। আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাকিরা সেখান থেকে ত্রিপোলির পথে যাত্রা করে।

যে মানুষটিকে বাধ্য হয়ে ওষুধ গিলতে হয়েছিল, তিনি আল গাতরুন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে দাও তিমনিতে পৌঁছে তিনি বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, তাঁকে যেন ট্রাক থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। কারণ, আমাদের সেই চলার পথে অপেক্ষা, সহানুভূতি আর ভালো কথার কোনো জায়গা ছিল না। মরুভূমিতে এক মিনিট বিলম্ব মানেই পানির জন্য, খাবারের জন্য বাড়তি চাহিদা তৈরি হওয়া। বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়া।

রোজকে দেখাচ্ছিল ভাঙাচোরা এবং বিক্ষিপ্ত। তাকে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তার কাছে স্বর্গও কোনো পুরস্কার নয়। আমি গন্তব্যে পৌঁছে উগোকে লেখা জুলিয়েট ওকোরোর চিঠি হাতে পাই। লিবিয়ার বেনগাজি, ত্রিপোলি অথবা সেবাতে অন্যদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর আর কোনো অর্থ আমার কাছে ছিল না। কারণ, তখন প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ বাড়ছে। এই বিপজ্জনক যাত্রা শুরু করার আগে আমি নাইজেরিয়ার আবুজা শহরে লিবিয়ার দূতাবাসে গিয়েছিলাম সে দেশে আমার প্রবেশের ব্যাপারে বৈধ অনুমতি নিতে। কিন্তু লিবিয়ার দূতাবাস তখন এক মাস ধরে বন্ধ। লিবিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অনুপ্রবেশ এবং অবৈধ অভিবাসী প্রতিরোধ বিভাগ ২৭টি আটক কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। আমি আবার আগাদেজে ফেরার যানবাহনের জন্য সেদিন এবং পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

পরিশিষ্ট

ইমানুয়েল মায়াহ

এই স্টোরি করার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে ২০০৯ সালে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদন। সেটির বিষয় ছিল লিবিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের গোপনে হত্যা এবং উত্তর আফ্রিকার এই দেশটিতে আরও ২০ জন নাইজেরীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড। সেই ২০ জনের মধ্যে ৩ জন ছিলেন নারী। আমি যে লক্ষ্য নিয়ে স্টোরির কাজ শুরু করেছিলাম, তার সঙ্গে প্রাপ্তির খুব একটা তফাত ছিল না। তবে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত নতুন অনেক চক্রের সন্ধান লাভ এবং তাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারাটাই আমার প্রাপ্তির খাতায় নতুন কিছু যোগ করেছে।

বস্তুগত বিবেচনায় এই স্টোরি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল অর্থ জোগাড় করা। আমার সম্পাদক এই স্টোরির বিষয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন না। গতানুগতিক বাজেট দিয়েই এই স্টোরি করা সম্ভব বলে তার মনে হয়েছিল। ফোরাম অব আফ্রিকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স (এফএআইআর) তামাক চোরাচালান নিয়ে আমার একটি স্টোরিকে আগে পুরস্কৃত করেছিল। আমি এখানে সেই পুরস্কারের অর্থ বিনিয়োগ করি।

আমার অনুসন্ধানের প্রকৃতিটা ছিল অংশগ্রহণমূলক। প্রধানত আমার প্রয়োজন ছিল ভ্রমণবিষয়ক কাগজপত্র জোগাড় করা। নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে ভ্রমণের জন্য আমার জাল কাগজপত্রেরও প্রয়োজন ছিল। এসবের মধ্যে পাচারকারীদের কারও একটি ছবি জোগাড় করা আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। মনে হলো, একটা ছবি স্টোরিকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা দেবে। ছবিটা পাওয়ার জন্য আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

আমাকে কাজ করতে হয় সাংবাদিকতার সনাতন প্রথার ওপর নির্ভর করে। একটি গোপন ক্যামেরা কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমার কাছে ছিল না। তবে আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, ক্যামেরা থাকলেও তা খুব একটা কাজে আসত না। মরুভূমিতে আমি মোট ৩৭ দিন ভ্রমণ করি। আমি জানি না, কোনো ছদ্মবেশী রিপোর্টারের পক্ষে এত দীর্ঘ সময় ধরে গোপন ক্যামেরা নিজের দেহে সংযুক্ত করে কাজ করা সম্ভব হতো কি না।

এই কাজে প্রথাগত ছোট আকারের ক্যামেরা ব্যবহার করায় আমাকে ক্যামেরা এবং তোলা ছবিগুলো রক্ষা করতে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। বেশির ভাগ সময় ক্যামেরাটি লুকানো ছিল আমার অন্তর্বাসের ভেতরে। পূর্ববর্তী অনুসন্ধানের কাজেও আমি একইভাবে ক্যামেরা বহন করেছি। কাজ শুরু করার আগে কী ধরনের পোশাক পরব, সে বিষয়েও আমাকে পরিকল্পনা করতে হয়েছে।

মরুভূমিতে চলাচলকারী মানুষ জ্যাকেট এবং একাধিক চাদর পরিধান করে থাকে। পোশাকের এই সুবিধা আমি ব্যবহার করেছি। শরীর চাদরে আবৃত থাকায় অনেক সময় জ্যাকেটের পকেটে ক্যামেরা লুকিয়ে রাখতে সুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে ছবি তোলার সময় ক্যামেরা পকেটে নিয়ে আমি প্রস্রাব করার জন্য একটু দূরে চলে যেতাম। তারপর অন্তর্বাসের ভেতর থেকে সেটা বের করে জ্যাকেটের পকেটে নিয়ে নিতাম। ছবি তোলার সময় ক্যামেরা চাদরে জড়িয়ে নিতাম আড়াল করার জন্য।

ক্যামেরার ছবিগুলো রক্ষা করার জন্য আমি সঙ্গে আটটি মেমোরি কার্ড নিয়ে যাই। নতুন কোনো জায়গায় গিয়েই মেমোরি কার্ডটা পাল্টে ফেলতাম। সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ার সময় একটি মেমোরি কার্ড হারাই। গাওতে ডাকাতের কবলে পড়ার সময় সঙ্গে থাকা ভেড়ার চামড়ার ব্যাগ ক্যামেরা লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

আমার গবেষণার একটি বড় অংশই নির্ভর করেছে মনুষ্য সূত্রের ওপর। লিবিয়া ও ইউরোপ থেকে বিতাড়িত অভিবাসনপ্রত্যাশী বহু মানুষ এবং মানব পাচার চক্রের শিকার মানুষেরাই ছিল আমার সূত্র। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত খবর থেকে কর্তৃপক্ষের মন্তব্যগুলো পেয়েছি। তবে এই অনুসন্ধানের কাজে আমার হাতে তেমন কোনো নথিপত্র ছিল না। ছিল না পাচারকারী চক্রের ভেতরে কোনো সূত্র।

প্রতিবেদন লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমি ধারাবাহিকভাবে লিখে রেখেছি সঙ্গে রাখা ছোট নোটবইতে। সেখানেও গোপনীয়তার জন্য স্থানীয় ভাষায় ছোট ছোট হস্তাক্ষরে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করতাম। বুরকিনা ফাসোতে সীমান্ত পুলিশের হাতে যখন আটক হই, সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। কারণ, নোটবইতে আমি ফরাসি বা ইংরেজি ভাষায় কিছু লিখিনি। সেখানে যা লেখা ছিল তা স্থানীয়রা সহজেই পাঠ করতে পারবে। বাসের ভেতরে আমি অন্য যাত্রীদের থেকে সব সময় কিছুটা দূরত্বে বসতাম। তাতে নোটবইতে হিজিবিজি কী লিখছি, অন্যরা সেটা দেখতে পেত না। পথে যখনই বাথরুম দেখতাম, সেখানে ঢুকে গোটা দিনের ঘটনার বিবরণ লিখে রাখতাম।

এই স্টোরিতে খুব বেশি কাজ করতে হয়নি আমাকে। শুধু ঘটনার অনুনাদকে অনুসরণ করেই আমি পৌঁছে গেছি পুরস্কারের দরজায়। সিএনএন যখন এটিকে তাদের 'আফ্রিকান জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য নির্বাচন করে, তখন আমার পত্রিকার নির্বাহী পরিচালক স্টোরিটি পুনরায় ছাপার নির্দেশ দেন।

স্টোরি ছাপা হওয়ার পর (প্রথম প্রকাশিত হয় সান পত্রিকায়। তারপর বিভিন্ন জার্নাল এবং ওয়েবসাইটে স্টোরিটি প্রকাশিত হয়) বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিক্রিয়া আসে। নাইজেরিয়ার ধর্মীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা স্টোরির প্রশংসা করেন। নাইজেরিয়ার প্রেস কাউন্সিল এবং এনএপিটিআইপি (ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ইন ট্রাফিকিং ইন পারসনস) স্টোরির প্রশংসা করে বার্তা পাঠায়। স্টোরিতে যে অ্যাকাডেমির কথা উল্লেখ করেছিলাম, পুলিশ সেটি বন্ধ করে দেয়। স্টোরিতে উল্লেখ না করা কিছু বাড়তি তথ্য এনএপিটিআইপির কাছে সরবরাহ করি, যাতে পুলিশ এজেন্সিগুলোর কাজ করতে সুবিধা হয়।

এনএপিটিআইপি ২০১০ সালের আগস্ট মাসে আমাকে মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাদের 'অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যাম্বাসেডার' নির্বাচিত করে, যা আমার কাছে ছিল টানা চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় সেই অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, সুইজারল্যান্ডের দূতাবাসের প্রতিনিধি, জাতিসংঘের 'ইন্টাররিজিওনাল ক্রাইম অ্যান্ড জাস্টিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইউএনআইসিআরআই) প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

লাগোসের জাতীয় টেলিভিশনে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মরুভূমির সেই অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য আমাকে সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যামেরুন ও নেদারল্যান্ডস থেকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৩

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীকে কি বাঁচানো সম্ভব? পরিবেশ অনুসন্ধান

১.

দূষণের স্রোতোধারা

নদী সংরক্ষণে সরকারের নেয়া বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থের প্রবাহ নদীর স্রোতের মতোই, অথচ জাতির জীবনধারায় এর প্রভাব খুবই সামান্য।

শ্যামলাল যাদব

ভূমিকা

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যখন ইউরোপ এবং আমেরিকায় কয়েক দশক ধরে গণমাধ্যমশিল্প পাঠক ও দর্শক হারাচ্ছে, কমে যাচ্ছে রাজস্ব আয়, তখন ভারতীয় গণমাধ্যমের উত্থান ঘটছে নানামুখী। পৃথিবীর এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমশিল্পে মুদ্রণ বা প্রচারমাধ্যমে নতুন ভোক্তাশ্রেণিকে ধরে রাখতে গণমাধ্যমগুলো বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পাশাপাশি 'রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই)' বা তথ্যাধিকার আইনের প্রতিষ্ঠা সাংবাদিকদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দিয়েছে এবং এই হাতিয়ার তারা ব্যবহারও করছেন। শ্যামলাল যাদবের এই কাজকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি ধ্রুপদি আখ্যান হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। তিনি সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পুরো অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া পরিচালনা করেছেন। তাই এই প্রতিবেদন পাঠ করার পর ভারতে নদী সংরক্ষণের নীতি যে ব্যর্থ হয়েছে, তা নিয়ে আর কোনো তর্কের অবকাশ থাকে না। আপনি যদি একজন মিথ্যাবাদী না হন, তাহলে প্রশ্ন তুলবেন– বিষয়টি নিয়ে কী করা যায়? এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত জটিল সব তথ্য পাঠকের জন্য সহজতর করে তুলতে বর্ণময় গ্রাফিকস ব্যবহার করা হয়েছে, যা এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়াকে আরও কার্যকর করেছে। এ কারণেই এটি আমরা হুবহু এখানে প্রকাশ করলাম।

ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত
১৭ ডিসেম্বর ২০০৯

কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখা যায়

যমুনা নদী

দিল্লি শহরের পাশে বিস্তৃত যমুনা নদী এখন প্রচুর পয়োনিষ্কাশনে, কলকারখানার বর্জ্যে এবং প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানির প্রবাহের অভাবে প্রায় মৃত। এই নদী এখন একটি বৃহৎ নর্দমায় পরিণত হয়েছে। যমুনাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা তাই নিরর্থক।

দূষণের স্রোতোধারা

নদী সংরক্ষণে সরকারের নেওয়া প্রকল্পগুলোতে টাকার প্রবাহ নদীর স্রোতের মতোই, তবে জাতির জীবনদারায় এর প্রবাহ নগন্য।

শ্যামলাল যাদব

কাল্পনিক ভারতে, সিনেমা ও সাহিত্যে দেখা যায়, নদী বয়ে চলেছে এক সৌম্য কালহীনতায়। দেখা যায়, বরফের তীক্ষ্ণ কাঠিন্য, রুখা-শুখা কঠিন সমতল অথবা ভারী স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার ভেতর দিয়ে নদী যে খাতেই প্রবাহিত হোক না কেন, একধরনের আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং আবেগময়তা নদীর প্রবাহের সঙ্গী হয়ে আছে। এ ধরনের দৃশ্য স্বপ্নে দারুণ মানায়, ভালো লাগে পর্যটকদের জন্য প্রকাশিত প্রচারপত্রে, যেখানে ভারতকে বলা হয় অবিশ্বাস্য সুন্দর। কিন্তু ভারতের নদীগুলোকে যদি পূতপবিত্র বলে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে সেই কাল্পনিক গল্পটাকেই বিশ্বাস করে নিতে হয়। কিন্তু গত কয়েক দশকে ভারতের নদীগুলো অপবিত্র অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। নদীগুলোর বিপন্ন হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ নগরজীবনের আবর্জনা আর কলকারখানার দূষণ। কিন্তু এই ধারাবাহিক দূষণের পেছনের কারণ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত লিপ্সা আর প্রশাসনিক উদাসীনতা। পরিবেশবিদেরা মনে করেন, কলকারখানার দূষণ ছাড়াও পয়োনিষ্কাশন, নদীতীরে কসাইখানার সংখ্যাধিক্য, ধোপার কাপড় ধোয়া, শ্মশান এবং বস্তি এলাকাগুলোই হচ্ছে এই নদীদূষণের প্রধান কারণ। প্রতিবছর ভারতের নদীগুলোতে অসংখ্য দেবীমূর্তি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দেখে মনে হয়, দূষিত নদীতে মূর্তিগুলোর মৃত্যু হয় আসলে দম বন্ধ হয়ে। সম্প্রতি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির বাসিন্দা সালেক চন্দ জৈনের করা একটি জনস্বার্থের মামলার (পিআইএল) আবেদন নাকচ করে দেয় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। ভদ্রলোক নদীতে প্রতিবছর মূর্তি বিসর্জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত বলে, ''আদালত কখনোই এতগুলো রাজ্যে বিসর্জন বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। তবে অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।'' বড় শহরগুলোতে যখনই দেখা যায়, কোনো নদীর তলদেশ পলি জমা হয়ে শুকিয়ে গেছে, তখনই কোনো গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান হাজির হয়ে আশ্রম বা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে দিল্লি শহরের কথা ধরা যাক। ২০১০ সালে ভারত ছিল কমনওয়েলথ গেমসর স্বাগতিক দেশ। তখন সরকার আইনের হাত মুচড়ে দিয়ে এবং আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে শুকিয়ে যাওয়া যমুনা নদীগর্ভে একটি অ্যাথলিট ভিলেজ তৈরি করেছিল। তখন দিল্লি শহরের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম। শহরটিতে প্রতিদিন ৩৪৭ কোটি লিটার তরল বর্জ্য উৎপাদিত হয়, বিপরীতে দিনে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা রয়েছে ২৩২.৫ কোটি লিটার। দিল্লির বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ বা শোধনের ক্ষেত্রে শোধনাগারের অকার্যকারিতায় প্রকৃতপক্ষে শোধন করা সম্ভব হয় মাত্র ১৫৭ কোটি লিটার।

ভারতের নদীগুলো এখন শুধু দূষিত নয়, বিষাক্তও বটে

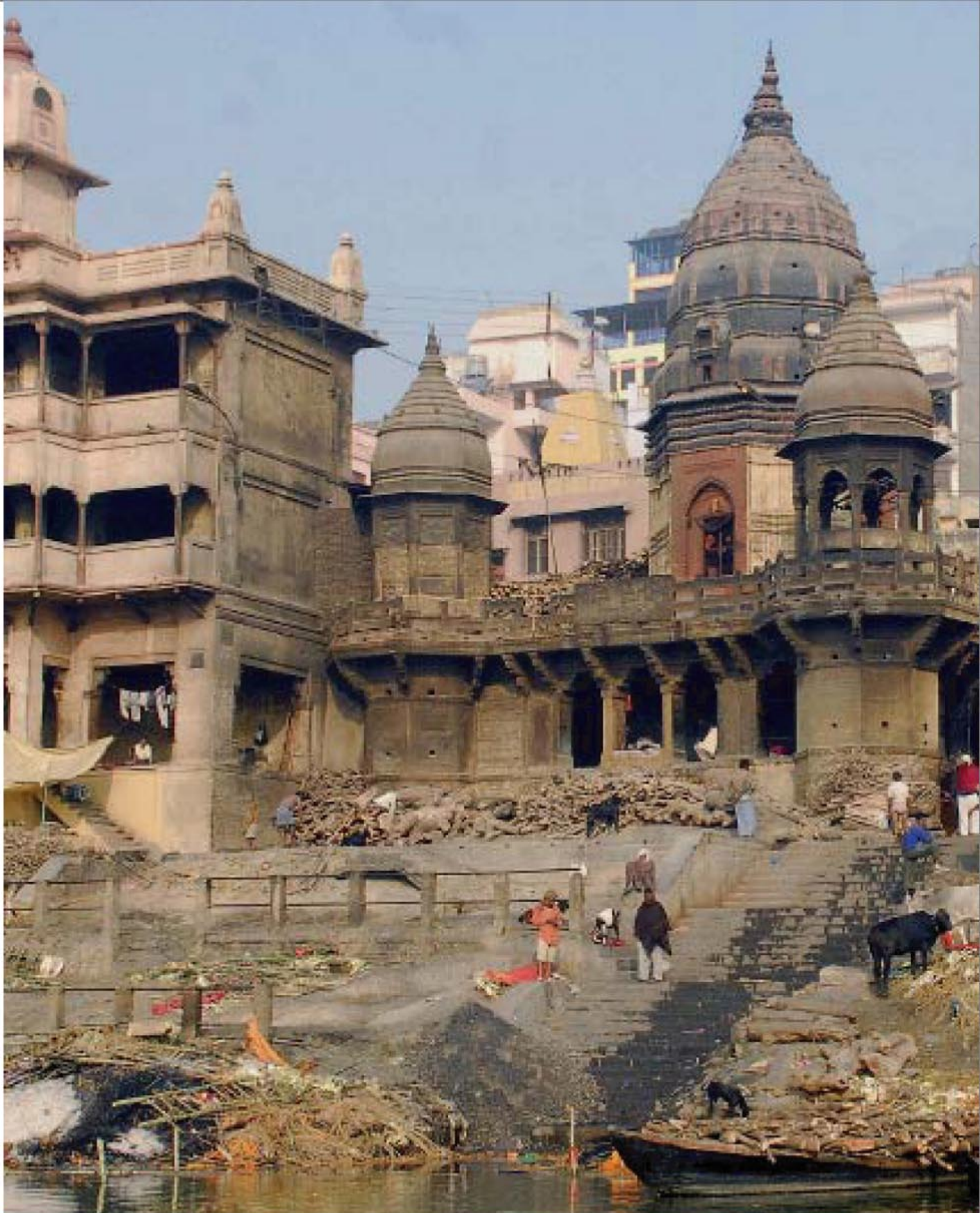

গঙ্গা

গঙ্গা নদীর উন্নয়নে ৭৮০ কোটি ভারতীয় রুপি ব্যয় করার পরও এই পবিত্র নদী পরিষ্কার হয়নি। এখন বিশ্বব্যাংক প্রাথমিক পর্যায়ে এই নদীকে বাঁচাতে ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার সহায়তার কথা বললেও ধারণা করা হচ্ছে, বিপুল অর্থ নদীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

দুই দশক ধরে গঙ্গা নদীর পানিদূষণ তিনগুন বেড়েছে,

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শিলা দীক্ষিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ''কোটি টাকা ব্যয় করেও প্রথম ও দ্বিতীয় যমুনা অ্যাকশন প্ল্যান কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি। যদিও টেমস ও সিন নদী দেখার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে, কিন্তু যমুনা নদীকে ওই দুটি নদীর অবয়বে নিয়ে আসতে সাত থেকে আট বছর সময় লেগে যাবে।'' যমুনা নদী যত পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে, ততই যেন এর বিনাশ বেড়েছে। মথুরায় পৌঁছে যমুনার গর্ভে প্রচুর পলি জমা হয়েছে নদীর ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কারণে। 'মথুরা-বৃন্দাবন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি হওয়া ঘাটগুলোর সমান্তরাল করে নদীতে পিলার বসাচ্ছে।

চেন্নাইয়ের চারটি পয়োশোধনাগার প্রতিদিন ২৬.৪ কোটি লিটার এমএলডি বর্জ্য শোধন করে থাকে, যেখানে প্রয়োজন ৫.৩ কোটি লিটার। ঝাড়খন্ডে অনিয়ন্ত্রিত কয়লা খনি আর খনিজের কারখানার কারণে সুবর্ণরেখা নদীতে পলি জমছে। ভারতের প্রধান প্রধান নদী শোধন করার জন্য 'ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন প্ল্যানের' (এনআরসিপি) সূচনা হয় ১৯৯৫ সালে।

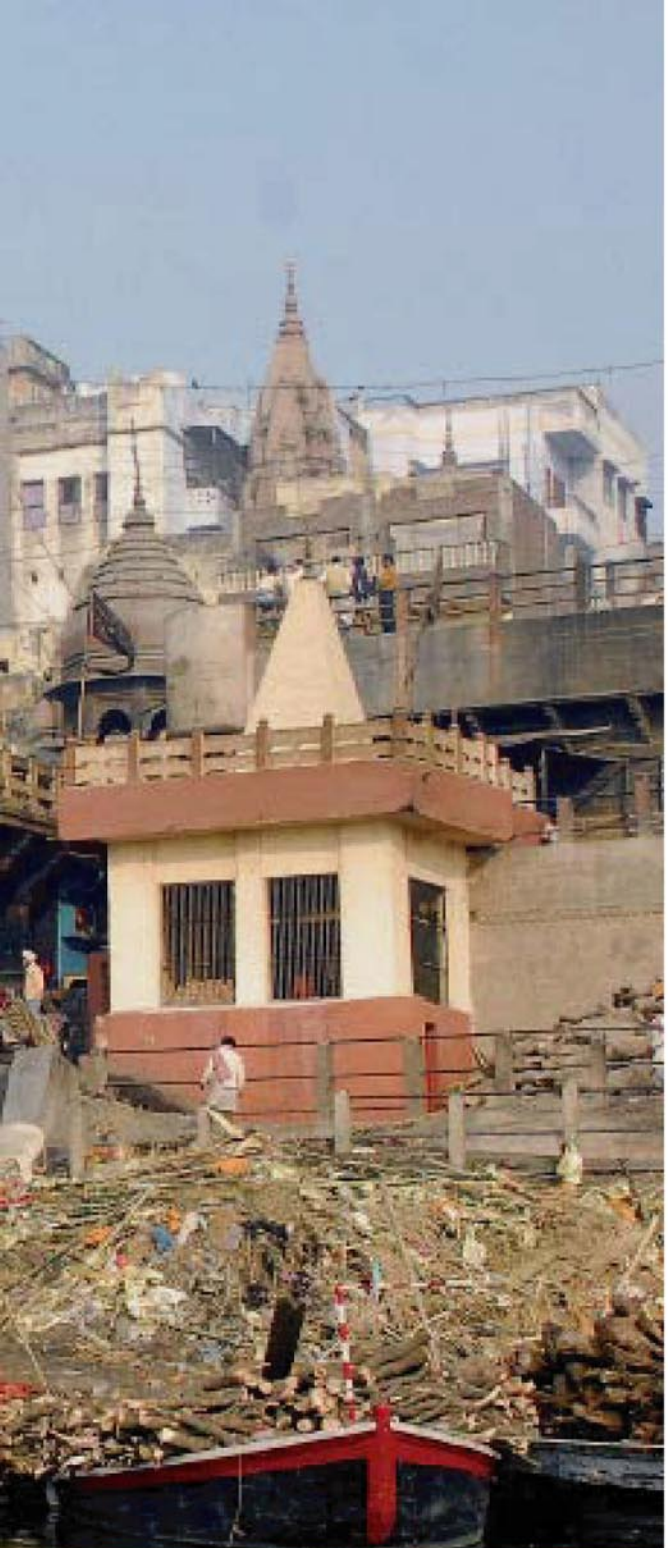

নদীর রুদ্ধ প্রবাহ

বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি) সূচকের মাধ্যমে পানির সাধারণ গুণাগুণ পরিমাপ করা হয়।

বিওডি সূচক ২ মিলিগ্রাম/লিটার পরিমাপের কম থাকার অর্থ হচ্ছে, সেই পানি কোনো ধরনের পরিশোধন ছাড়াই পানযোগ্য। আবার বিওডি সূচকে ২-৩ মিলিগ্রাম/লিটার পরিমাপ থাকার অর্থ হচ্ছে, পরিশোধনের পর সেই পানি পানযোগ্য। কিন্তু বিওডি সূচকে ৩ মিলিগ্রাম/লিটার পরিমাণের অর্থ হচ্ছে, সেই পানি মাছ এবং বন্য প্রাণীর জন্যও নিরাপদ নয়।

নদী	বিওডি সূচকের মাত্রা
গঙ্গা	২১ কানপুর, উত্তর প্রদেশে
গোদাবরী	২০ তপোবন অঞ্চলে
গোমতী	১৪ লখনউ, উত্তর প্রদেশে
খান	৫০ ইন্দোর ও মধ্যপ্রদেশে
কৃষ্ণা	১৭.৬ মাহুলী ও মহারাষ্ট্রে
মুসি	৩৪ রঙ্গরেড্ডী, অন্ধ্র প্রদেশে
নর্মদা	১১.৪ হোসাঙ্গাবাদ, মধ্য প্রদেশে
সবরমতি	৪৮ বাউথা, গুজরাটে
সাতলুজ	৪৮ লুধিয়ানা, পাঞ্জাবে
তাপি	২১ আজনান্দ, মহারাষ্ট্রে
বৈনগঙ্গা	১০.৫ আস্তি, মহারাষ্ট্রে
যমুনা	৭০ ওখলা, দিল্লিতে
সুবর্ণরেখা	১০.৫ তাতিসিলওয়াই, ঝাড়খন্ডে

এই সূচক সরবরাহ করেছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড

ছবি : সঞ্জয় সংকর

এবং যমুনা নদীর ক্ষেত্রে বেড়েছে সাতগুন

শুরুতে পরিকল্পনায় ছিল ১৯৮৫ সালের 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান'-এর সম্প্রসারণ। এই পরিকল্পনার অধীনে ছিল ভারতের ১০টি রাজ্য ছুঁয়ে প্রবাহিত ১৮টি ভয়াবহভাবে দূষিত নদী। এই পরিকল্পনার প্রাক্কলিত ব্যয় দেখানো হয় ভারতীয় মুদ্রায় ৭৭২ কোটি রুপি। বর্তমানে এই পরিকল্পনায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ২০টি রাজ্যের ১৬৭টি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ৩৮টি নদী। ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে এই প্রকল্পে সংযুক্ত করা হয়েছে পঞ্চগঙ্গা নদী।

কিন্তু এখন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এনআরসিপি কেন্দ্রীভূত ও সফল কোনো পরিকল্পনা নয়; বরং বলা যেতে পারে শুধুই আমলাতান্ত্রিকভাবে প্রকল্পটির নদীদূষণের সূচকের ঘরে পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। এনআরসিপি প্রকল্পের কর্মকর্তারা আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরায়েল, জাপান, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসে পরিবেশদূষণ প্রতিরোধের কলাকৌশল শিখতে গিয়ে উড়িয়েছেন ৯৪ দশমিক ৯৭ লাখ ভারতীয় মুদ্রা। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৩ হাজার ৮৯২ কোটি রুপি। কিন্তু ফল হচ্ছে ধারাবাহিক ব্যর্থতা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এনআরসিপির কাজ ছিল ২০০৯ সালের আগস্টের মধ্যে ৩৭টি নদীর ২২ হাজার ১২৭ কিলোমিটার সম্প্রসারিত অংশের মধ্যে দূষিত হয়ে যাওয়া ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অংশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। একই সময়ে প্রতি কিলোমিটার নদীর দূষণ প্রতিরোধের ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১ দশমিক ৫ কোটি রুপি।

খান নদী

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীকে সবচেয়ে বেশি দূষিত বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই নদীর পানি পরিশোধনে ৩ হাজার ৯৫৫ কোটি রুপি ব্যয় করা হলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

অপচয় এনআরসিপি শত সহস্র কোটি রুপি ব্যয় করা সত্ত্বেও আমাদের নদীগুলোর ভয়াবহ দূষণ কমেনি

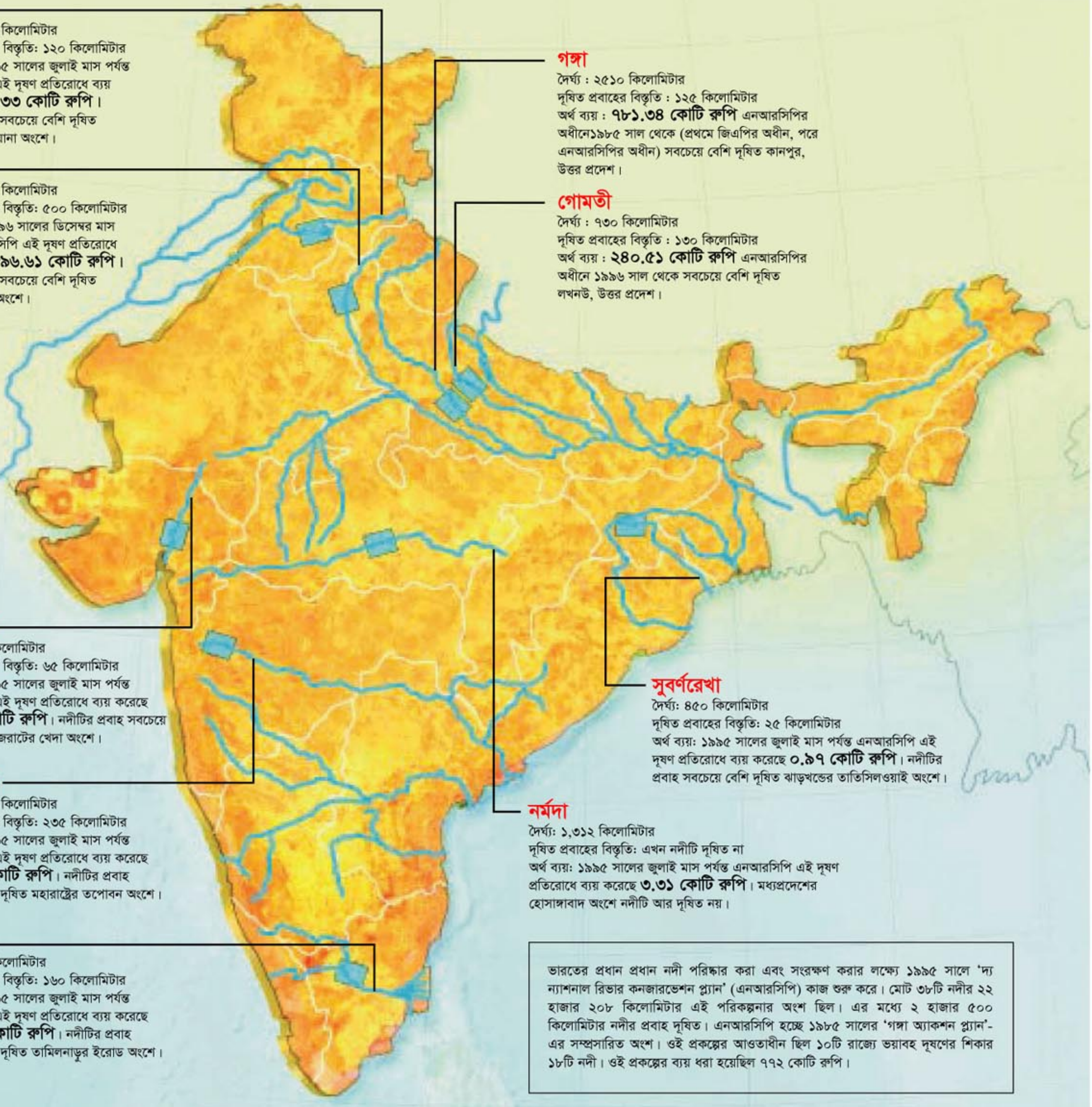

সাতলুজ
দৈর্ঘ্য: ১,৫০০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ১২০ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **২৯১.৩৩ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত পাঞ্জাবের লুধিয়ানা অংশে।

যমুনা
দৈর্ঘ্য: ১,৩৭০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ৫০০ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয় : ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **৮৯৬.৬১ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত দিল্লির ওখলা অংশে।

গঙ্গা
দৈর্ঘ্য : ২৫১০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি : ১২৫ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয় : **৭৮১.৩৪ কোটি রুপি** এনআরসিপির অধীনে১৯৮৫ সাল থেকে (প্রথমে জিএপির অধীন, পরে এনআরসিপির অধীন) সবচেয়ে বেশি দূষিত কানপুর, উত্তর প্রদেশ।

গোমতী
দৈর্ঘ্য : ৭৩০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি : ১৩০ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয় : **২৪০.৫১ কোটি রুপি** এনআরসিপির অধীনে ১৯৯৬ সাল থেকে সবচেয়ে বেশি দূষিত লখনউ, উত্তর প্রদেশ।

সবরমতি
দৈর্ঘ্য: ৩৭১ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ৬৫ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **৯৫.০৮ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত গুজরাটের খেদা অংশে।

সুবর্ণরেখা
দৈর্ঘ্য: ৪৫০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ২৫ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **০.৯৭ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত ঝাড়খণ্ডের তাতিসিলওয়াই অংশে।

গোদাবরী
দৈর্ঘ্য: ১,৪৫০ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ২৩৫ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **১১২.৬১ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত মহারাষ্ট্রের তপোবন অংশে।

নর্মদা
দৈর্ঘ্য: ১,৩১২ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: এখন নদীটি দূষিত না
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **৩.৩১ কোটি রুপি**। মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ অংশে নদীটি আর দূষিত নয়।

কাবেরী
দৈর্ঘ্য: ৭৬৫ কিলোমিটার
দূষিত প্রবাহের বিস্তৃতি: ১৬০ কিলোমিটার
অর্থ ব্যয়: ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এনআরসিপি এই দূষণ প্রতিরোধে ব্যয় করেছে **২৬১.৫৬ কোটি রুপি**। নদীটির প্রবাহ সবচেয়ে বেশি দূষিত তামিলনাড়ুর ইরোড অংশে।

ভারতের প্রধান প্রধান নদী পরিষ্কার করা এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'দ্য ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন প্ল্যান' (এনআরসিপি) কাজ শুরু করে। মোট ৩৮টি নদীর ২২ হাজার ২০৮ কিলোমিটার এই পরিকল্পনার অংশ ছিল। এর মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার নদীর প্রবাহ দূষিত। এনআরসিপি হচ্ছে ১৯৮৫ সালের 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান'-এর সম্প্রসারিত অংশ। ওই প্রকল্পের আওতাধীন ছিল ১০টি রাজ্যে ভয়াবহ দূষণের শিকার ১৮টি নদী। ওই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৭২ কোটি রুপি।

নদীদূষণ বন্ধের বিরুদ্ধে লড়তে এ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়: ৩,৮৯২.৩২ কোটি রুপি*

নদী: ৩৮টি **রাজ্য: ২০টি** **শহর: ১৬৭টি**

* নদীদূষণ রোধে ব্যয় করা অর্থের সঙ্গে 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান'-এর ৪২৯ কোটি রুপিও যোগ করা হয়েছে। অর্থ ব্যয়ের হিসাবটি ২০০৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। নদীগুলোর দৈর্ঘ্য আনুমানিক।

"প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। তারপরেও প্রতিনিধিদল বিদেশে গেছে টেমস ও সিন নদী পরিদর্শনে। তবে এই নদীগুলোর অবস্থায় আসতে যমুনা নদীর আরও সাত থেকে আট বছর সময় লাগবে।"

–শিলা দীক্ষিত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

ছবি : রাজেশ ভামবি

১.৫ কোটি রুপি ব্যয় করে ৩৭টি নদীর মধ্যে শুধু দুটি নদী (নর্মদা ও মান্দোবি) এখন দূষণের থাবা থেকে মুক্ত বলে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু 'সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সিপিসিবি)' এ ধরনের দাবি করে নিজেদের দেওয়া পরিসংখ্যানকে নিজেরাই খণ্ডন করে বলেছে এই দুটি নদী এখন দূষণমুক্ত নয়। তাদের পরিসংখ্যান বলছে, হোসাঙ্গাবাদে নর্মদায় বিওডি ১১.৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং গোয়ায় মান্দোবিতে বিওডি ৪.৭ মিলিগ্রাম/লিটার।

এনআরসিপির ব্যর্থ কর্মপ্রচেষ্টার বিষয়ে ইন্ডিয়া টুডের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তথ্য অধিকার আইনের (এমআরটি) অধীনে ৩০টি দরখাস্ত জানান দিচ্ছে, সিপিসিবির মতো প্রতিষ্ঠানের দাবি সত্ত্বেও আমাদের নদীগুলো আগের মতোই নোংরা রয়ে গেছে। দুই দশক ধরে গঙ্গা প্রকল্পের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে রাজ্যের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম রমেশ সংসদে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, গঙ্গা ও যমুনা নদীর অবস্থা ২০ বছর আগে যে রকম খারাপ ছিল, এখনো তা-ই আছে। এই দুরবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ''দূষণের মাত্রা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক গুণ বেড়েছে। পাশাপাশি পয়োশোধনাগার প্ল্যান্টগুলো স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার অভাবে পুরোপুরি কাজ করতে পারছে না। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও যথাযথভাবে হচ্ছে না।"

চম্বল

১৯৯৫ সালে এনআরসিপির অধীনে আসার আগেই এই নদীর পেছনে ব্যয় হয়ে গেছে ৩.৫৮ কোটি রুপি। ৪২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর ৫০ কিলোমিটারই দূষিত। রাজস্থানের কোটা এলাকায় এই দূষণের মাত্রা ভয়াবহ।

ছবি : পুরুষোত্তম দিবাকর

সাতলুজ

এই নদীর উৎপত্তি তিব্বতে। পাঞ্জাব রাজ্যের ১২টি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সাতলুজে কলকারখানা এবং নাগরিক বর্জ্যের দূষণ ঘটেছে চরম মাত্রায়।

নদীর প্রতি কিলোমিটার পরিচ্ছন্ন করতে ব্যয় হয়েছে ১.৫ কোটি রুপি

এনআরসিপির অন্তর্ভুক্ত নদীগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে সিপিসিবির প্রতিবেদনে দেখা যায়, নদীগুলোর বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডের (বিওডি) মাত্রা শুধু দূষিত নয়, সেখানে ভয়াবহ বিষাক্ততা আছে। সিপিসিবি এবং সিডব্লিউসির পরস্পরবিরোধী পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারতের কিছু কিছু বিখ্যাত নদী প্রায় নাগরিক খালে পরিণত হয়েছে। এই অবনতির কারণ বিভিন্ন নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ। প্রখ্যাত পরিবেশবিদ অনুপম মিশ্র বলেন, "বাঁধ নির্মাণ বন্ধ না করলে নদীদূষণ কখনোই বন্ধ হবে না। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে এ বছর বন্যার প্রধান কারণও এই বাঁধ নির্মাণ।"

সময়ের পরিবর্তন খুব ধীরেই ঘটে। কিন্তু নদীদূষণের মাত্রা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ১৯৮৫ সালে জিএপি-১ প্রকল্প যখন শুরু হয়, তখন কানপুরে গঙ্গা নদীর বিওডি সূচক ছিল ৬.৯ মিলিগ্রাম/লিটার। আর সম্প্রতি সিপিসিবি দেওয়া সূচকে এই মাত্রা ২১। ১৯৮০ সালে যমুনার ওখলা অংশে দূষণের মাত্রা ছিল ১০.৬ মিলিগ্রাম/লিটার। আর এখন তা বিস্ময়করভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ মিলিগ্রাম/লিটারে। গঙ্গা নদীতে দূষণের মাত্রা বেড়েছে তিন ধাপ, আর যমুনায় সাত ধাপ। এনআরসিপির পর্যবেক্ষণে এই দূষণের কারণগুলো সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে কারণ হিসেবে পয়োশোধনাগার প্রকল্প নির্মাণ, স্বল্প খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক বা উন্নত শ্মশান বা নদীতীরে স্থাপনা নির্মাণের কাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, এই ধরনের স্থাপনাগুলো প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ। ভারতের সব কটি নদীই আসলে এক একটি দুঃখের গল্প। দক্ষিণে যদি যাওয়া যায়, সেখানে চেন্নাইতে কুম এবং আড়ায়ার– এই দুটি নদী কারখানার বর্জ্য দূষণের জন্য কুখ্যাত। এনআরসিপি প্রকল্পের অধীনে এই দুটি নদী দূষণমুক্ত করার জন্য ৪৯১.৫২ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্য নদীগুলোর কিছু কিছু অংশ দূষণমুক্ত করার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬১৬.১৭ কোটি রুপি। রাজ্যের এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এল. অ্যান্টনিস্যামি চেন্নাইয়ের নদী দূষণমুক্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জবাবদিহির অভাবের অভিযোগ তুলে বলেন, "চেন্নাই মেট্রোওয়াটার বিভাগ দাবি করছে, তরল বর্জ্য শোধন করার পর তা অন্য জলধারায় ছাড়া হচ্ছে, তা বাস্তবে ঘটছে না।"

কেরালার পম্পা নদীকে বলা হয় মধ্য কেরালার জীবনরেখা। প্রায় ৩০ লাখ মানুষের পানির একমাত্র উৎস এই নদী। ২০০৩-০৪ সালে এনআরসিপির প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পে পম্পা নদীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০০৮-০৯ এর মধ্যে দূষণমুক্ত করার জন্য। নদীটির পানিও তখন লবণাক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে এসে এনআরসিপির ১১টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় প্রকল্পটির কাজ এখনো শুরু হয়নি।

যমুনা

বৃন্দাবনে লোভের মাত্রা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এখানে ১৬শ' শতকের স্থাপিত ঘাটের সমান্তরালে নদী তীরের মাঝ বরাবর পিলার তুলে মোটরযান চলাচলের উপযোগী সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছবি : বানদীপ সিং

"নদীতে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করা না গেলে দূষণ রোধে কোনো প্রকল্পই সফল হবে না। দূষণহীন রাখতে চাইলে নদীকে তার ধারামতো চলতে দিতে হবে।"

–অনুপম মিশ্র, পরিবেশবিদ

সাক্ষাৎকার

জয়রাম রমেশ

"আমরা যদি জাতীয় নদী সংরক্ষণ পরিকল্পনা পরিবর্তন না করি, তাহলে অর্থের অপচয় ঘটতেই থাকবে"

পরিবেশ ও বন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নদী বিষয়ে কথা বলার জন্য সময়ই পাননা। আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শ্যামলাল যাদব তার দপ্তরে এনআরসিপির কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে সেই কথোপকথনের বিশেষ অংশ তুলে দেওয়া হলো:

প্রশ্ন: এনআরসিপি কি ব্যর্থ

উত্তর: আমি কখনোই বলব না এনআরসিপি ব্যর্থ। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটত, যদি এনআরসিপি না থাকত।

প্রশ্ন: এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কী?

উত্তর: আমরা এখন নদী অববাহিকায় কাজ করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি; আগে নির্দিষ্ট শহরসংলগ্ন নদী নিয়ে কাজ করা হচ্ছিল। জাতীয় সংসদে 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল' নামে একটি বিল এখন অনুমোদনের অপেক্ষায়।

প্রশ্ন: এনআরসিপিতে কি পরিবর্তন ও পরিমার্জন আনা প্রয়োজন?

উত্তর: আমরা যদি এতে পরিবর্তন না আনি, তবে অর্থের অপচয় ঘটতেই থাকবে।

প্রশ্ন: নদীদূষণ নিয়ে কাজ করার সময় আপনি আর কী কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন?

উত্তর: ভাগীরথী, অলকানন্দা, গঙ্গা, তিস্তাসহ আরও অনেক নদীর ওপর বড় বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সেখানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও চলছে। ফলে নদীর পানি প্রায় সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেছে। এনজিআরবিএ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে। আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে আমরা একটি নতুন নীতিমালা আনতে যাচ্ছি। নতুন প্রকল্প নিয়ে কাজ করার আগে আমরা পরিকল্পনার ছকটা ভালোভাবে কষে নিতে চাই।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক মোর্চার কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি অগুরুত্বপূর্ণ নদীকে এনআরসিপির আওতায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর: এখানে আমি শুধু একটি কথাই বলতে পারি, কোনো নদী আর কখনোই রাজনৈতিক কারণে এনআরসিপির অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

প্রশ্ন: এনজিআরবিএর জন্য অর্থায়নের পন্থা এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: ৭০/৩০ অনুপাতে অর্থায়নের জন্য আমরা একটি প্রস্তাব করেছি। এখানে ৭০ ভাগ অর্থায়ন চাওয়া হয়েছে কেন্দ্র থেকে এবং বাকি ৩০ ভাগ জোগান দেবে রাজ্য। দুটি রাজ্য অর্থায়নের পুরোটাই কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করার পক্ষে মত দিয়েছে। একটি রাজ্য অর্থায়নের বিষয়টা ৯০/১০ করার প্রস্তাব দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে, অর্থায়নের ক্ষেত্রে ৭০/৩০ পন্থাটিই সঠিক। এখানে অবশ্যই রাজ্যের অংশীদারত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন: বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং তার কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য আপনি কি কোনো প্রস্তাব রাখতে আগ্রহী?

উত্তর: অবশ্যই। আমরা রাজ্য, নগরের স্থানীয় সংস্থা এবং কেন্দ্রের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। এই চুক্তিপত্রে সব পক্ষের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা থাকবে।

২০০৮ সালের আগস্ট মাসে রাজ্য সরকার কাজের শ্লথগতি তদারকির মাধ্যমে দূর করতে একটি কাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করে।

রাজস্থানের চম্বল নদীটি শুধু দূষণের যন্ত্রণাই ভোগ করছে না, এনআরসিবির অর্থায়ন নিয়ে রাজ্য এবং সরকারের সংঘাতও নদীটির ঘাড়ে চেপে বসেছে। ১৯৯৫ সালে রাজ্য এই খাতে ৩০.৫৩ কোটি রুপি বরাদ্দ চেয়ে হাতে পায় ১৩.১৩ কোটি রুপি। বিরক্ত হয়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, নদীদূষণ রোধ প্রকল্পে তারা কোনো অর্থ ব্যয় করবে না। ২০০৫ সালে তাদের আরেকটি আবেদনও নামঞ্জুর হয়ে যায়। যদিও এর দুই বছর পর রাজ্য সরকার ২৫০ কোটি রুপির নদীদূষণমুক্ত করার একটি প্রকল্পের ৩০ শতাংশ বহন করতে সম্মত হয়। এই প্রকল্পের অনেকগুলো প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, সরকার কবে নাগাদ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করবে। গত সপ্তাহে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল সাতলুজ ও ঘাগর নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৩০২ কোটি রুপি ছাড় করানোর তাগাদা দিয়েছেন।

তারপরেও সব মনোযোগ ও অর্থায়নের কেন্দ্রে থেকে যায় গঙ্গা এবং মারাত্মকভাবে দূষিত যমুনা নদী। ২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যমুনা নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি (এনজিআরবিএ)। এই দুই জায়গাতেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চেয়ারম্যান। এনজিআরবিএর প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২০২০ সালের মধ্যে গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করা হবে। এখানে ব্যয় হবে প্রায় ১৫ হাজার কোটি রুপি। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক এনজিআরবিএ প্রকল্পে প্রাথমিক সহায়তা হিসাবে আগামী চার থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু এই বরাদ্দ অথবা সহায়তা সনদ দূর থেকে মধুর মনে হলেও ভারতের নদীগুলোর দূষণ দূর করার কাজটা শুধু অর্থের ওপর নির্ভর করে না। এখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই মানুষগুলোর বিবেক, যারা এই কাজ বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এনআরসিপির দ্রুততা ও বিবেচনা।

সহায়তায় : অম্বরীশ মিশ্র, রোহিত পারিহার, এম জি রাধাকৃষ্ণন, অরবিন্দ ছাবড়া, স্বাতী মাথুর, অমিতাভ শ্রীবাস্তব, ফারজান্দ আহমেদ ও আধি ভিলাপ্পন।

পরিশিষ্ট

শ্যামলাল যাদব

নদীদূষণ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার চিন্তাটা আমার মাথায় প্রথম আসে 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের একটি চিঠি পড়ে। পত্রিকার কোনো একটি বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, বহু ক্ষেত্রে ভারতের অনেক অর্জন থাকলেও দেশের নদীগুলোকে এখনো দূষণমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। আমি এই স্টোরিতে দুটো লক্ষ্য মাথায় রেখে কাজ করেছি। প্রথমটি হচ্ছে ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন প্ল্যানের (এনআরসিপি) অধীনে দেশের প্রখ্যাত নদীগুলোর দূষণ মোকাবিলায় কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা দেখানো। আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল প্রচুর অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পরও এনআরসিপির ব্যর্থতা প্রমাণ করা। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগে ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যম নদীদূষণ নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু তারা এনআরসিপি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নদীগুলো নিয়ে কাজ করেনি এবং এনআরসিপির সামগ্রিক প্রভাবের দিকটিও খতিয়ে দেখেনি।

'রাইট টু ইনফরমেশন' (আরটিআই) আইনটি না থাকলে এই প্রতিবেদন আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। ২০০৫ সালে ভারতে এই আইন কার্যকর হয়। প্রশাসনযন্ত্রের ভেতর থেকে এক্সক্লুসিভ এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য খনন করে বের করে আনার ক্ষেত্রে এই আইন গণমাধ্যমের জন্য একটি কার্যকর অস্ত্র। তবে আপনার যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকে, তাহলে এ ধরনের তথ্য বের করা এবং ব্যবহার করা–কোনোটাই সম্ভব হবে না। এখানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে একজন সাংবাদিকের মনে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে, তিনি কী জানতে চান এবং রিপোর্টে কী প্রকাশ করবেন। এই ধারণা পরিষ্কার না থাকলে একটি প্রতিবেদন প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ হলেও তার বলার দিকটা হারিয়ে যায়।

'এনআরসিপি'র সূচনা হয় আশির দশকের মাঝামাঝি। ওই সময়ে নদীগুলোকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। এখানে আমি প্রথমে দেখতে চেয়েছি, এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পটির সঙ্গে কতগুলো সংস্থা জড়িত রয়েছে। 'সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড' (সিপিসিবি), বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় এক ডজন দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, 'সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন' এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাছে আমি একই ধরনের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করি। আমার চাওয়া ছিল ৩৮টি নদীর প্রতিটির পানির নমুনা পরীক্ষার প্রথম প্রতিবেদনের অনুলিপি। তারপর আমি এখন একই জায়গা থেকে সংগৃহীত পানির নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করি। এসব তথ্য চাওয়ামাত্র আমার হাতে এসে পৌঁছায়নি। কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে এসব তথ্য আদায় করার জন্য আমাকে একের পর এক আবেদনলিপি পাঠাতে হয়েছে। ভারতে 'আরটিআই' আইন ব্যবহার করেও কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করা বেশ কঠিন কাজ। যেহেতু সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য গোপন করার কাজটি ভালোই জানেন, তাই এ ধরনের তথ্য হাতে পেতে আমার এক বছর সময় লেগে যায়। তথ্য পাওয়ার পর আমার সম্পাদক এবং সোর্স হিসেবে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেগুলো যাচাই ও পর্যালোচনা করি। গবেষণা পর্বের কাজ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিই। ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দূষিত নদীর প্রবাহের ছবি সংগ্রহ করি এবং রিপোর্টে ব্যবহার করার জন্য সহজে বোধগম্য গ্রাফিকস চিত্র তৈরি করাই।

আমার কর্মস্থল আমাকে বছরে একটিমাত্র রিপোর্ট করায় না। আগেও পাশাপাশি একই ধরনের অনেকগুলো কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। আমার মনে হয়, রিপোর্ট করার জন্য বেছে নেওয়া বিষয়ের ওপর সব তথ্য হাতে এসে গেলে এবং রিপোর্টের লক্ষ্য স্থির করার পর লেখার কাজটা সহজ হয়ে আসে। ভালো একটি রিপোর্ট লেখার জন্য দুটি কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রথমত, রিপোর্টটি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য করতে আপনাকেও লেখায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রিপোর্টে অনেক ছবি, গ্রাফিকস এবং বক্স করে তথ্য ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আরটিআই আইন ব্যবহার করে সংগ্রহ করা প্রত্যয়িত তথ্য রিপোর্টে ব্যবহার করলে কোনো ধরনের মামলায় পড়ার ঝামেলা থাকে না। বলতেই হবে, এটা আরটিআই আইনের একটি বড় ইতিবাচক দিক। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর এর তথ্যগত দিক নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি, কোনো মহল আদালতেও যায়নি। উল্টো বিভিন্ন মহল থেকে রিপোর্টটি প্রশংসিত হয়। ২০১০ সালে এই কাজের জন্য ইউরোপিয়ান কমিশন 'লরেঞ্জো নাটালি জার্নালিজম' আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেয় আমাকে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে পাই 'ডেভেলপিং এশিয়া জার্নালিজম' নামে আরেকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। আমাদের দেশের সরকারও এই নদীগুলোর দূষণ রোধে তাদের অনেক কৌশল পরিবর্তন করেছে। তাই রিপোর্টের ফলাফল এবং স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট।

২.

জলবায়ু নিয়ে প্রতারণা: কার্বন ব্যবসার গোপন অন্দরমহলে

মার্ক শাপিরো

ভূমিকা

পরিবেশবিষয়ক অনুসন্ধানে মার্ক শাপিরোর মতো কাজ কম সাংবাদিকই করেছেন বলে মনে হয়। তিনি কাজ করেন কলম্বিয়ার অকল্যান্ডে 'সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং'-এ। সেই বিখ্যাত টিভি সিরিয়ালের গোয়েন্দা চরিত্র কোলাম্বোর মতো শাপিরোর মাঝেও জটিল বিষয়ের পর্দা উন্মোচন করার আলাদা ক্ষমতা আছে। শাপিরোর এই প্রতিবেদন ব্যাখ্যামূলক আর অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের মধ্যে ফারাক বুঝতে সহায়তা করবে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্যই হলো সব সময় বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতির সন্ধান করা। কার্বন ব্যবসা এখন পৃথিবীতে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা। গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে এই বাণিজ্য নিয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। সেখানে অবশ্য যেভাবে বলা হয়, এই ব্যবসায়ীরা পরিবেশ রক্ষায় সচেতন ভূমিকা পালন করে থাকে, তা পুরোটা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। বেশ কিছু রিপোর্টার আছেন, যারা শুধু জ্ঞানী, নীতিমান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বার্তাবাহক হিসেবেই নিজেদের দেখতে চান। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদের সক্ষমতার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখেন না। তাই তারা এ ধরনের মানুষদের জন্য প্রতিবেদন লেখেন। তারা কখনোই এ ধরনের মানুষদের ভুলত্রুটি বা কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে কলম ধরেন না। তাদের পক্ষে কখনোই অনুসন্ধানমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। শাপিরো এই বাণিজ্যের পুরো প্রক্রিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদাভাবে পরীক্ষা করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর একেবারে ভেতরকার ফাঁকটা বের হয়ে আসে। এই স্টোরির সবচেয়ে কঠিন অথচ অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হচ্ছে শাপিরো নিজের উপলব্ধির পাশাপাশি তাঁর তথ্য সংগ্রহের সূত্রদেরও সমান সম্মান দিয়েছেন। তিনি তার খবরের উৎসের পাশাপাশি নিজেকে তাদের একজন সমকক্ষ হিসেবেই স্থাপন করেছেন। তিনি লেখার মধ্যে পাঠকদের সঙ্গে এমন ভাষায় যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন, যাতে মনে হয় পাঠকেরাও মতামত দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। তথ্যেও সূত্রদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার প্রস্তুতির বিবরণ স্টোরিতে আছে। এই বিবরণ থেকে বোঝা যাবে, কীভাবে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। তিনি কীভাবে স্টোরির গতিপথ গুছিয়ে নেন, সেটাও এখানে একটি পর্যবেক্ষণের বিষয়। শাপিরো এই স্টোরিতে একটি অপরিচিত শিল্পের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি একটি মানচিত্রের মতো পুরো বিষয়কে সাজিয়ে কাজটি করেছেন নিপুণতার সঙ্গে। এই দিকটিও একজন সাংবাদিকের জন্য শিক্ষণীয়।

হারপার'স ম্যাগাজিন (ইউএস)
ফেব্রুয়ারি ২০১০

"না, মেঘের ওপর ওটা বিমূর্ত কিছু নয়। আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি তার পরিমাপও করতে পারি," প্রায় চেঁচিয়ে কথাগুলো বললেন তালিতা বেক, পেশায় একজন কার্বন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমি তার সঙ্গে কার্বন বিষয়ে কথা বলছিলাম। মাত্র এক দশক আগেও এই পেশার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এখন শিল্প-কারখানার কার্বন নিঃসরণ পরিমাপের ক্ষেত্রে কার্বন অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রচলিত পেশা হয়ে উঠেছে। মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার তালিতাকে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের অফিস থেকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় কার্বন নির্গত হওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে। আরও গুছিয়ে বললে, তাকে এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় যারা এই নিঃসরণ ঘটবে না বলে শপথবাক্য পাঠ করেছে। এই জায়গাগুলোর মধ্যে কোনোটা দুর্গন্ধযুক্ত শূকরের খামার, কোনোটা শহরের নোংরা ফেলার জায়গা অথবা আখ প্রক্রিয়াকরণের কারখানা। তবে এই শপথবাক্য যারাই অমান্য করছে, সেটা হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কোনো কারখানা, লন্ডন, জার্মানি অথবা জাপানে অবস্থিত কোনো স্থাপনা অথবা কিয়োটো দলিল অনুমোদিত দেশের কোনো কারখানাই হোক না কেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে শপথ ভঙ্গ করার দায়ে লাখ লাখ ডলারের মামলা ঠুকে দেওয়া সম্ভব।

কার্বন-বাণিজ্য এখন পৃথিবীতে দ্রুত বিকাশমান পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। এই বাণিজ্যে দূষণ রোধ করার জন্য বিভিন্ন সরকার এবং কোম্পানি এখন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য ক্রেডিট কেনাবেচা করতে পারে। এই কেনাবেচার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সাল থেকে কিয়োটো দলিলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে গ্রিনহাউস গ্যাস দূষণ ঘটানো কারখানাগুলোর ওপর নিঃসরণ বন্ধ করার জন্য 'ক্যাপ' পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয় এবং অন্যত্র কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য ক্রেডিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। (ক্যাপ পদ্ধতিতে কারখানাগুলো থেকে বছরব্যাপী কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হওয়ার একটি মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।) গোল্ডম্যান স্যাকস, মেরিল লিঞ্চ ও সিটিব্যাংকের মতো বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও লন্ডন শহরে কার্বন কেনাবেচার জন্য আলাদা ডেস্ক খুলেছে; যেসব ব্যবসায়ী একদা তেল-গ্যাসের বাজারে জুয়া খেলত, তারাই এখন আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতির একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে নতুন সম্ভাবনার খেলায় মেতে উঠেছে। বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান পয়েন্ট কার্বনের মতে, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং অন্য সহযোগীরা যদি আমেরিকায় 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেন, তাহলে কার্বন ক্রেডিট ২ থেকে ৪৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারে পরিণত হবে।

'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' ব্যবস্থায় বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত শিল্প এবং সিমেন্ট কারখানাগুলোতে তাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণের মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। কারখানাগুলো তাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাসের পরিবর্তে অন্যদের কাছ থেকে নিঃসরণ হ্রাস কিনতে পারে। ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে থেকে তাদের ক্রেডিট কেনাবেচা করছে। এই সীমারেখা বৃহৎ শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে যেমন নিঃসরণের মাত্রা নির্দিষ্ট করছে, তেমনি ভবিষ্যতে তারা কতটুকু সীমার মধ্যে থাকবে, তা-ও নির্ধারণ করে দিচ্ছে। শিল্প-কারখানা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিঃসরণ পরিমাপের ক্ষেত্রে সেখানে বসানো মিটারের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে। কিয়োটো প্রটোকলে কোম্পানিগুলোর মধ্যে সমতা বিধান করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর দূষণ হ্রাস প্রকল্প থেকে 'অফসেট' ক্রেডিট ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে। ('অফসেট ক্রেডিট' বলতে বোঝায় একটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস করেছে)। এ ধরনের প্রকল্পে যেখানে এখন বর্তমানে মোট লেনদেনযোগ্য ক্রেডিটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমা আছে, সেগুলো নজরদারির কাজ জাতিসংঘ করছে। প্রতিটি ক্রেডিটের বিপরীতে এক মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বোঝানো হয় এবং এখন তা ৩০০ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। (আমেরিকায় যদি 'ক্যাপ অ্যান্ড ক্রেডিট' ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তাহলে এই মজুত ১০০ গুণ বাড়বে)।

পৃথিবীতে এখন 'কার্বন ডেভেলপার' নতুন এক পেশা হিসেবে বিকাশ লাভ করছে। এই পেশায় জনশক্তি নিয়োগ করছে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি। তারা বিক্রি হবে এমন কার্বন হ্রাস প্রকল্পের খোঁজে গোটা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে তালিতা বেকের মতো বহু 'কার্বন অ্যাকাউন্ট্যান্ট' এই কার্বন হ্রাসের বিষয়টা যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য কাজ করছেন।

আমি বেকের সঙ্গে দেখা করি ব্রাজিলে এসজিএস গ্রুপের দপ্তরে। বেক সেখানেই কাজ করেন। ঢুকতেই চোখে পড়ে আলমারিতে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফারের সঙ্গে স্তূপ করে রাখা আরও অনেক সংবেদনশীলতা পরিমাপ যন্ত্র। এক শতাব্দী আগে এসজিএস প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে। তাদের কাজ ছিল ইউরোপের বাইরে পাঠানো শস্যের ওজন পরিমাপ করা। তবে এখন বার্লির আর্দ্রতা খোঁজার কাজ থেকে এসজিএস অনেক দূর সরে এসেছে। এখন তাদের মূল কাজ হচ্ছে পণ্যের নিরাপত্তা পরিমাপ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যের ভেতরে জিনগত প্রকৌশল ব্যবহার করে ঢুকিয়ে দেওয়া কিছু উপাদানের উপস্থিতি তারা শনাক্ত করেছে। একইভাবে তাদের অনুসন্ধানে শিশুদের খেলনায় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকল ঘোষণার পর এসজিএস তাদের কাজের ধরনে পরিবর্তন এনে কার্বন শনাক্তকরণের কাজের সঙ্গে জড়িত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের প্রায় ১২টি দপ্তরে ১০০ জন যাচাইকারী কাজ করছে। এই যাচাইকারীদের একজন বেক। ইংল্যান্ডে পরিবেশবিজ্ঞানের ওপর ডিগ্রি নিয়ে ২০০৮ সালে নিজের দেশ ব্রাজিলে ফিরে আসেন বেক। তার স্বপ্ন, এই সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জটি মোকাবিলা করা। বেক বলেন, "আমরা কাজ করছি অনেকটা পরিবেশ পুলিশের মতো। এখানে জাতিসংঘের আইন আছে, আর আছে আমাদের মতো পুলিশ।"

জাতিসংঘ এর আগে কখনো কার্বন লেনদেনের ওপর নিরাপত্তা নজরদারি এবং 'কার্বন অফসেট' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি। এই ব্যবস্থার অনুমোদন দেয় 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' (সিডিএম)। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বলা যায় অভূতপূর্ব। গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ঘটে কলকারখানা, মোটরচালিত বাহন, কাটা গাছ, প্রাণী এবং কৃষিবর্জ্য থেকে। পৃথিবীর সর্বত্রই আরও এমন অনেক উৎস থেকেও এই দূষণ ঘটছে। এ ধরনের গ্যাসের দূষণ হ্রাসের ক্ষেত্রে বাজারে প্রচুর প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু কার্বন বিষয়টা তো বাজারে প্রচলিত আর দশটা পণ্যের মতো নয়। এই লেনদেনের মধ্যে কাউকে বস্তুগত কোনো আকৃতি সরবরাহ করা যায় না। এই অস্পষ্টতার জায়গাটা পুষিয়ে দিতে জাতিসংঘ নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি যাচাই করার জন্য পৃথিবীজুড়ে ২৬টি ফার্মকে অনুমোদন দিয়েছে। জাতিসংঘের ভাষায় এই কার্বন অ্যাকাউন্টিং ফার্মগুলোকে বলা হয় 'ডেজিগনেটেড অপারেশনাল এনটিটি (ডিওই)। বিভিন্ন কোম্পানির দেওয়া প্রতিশ্রুতি এক বছর পর কতটা রক্ষিত হয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখাই এদের কাজ।

কার্বন যাচাইয়ের কাজে এখন দুটি ফার্ম প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তার একটি হচ্ছে এসজিএস, আরেকটি ফার্ম হচ্ছে দে নরস্ক ভেরিতাস (ডিএনভি)। নরওয়ের এই ফার্ম মূলত কাজ করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে। এই খাতে অন্য ফার্মগুলোর মধ্যে একটি ডেলয়েট টুশ তোমাৎসু, পরিবহন নিরাপত্তাবিষয়ক ফার্ম লয়েড রেজিস্টার এবং টুভ সুড। এই ফার্ম জার্মান এবং তারা শিল্পকারখানা পরীক্ষণের কাজ করে। ডিওইর কাজ হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র ঘেঁটে নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখা। প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের দেওয়া বক্তব্যে ভবিষ্যতের নির্গমন বা নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়েও একটি আনুমানিক চিত্র দেওয়ার কথা রয়েছে।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছুদিন আগে বেক তার দুই সহকর্মীকে নিয়ে দুকি দে কাসিয়াস নামে একটি জায়গায় মিশ্র সার তৈরির একটি প্রকল্প পরিদর্শনে যান। কারখানাটা গড়ে উঠেছে রিও ডি জেনিরোর উত্তরে গুয়ানাবারা উপসাগরের তীরে। সেই প্রকল্পের মূল কাজ বিভিন্ন বড় স্টোর এবং রাস্তার পাশে বসা সবজি ও ফলের দোকানের বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলো জৈব সারের সঙ্গে মেশানো, যা আরেকটি নতুন সার হিসেবে কৃষকেরা ব্যবহার করতে পারবেন। সংগৃহীত এই বর্জ্য মিশ্রণের উপযোগী করতে অ্যারোবিক মিশ্রণ ও মাইক্রোঅর্গানিজম পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পের উচিত ছিল মিথেনের ব্যবহার কমিয়ে আনা। কারণ, মিথেন কার্বনের চেয়ে ২০ গুণ বেশি তাপ উৎপাদন করে। এই প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা পৃথিবীতে কার্বন-বাণিজ্যে বড় বিনিয়োগকারী আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের ইকোসিকিউরিটিজ। কিন্তু প্রকল্প পরিদর্শন করে বেক ও তার সহকর্মীরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পান। তারা বুঝতে পারেন, প্রকল্পটি পুরোপুরি চালু হলে ৬৭ হাজার টনের সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করবে, যা নীতিমালা বহির্ভূত। বর্তমানে কার্বনের প্রতি টন বাজারমূল্য গড়ে ২২ মার্কিন ডলার। এই হিসাবে এই প্রকল্পের উদ্যোক্তারা জাতিসংঘের অনুমোদন সাপেক্ষে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই প্রতিবেদন তৈরি করা পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে প্রায় ২ হাজার সিডিএম প্রকল্প রয়েছে। তারাও এই প্রকল্পের মতোই আর্থিক সুবিধা পাবে। সিডিএম প্রকল্পগুলো পৃথিবীর এমন ৫৮টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করেছে বলে দাবি করে। এই দেশগুলোর মধ্যে ভারতে রয়েছে জলবিদ্যুৎ বাঁধ, মরক্কোতে বায়ুকলচালিত খামার, ব্রাজিলে মিথেন সংগ্রাহক প্রকল্প।

বিশ্ববাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদা শিল্পকারখানার বিকাশ ঘটিয়েছে। আর এই দ্রুত বিকাশ আমাদের পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসের দূষণ বাড়িয়েছে। কিন্তু এখন চিত্রটি ভিন্ন। নিঃসরণ কমিয়ে এনে জলবায়ু পরিবর্তনের গতি কমাতে এখন এই কারণগুলোকেই একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিশাল উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কার্বনের পরিমাণ যাচাই ও শনাক্ত করা এবং এই বিষাক্ত গ্যাসকে ইতিবাচক পণ্যে রূপান্তর ঘটানোর জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করাই হচ্ছে একটি ইতিবাচক কাজ।

কার্বন ক্রেডিট অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প খুঁজে পাওয়ার পর বিনিয়োগকারীরা প্রথমে কার্বন হ্রাসের পরিমাণ যাচাই করার জন্য একজন ডিওই নিয়োগ দেন। তখন ডিওইর প্রথম কাজ হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের বর্তমান হার নির্ধারণ করা এবং তা কমানোর জন্য কার্যকর প্রযুক্তি কী হতে পারে, সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করা। সেই রিপোর্ট তখন জাতিসংঘের নির্বাহী বোর্ডের কাছে উপস্থাপন করা হয়। বোর্ড মতামত দেওয়ার আগে নিজেরা রিপোর্টের যথার্থতা যাচাই করে। আর বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার পর ধরে নেওয়া হয়, প্রকল্পটি যাচাই করা হয়ে গেছে এবং এটি ভবিষ্যতের চুক্তি হিসেবে সম্ভাবনাময় ক্রেডিট বাজারে উপস্থাপন করা যায়। ভবিষ্যতের চুক্তি হচ্ছে, এই ক্রেডিট কেনাবেচা করা যাবে কিন্তু যেসব ক্রেতার ক্যাপ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রেডিটের প্রয়োজন, তারা তখনই সেই ক্রেডিট হাতে পাবে না। সেটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকবে। সরবরাহ করা ক্রেডিট হাতে পেতে সময় লেগে যায় কয়েক মাস অথবা বছর। এটি হাতে পাওয়ার পর আবারও ডিওইর মাধ্যমে প্রতিশ্রুত নিঃসরণ সত্যি সত্যি কমানো হয়েছে কি না, তা যাচাই করে নেওয়া হয়। এই পর্যায়ে এসে ক্রেডিটকে বলা হয় 'সার্টিফাইড এমিসন রিডাকশন' (সিইআরএস) এবং ক্রেতারা যত পরিমাণ ক্যাপ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন, তার বিপরীতে এই ক্রেডিট ক্রয় করতে পারবেন।

যাচাই এবং শনাক্তের কাজে বিনিয়োগকারী ছাড়া একমাত্র ডিওই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করতে পারবেন। কখনো কখনো যাচাই করার প্রক্রিয়ায় সরবরাহ করা অথবা অনুমোদন না পাওয়া ক্রেডিট পুনঃযাচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। ২০০৭ সালে অনেকগুলো প্রকল্পের ক্রেডিটের ক্ষেত্রে পুনঃযাচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। ওই সময়ে শেয়ারবাজারে ইকোসিকিউরিটিজ নামে একটি কোম্পানি তাদের মোট তহবিল (পোর্টফোলিও) প্রায় ৪০ মিলিয়ন ক্রেডিট কমিয়ে এনে শেয়ার বিপর্যয়ের শিকার হয়। তবে ২০০5 সাল থেকে এ পর্যন্ত পুনঃ তদন্তের আবেদন খারিজ হয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ।

কার্বনের এই কেনাবেচার বাজার দুটি লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী। প্রথমটি হচ্ছে, কার্বন বেচাকেনায় একটি কার্যকর বাজার হিসেবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করে কার্বন অফসেটের স্থায়ী সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বাজারমূল্য যাচাই করে মুনাফা নিশ্চিত করা। আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে, গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর জন্য মূল পুঁজিকে পরিবেশ-অনুকূল জ্বালানি খাতের দিকে প্রবাহিত করা। এই দুটি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যাচাই করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাস্তব পৃথিবীতে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বাণিজ্যিক অস্পষ্টতায় হারিয়ে যাচ্ছে। তবে অন্যদিকে

এই যাচাইপ্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্বলতার দিকও আছে। সেটা হচ্ছে, অফসেট কার্বনের চাহিদা এবং সিডিএম তহবিল ছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে দুরূহতা। এই বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে সংজ্ঞার প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। কারণ, পুরো বিষয়টি তো আসলে ভবিষ্যতের দিকে ধারণাগত একটি পদক্ষেপ।

কিন্তু সিডিএম তহবিল ছাড়া নিঃসরণ রোধে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্ভব নয়, তা প্রমাণ করার উপায় কী? এই কাজটা করার জন্য প্রকল্প উদ্যোক্তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে, নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার সব কলকারখানায় হয় না, যদিও সেটা করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। (এই কাজটা যদি সবাই করত, তাহলে জাতিসংঘের কাছ থেকে অর্থ তহবিল অনুমোদনের প্রয়োজন কেন হবে?) পাশাপাশি এটাও একজন প্রকল্প উদ্যোক্তাকে দেখাতে হবে সিডিএম ফান্ড ছাড়া প্রকল্পটি অর্থনৈতিক সক্ষমতা হারাবে (যদি কাজটা এমনিতেই করতে হয়, তাহলে এখানে আর্থিক তহবিলের প্রয়োজন হচ্ছে কেন?) পাশাপাশি সিডিএম-এর আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড যে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তার প্রমাণ হিসেবে নথিপত্রও থাকতে হবে।

যারা যাচাইকারী, তারা এই চাহিদাগুলো "শনাক্ত" করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। ক্লেয়ার ব্রেয়েনবাক গ্রিনহাউস গ্যাস বিষয়ে নীতিমালার ওপর মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও জাতিসংঘে কাজ করেছেন। দুই জায়গাতেই তিনি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে নিঃসরণ পর্যবেক্ষণে কাজ করেছেন। তিনি যাচাইকারীদের কাজের বিষয়ে বলেন, "এদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে, নিয়মের অন্যথা কোথায় ঘটছে তা দেখা। কাজটা সহজ নয়।"

জার্মান পরিবেশ প্রকৌশলী ল্যামবার্ট স্নাইডার জাতিসংঘের কার্বন অফসেট বিশ্লেষণ করার জন্য যে প্যানেল কাজ করে, সেখানে দীর্ঘ সময় কর্মরত ছিলেন। তিনি 'ক্লাইমেট পলিসি' নামে একটি পরিবেশবিষয়ক পত্রিকায় শত শত কার্বন অফসেট প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনার কাজ করেছেন। তার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণে বের হয়ে এসেছে যে এ ধরনের প্রকল্পের ৬০ শতাংশ প্রকৃতপক্ষে সিডিএম-এর কার্যকারিতার পক্ষে প্রমাণ হাজির করে। বাকি ৪০ শতাংশ প্রকল্প নিঃসরণ এমনিতেই কমায়। তিনি আমাকে বলেন, "ধরা যাক, আপনি একজন প্রকল্প উদ্যোক্তা আর আপনিই আমাকে বলছেন, আপনার প্রকল্পটি কীভাবে 'অ্যাডিশনাল' হয়েছে। (এখানে 'অ্যাডিশনাল' বলতে একটি অফসেট প্রকল্পের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর না হওয়াকেই বোঝানো হচ্ছে। এ রকম একটি প্রকল্প যদি স্বনির্ভর হয়, তাহলে তা এই বাণিজ্যের পরিভাষায় আর অ্যাডিশনাল নয়।) ডিওই এই বিবরণগুলো পরীক্ষা করে দেখে। তাদের মতামতের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখা যায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা দেখেশুনে মতামত দিয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে অফসেট প্রক্রিয়ায় নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আশাবাদের ভেতরেই একটা চোরা কুঠুরির মতো জায়গা আছে। একের পর এক নিরীক্ষায় দেখা গেছে, সিডিএমগুলো প্রতিশ্রুত নিঃসরণ হ্রাস পরিমাপ অনুযায়ী সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইংল্যান্ডের লর্ড নিকোলাস স্টার্ন সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জোরদার পদক্ষেপ নিতে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, গত বছর নিঃসরণ হ্রাসের সফলতা নিয়ে যে পরিমাণ দাবি জানানো হয়েছে, তার ৩০ শতাংশই বাড়িয়ে বলা। স্টার্ন গত বছর লন্ডনে নিজেই একটি কার্বন রেটিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। তার এজেন্সির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অফসেটের উন্নত মানদণ্ডের জন্য আবেদন করা এবং পাশাপাশি এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরবরাহকৃত কার্বন নিঃসরণ ক্রেডিট নিশ্চিত করা।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের একটি কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে সিমেন্ট ও সার কারখানার ক্ষেত্রে নিঃসরণ বিষয়ে ভুলের মার্জিন বা সীমা খুব বেশি হলে ১০ শতাংশ। তেল, গ্যাস ও কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই মার্জিন দাঁড়ায় ৬০ শতাংশে। কিছু কিছু কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের কারখানার ক্ষেত্রে এটা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ শতাংশে পৌঁছায়। ওকো ইনস্টিটিউট বার্লিনের একটি প্রখ্যাত 'থিংক ট্যাংক' বা বিশেষজ্ঞ সংগঠন। তারা 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড ইন্টারন্যাশনাল'-এর পক্ষ থেকে যাচাই প্রক্রিয়ার ওপর একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরি করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধান পাঁচ যাচাইকারী প্রকল্প বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং কাজের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা মোকাবিলা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে চূড়ান্তভাবে অকৃতকার্য হয়েছে।

অ্যাক্সেল মিকেলোভা জেনেভায় নিজস্ব কার্বন নীতিবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে কাজ করতেন জাতিসংঘের সিডিএম নিবন্ধন ও প্রদানবিষয়ক কমিটিতে। তিনি আমাকে বলেছেন, ২০ থেকে ২৫ শতাংশ প্রকল্পকে কার্বন ক্রেডিট সরবরাহ করাই উচিত নয়; কারণ, তারা নিজেদের অ্যাডিশনালিটির প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকায় কংগ্রেসের অনুসন্ধান করার জন্য অন্যতম বাহু হচ্ছে 'গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস' (জিএও)। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "এ ধরনের অসংগতির কারণে কার্বন নিঃসরণ বা নির্গমন হ্রাস করতে কার্বন অফসেট পদ্ধতিকে একমাত্র পন্থা ভাবা ঠিক হবে না।" জিএও গত মে মাসে কিছু প্রতিনিধির এই পদ্ধতি আমেরিকায় কতটা কার্যকর, এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে এই বক্তব্য দেয়।

মিকেলোভা বলেন, "প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, শনাক্তকারীরা একটি প্রকল্পের যথার্থতা প্রমাণের জন্য কাজ করবেন। কিন্তু প্রকল্পের উদ্যোক্তারা যখনই তাদের জড়িত করল, তখনই তারা শুধুই একটি রাবার স্ট্যাম্পের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রকল্প একবার চালু হয়ে গেলে কারও আর কিছু করার থাকে না।"

আমি ব্রাজিলের মিনাস জেরাইস রাজ্যে এ ধরনের চালু হয়ে যাওয়া প্রকল্পের দেখা পেয়েছি। আমি দেখতে পেয়েছি, ক্রমাগত সোনা ও লোহা উত্তোলনের কারণে সেখানকার দা ক্যানেস্ত্রা পর্বতশ্রেণির ক্ষতবিক্ষত অবস্থা। মহাসড়ক ধরে যেতে যেতে চোখে পড়েছে শূন্য গোচারণভূমিতে গবাদিপশু চরছে, যেখানে একদা জঙ্গল ছিল। আমি গাড়িতে বসে দেখতে পাচ্ছিলাম কাঠবোঝাই ট্রাকের সারি। সেগুলো দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল 'মিনাস জেরাইস' বা জেনারেল মাইনে সরবরাহের জন্য। আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর লুক্কায়িত সম্পদ খুঁজে বের করাই বোধ হয় ব্রাজিলের এই রাজ্যের নিয়তিতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের গাড়ি মহাসড়ক ছেড়ে কাদায় মাখামাখি লম্বা একটি রাস্তায় ঢুকে পড়ে। আমাদের বাম দিকে দেখতে পাই আটলান্টিক অরণ্যের বুনো অবশেষ আর ডান দিকে ইউক্যালিপটাস গাছের দীর্ঘ সারি। এগুলো পার হয়ে আমরা পৌঁছাই রুক্ষ এক কয়লা খনিতে। সেখানে ধুলায় আচ্ছন্ন সমতল একটি জায়গায় কয়লা স্তূপ করে রাখা আছে। সেই কয়লার স্তূপের উল্টো দিকে লম্বা লম্বা, বহুবর্ণে রঞ্জিত স্থাপনাগুলোকে দেখতে এস্কিমোদের বরফের ঘর ইগলুর মতো দেখালেও সেগুলো আসলে ছিল ভাটা।

আমার ভ্রমণসঙ্গী রডরিগো কোয়েলো ফেরেরা সেই কয়লার পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে জানালেন, "এই হচ্ছে আমাদের কয়লা খনি।" ফেরেরা ব্রাজিলের 'প্ল্যান্টার' নামে একটি বড় বন সম্পদ কোম্পানিতে কার্বন বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেন। আমার মনে হলো, খনি বলতে তিনি আসলে গাছ বা গাছের ধ্বংসাবশেষ যেটুকু কয়লার মধ্যে পড়ে আছে, তা বোঝাতে চাননি। ফেরেরার কাছ থেকে জানা গেল, এই কয়লায় যে পরিমাণ কার্বন আছে, তা ওই কোম্পানি কার্বন নিঃসরণ বা নির্গমনের ক্রেডিট হিসেবে বাজারে বিক্রি করতে চায়। ফেরেরা আমাকে আরও জানান, তার কোম্পানির ভাটাগুলোতে ইউক্যালিপটাস গাছ ৪০০ ডিগ্রি তাপে পোড়ানোর সময় বিশেষ প্রযুক্তি-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে পোড়া ইউক্যালিপটাস থেকে মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ কম হয়। সেই গরম কয়লা ভাটা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ২০ মাইল দূরের একটি লোহার কারখানায়। সেখানে লোহা গলিয়ে ফ্রিজ ও গাড়ির জন্য ২৫ পাউন্ডের প্লাগ বা ছিপি তৈরি করা হয়। সেখানেই গরম কয়লা ঠাণ্ডা করা হয়।

এই জটিল প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে একটি প্রথম শ্রেণির ডিওই দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই কোম্পানি জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যে প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা দাখিল করেছে, তা এসজিএস যাচাই করে জানিয়েছে, কোম্পানিটি আগে যে কয়লা ব্যবহার করত, তা থেকে এই কাঠকয়লা দুই-তৃতীয়াংশ কম গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ঘটায়। ডিএনভি যাচাই করে দেখেছে, তারা ভাটায় যে নতুন বায়ুপ্রবাহ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, তা গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়েছে। টুভ সুড নিশ্চিত করে যে, ইউক্যালিপটাস গাছও সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে নির্গত গ্যাস শোষণ করে, যা গোচারণভূমি পারে না। প্লান্টার আশা করে, তাদের ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে ইউক্যালিপটাস গাছ, আটটি ভাটা এবং কাঠকয়লার আগুনে চলা লোহার কারখানার মাধ্যমে আগামী ২৮ বছরে তারা ১২.৫ মিলিয়ন টন কার্বন ক্রেডিট অর্জন করবে। এই ২৮ বছর সময়কে তারা প্রকল্পের মেয়াদ বলে ধরে নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তারা বিশ্বব্যাংকের কাছে ১.৫ মিলিয়ন টন কার্বন ক্রেডিট বিক্রি করে প্রকল্পের প্রাথমিক অর্থায়ন নিশ্চিত করে ফেলেছে। কোম্পানিটির কাছে এখনো ১১ মিলিয়ন টন কার্বন ক্রেডিট মজুত আছে।

কিন্তু আমি যখন ওই প্রকল্প পরিদর্শন করি, তত দিনে সিডিএম পদ্ধতির অনিশ্চয়তার দিকটির প্রমাণ পাওয়া যেতে শুরু করেছে। ওই সময়ে তিনটি ডিওই প্লান্টারের প্রকল্পের প্রতিটি পদ্ধতি পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটি তখন পুরোদমে সক্রিয়। সেখানে গাছ পোড়ানো হচ্ছে এবং তা থেকে উৎপন্ন কাঠকয়লা দিয়ে চলছে লোহা উৎপাদনের কারখানা। কিন্তু গত মে মাস থেকে এই প্রকল্পের সব কার্যক্রম হঠাৎ করেই স্থবির হয়ে যায়, তখনো দাঁড়িয়ে থাকা ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর কাছে কাটা গাছের দশ ফুট উঁচু স্তূপ পড়ে থাকে। নিভে যাওয়া ভাটার পাশেই চোখে পড়ে অব্যবহৃত কাঠকয়লার পাহাড়। সচল লোহার কারখানাটিও নিশ্চল। এই পরিস্থিতি কেন? ফেরেরা জানান, এর জন্য দায়ী বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা। আর এই মন্দায় মোটরযান ও ফ্রিজের দরজা তৈরির বাজারের অবস্থাও খারাপ; বিশেষ করে প্লান্টারের 'পিগ' লোহায় বানানো এসব পণ্য যারা ব্যবহার করেন, তাদের চাহিদাও এখন নিচের দিকে। এই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য রাখা ক্রেডিটের কিছু পরিমাণ কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে।

কার্বন প্রকল্পের পরিচালক ফ্যাবিও মারকুইস বেলো রিজন্টে শহরে অবস্থিত তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে আমার সঙ্গে আলাপকালে বলেন, "আমরা এই ক্রেডিট সেই কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করেছি, যাদের প্রয়োজন আছে।" তিনি বলেন, "আমরা ইউরোপের বিভিন্ন আগ্রহী কারখানা এবং ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।" তিনি অবশ্য আগ্রহী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর নামগুলো প্রকাশ করেননি। এ থেকে প্লান্টার ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেতে পারে।

এই বিশেষায়িত নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে এক হাজার মানুষও ভালোভাবে বোঝেন না সিডিএম-এর অনসাইট নিরীক্ষণ পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে এবং এখানে স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। এই শিল্পে যাচাইকারীদের জন্য আকর্ষণীয় কার্বন প্রকল্পের বাণিজ্যে ঢুকে পড়ার বিষয়টি খুব অস্বাভাবিক নয়। তারা সেখানে ঢুকেও পড়েন এবং সাবেক পেশার সহকর্মীদের তখন হিসাব পরীক্ষা করে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। স্লাইডারের পর্যবেক্ষণ বলে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক ডিগ্রি লাভ করা শিক্ষার্থীরা এই শিল্পে কাজ করতে এসে প্রথম কয়েক বছর একজন যাচাইকারীর সঙ্গে কাজ করে সব অলিগলি চিনে নেন। তারপর যান কার্বন প্রকল্প বিকাশকারীর সঙ্গে কাজ করতে। সেখানে তারা প্রচুর টাকা বেতনও পান।

এই কার্বন প্রকল্প-বিকাশ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতরা অফসেট প্রকল্প স্থাপনের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সরকারের সহযোগী হয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে কমবেশি সবাই বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে মূল আর্থিক সহায়তা পায়। কোথাও কোথাও কোম্পানিগুলো তাদের মালিক বনে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জেপি মরগ্যান চেজের কথা। এই কোম্পানি পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ কার্বন প্রকল্প ইকোসিকিউরিটিজের মালিক। গোল্ডম্যান স্যাকসের মতো কোম্পানির আগ্রহ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রকল্প ব্লু সোর্সের বিষয়ে। ক্যান্টর ফিটজিরাল্ডও এই বাণিজ্যে অন্যতম নাম। তাদের অধীনে রয়েছে ক্যান্টর সিওটুই। এই খাতে কৃষিপণ্যের ফার্মগুলো বড় অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কারগিলের নাম। তারা এখন কার্বন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়দের একজন। আছে বিএইচপি বিলিটন, যাদের রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম খনির ফার্ম। এই বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে অনেকেই সেকেন্ডারি মার্কেটে কার্বন লেনদেন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গোল্ডম্যান স্যাকস আর জে পি মরগ্যানের মতো কোম্পানি লন্ডনে কার্বন কেনাবেচার জন্য আলাদা ডেস্ক বা বিভাগ খুলে বসেছে। ডিওইরা এসব প্রকল্প উদ্যোক্তার কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পেয়ে থাকে এবং তাদেরকে ব্যবসার জন্য প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। প্লান্টারের ফ্যাবিও মারকুইস আমাকে জানান, তারা নিয়মিত যাচাইকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের দামের প্রস্তাব পেয়ে থাকেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘের নির্বাহী বোর্ড এই ব্যবস্থাপনার তদারকি বাড়ানোর জন্য সিডিএম-এর লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৫ সালে যেখানে লোকবল ছিল ২০ জন, সেখানে আজকে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশতে। এদের দুই-তৃতীয়াংশই প্রযুক্তিগত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের কাজ করেন। তারা এখন ডিওই প্রস্তাবনাগুলো অনেক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ছাড় করছেন। ২০০৫ সালে যেখানে আবেদনের মাত্র ১০ শতাংশ পুনর্মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হতো, সেখানে এখন মোট আবেদনের ৬৫ শতাংশই আরও সহায়ক নথিপত্রের জন্য ফেরত পাঠানো হয়। পাশাপাশি জাতিসংঘ এখন যাচাইকারীদের লাগামটাও টেনে ধরার চেষ্টা করছে। ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যবর্তী ৯ মাস সময়ের মধ্যে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম পাওয়া যাওয়ায় ডিএনভি ও এসজিএস-এর ওপর সাময়িক বহিষ্কারাদেশও জারি করেছে জাতিসংঘ।

২০০৮ সালে যখন ডিএনভি-এর ওপর বহিষ্কারাদেশ জারি হয়, তখন তারা শীর্ষ পর্যায়ের কার্বন অ্যাকাউন্টিং প্রতিষ্ঠান। মোট অফসেট প্রকল্পের ৪৮ শতাংশ তারাই যাচাই করে থাকে। প্রায় এক হাজার প্রকল্প ছিল তাদের অধীনে। তারা প্রতিনিধিত্ব করত ৪০০ মিলিয়ন টন নিঃসরণ হ্রাসকৃত ক্রেডিটের। ডিএনভি সেই দুটি ফার্মের একটি যারা কিয়োটো প্রটোকলে স্বীকৃত। এ ছাড়া ফার্মটি নিঃসরণের পরিমাপ এবং ভবিষ্যতে নিঃসরণের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। নির্বাহী বোর্ড ডিএনভি-এর কয়েকটি প্রকল্প প্রত্যাখ্যান করার পর তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। বোর্ড এই তদন্ত প্রক্রিয়ার শুরুতে অসলোতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে "তাৎক্ষণিক পরীক্ষা" চালায় এবং সিডিএম টিম পাঁচটি অসংগতি চিহ্নিত করে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষা কর্মচারীদের ত্রুটিপূর্ণ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া, মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষকদের জন্য অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ কারিগরি দক্ষতা ছাড়াই বিশ্লেষক নিয়োগ। সব পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়নের পর আবার সেগুলো জাতিসংঘের কাছে জমা দেওয়ার পর ডিএনভি আবার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাজ করার অনুমতি পায়।

আমার সঙ্গে সাও পাওলোতে তালিতা বেকের সাক্ষাতের চার মাস পর গত সেপ্টেম্বরে এসজিএস-এর বরখাস্তের আদেশটি দেওয়া হয়। এসজিএস যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিঃসরণ হ্রাস সার্টিফিকেটের এক-তৃতীয়াংশই কার্যকর হয়েছে তাদের মাধ্যমে। নির্বাহী বোর্ড একটি প্রকল্পের জন্য তৈরি করা শনাক্তকরণ প্রতিবেদনে অসামঞ্জস্য দেখতে পায়। তখন এসজিএস-এর জন্য "তাৎক্ষণিক পরীক্ষা" ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। তদন্ত চলার সময় এসজিএস নির্বাহী বোর্ডের পর্যবেক্ষণ দলকে তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি তারা তাদের কর্মচারীদের যোগ্যতার মান নিয়ে কোনো প্রশ্নেরও উত্তর তারা দিতে পারেনি। ডিওই-এর মান অনুযায়ী এসজিএস-এর কার্যক্রমে ছয়টি অসংগতি ধরা পড়ে। তারা তাদের নিজস্ব হিসাব নিরীক্ষার প্রক্রিয়া পুনর্মূলায়ন করার পর গত ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ তাদের পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত দেয়।

নিঃসরণ হ্রাসের দায়িত্বের দুই-তৃতীয়াংশই এই দুটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বহন করে আসছে, যা এখন উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর কলকারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় দৃষ্টি

এড়িয়ে যাওয়ার দিকটিও স্পষ্ট করেছে। অন্যদিকে, জাতিসংঘ তদারকির জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের ওপর নজরদারির ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও প্রকাশিত হয়েছে। ডিওই-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য জাতিসংঘের হাতে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে ডিওই কর্তৃক তৈরি এবং উপস্থাপিত প্রতিবেদন। এসব প্রতিবেদন তারাই নিজেদের সংগৃহীত ডেটার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করে। ডিএনভি বা এসজিএস-এর মতো জাতিসংঘ এ ক্ষেত্রেও "তাৎক্ষণিক পরীক্ষা" পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাদের পদ্ধতি ব্যবহারের কাজটা করতে হয় যাচাইকারীদের অফিসে, মাঠ পর্যায়ে নয়। ক্রমশ কঠিন ও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠা প্রকল্পগুলো এবং গোটা পৃথিবীতেই দূরবর্তী এলাকায় নিঃসরণ হ্রাসের হাজার হাজার দাবি উপস্থাপনের ফলে জাতিসংঘের জন্য তদারক করার কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে।

ডিওই-এর মাধ্যমে শনাক্ত প্রতি টন অফসেট পরবর্তী সময়ে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও নিউজিল্যান্ডের যেসব কোম্পানি অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের জন্য অভিযোগের তালিকায় আছে, তাদের প্রয়োজনের তালিকা পূরণ করে। যাচাইকারী অথবা শনাক্তকারীদের অসদাচরণের দৃষ্টান্ত থাকার পরেও নির্বাহী বোর্ডের এখতিয়ার নেই বাজার থেকে কার্বন ক্রেডিট অপসারণের নির্দেশ দেওয়ার।

এক দশকের বেশি সময় আগে কিয়োটো চুক্তির আলোচনাকারীরা কার্বন ক্রেডিট নিয়ে সংকট তৈরির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাবেক কর্মকর্তা ক্লেয়ার ব্রাইডেনিশ কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, কার্বন ক্রেডিটের বিষয়টি নিয়ে ১৯৯৭ সালের শুরুর দিকেই উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল। তখনো বিশ্বে কার্বন বাজার বলে কিছু চালু হয়নি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তখন যে প্রশ্নগুলো উঠেছিল, আজও সেগুলো বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে। প্রশ্নগুলো ছিল, কার্বন ক্রেডিট যদি জাল হয়, তাহলে তার দায় কার ওপর পড়বে? তারা প্রশ্ন তোলেন, ত্রুটিপূর্ণ ও যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়া ক্রেডিট অনুমোদন কি প্রত্যাহার করা যাবে?

তর্ক-বিতর্কে যেসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে কার্বনকে একটি পণ্যে পরিণত করার চ্যালেঞ্জসমূহ এবং দূষণকারীদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড ব্যবস্থা চালু করার সুফল। পাশাপাশি আরও বিনিয়োগকারীদের এই বাণিজ্যে আগ্রহী করে তোলা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকৌশল বিষয়ে অর্থ বিনিয়োগকে প্রবাহিত করা, যাতে দূষণের পরিমাণ কমে আসে।

এই বিতর্ক শেষ হয় দ্রুত কোনো সমাধানের সম্ভাবনা ছাড়াই। সেখানে জাতিসংঘকে কার্বন ক্রেডিট প্রত্যাহার করার ক্ষমতা দেওয়া হয় না। এই বাণিজ্যের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার জন্য বড় হোল্ডিং কোম্পানিগুলোর দায় রয়েছে। কিন্তু তারপরেও বাজারে নতুন পুঁজির প্রবেশ দ্রুত হতে শুরু করলে ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের অবহিত করার আগ্রহ কমে আসতে থাকে। ত্রুটিযুক্ত ক্রেডিট প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অপারগতা আসলে এখানে এমন একটি পণ্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে, যা একদিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং অন্যদিকে পরিবেশগত পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখছে। মাইকেল ওয়ারা একজন আইনের অধ্যাপক। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন' নামে একটি প্রকল্পে অফসেট ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের কাজ করেছেন। আলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই বিষয়টা অনেকটা জাল টাকার মতো। একবার জাল বিষয়টা প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলে তার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়।"

ডিএনভি-এর দাপ্তরিক যোগাযোগ বিভাগের ম্যানেজার ইভা হ্যালভোরসেন আমাকে আশ্বস্ত করতে জানান, কোম্পানির যাচাইপ্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেগুলো শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চিহ্নিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় একটি ভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে। তবে যেখানে সিইআর ইস্যু করাই হয়নি, সেখানে যাচাই করা কার্বন আগেই বাজারে চলে যায় লেনদেনের জন্য।

ডব্লিউডব্লিউএফ-এর ইউরোপ কার্যালয়ের পরিবেশ নীতি বিভাগের পরিচালক সঞ্জীব কুমার বলেন, "আমরা পরিবেশকে বন্দি করে ফেলছি। আপনার যদি একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি থাকে এবং সেখানে আপনি প্রশ্নবিদ্ধ ক্রেডিট দিয়ে নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখতে চান, তখন সেটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাত বছরের জন্য এই ক্রেডিটের কার্যকারিতা কার্যকর থাকতে পারে। সাত বছর মেয়াদে এগুলো নবায়ন করে নেওয়া যায়। কিন্তু আচমকা আপনি যদি ২১ বছরের জন্য অনুমোদন পেয়ে যান, সে ক্ষেত্রে উন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিঃসরণ হ্রাসে আর কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না।"

যাচাইকারীদের প্রতি জাতিসংঘের আরও দৃঢ় অবস্থানের পেছনে একজন মানুষ বড় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি হচ্ছেন ব্রাজিলের হোসে মিগুয়েস। জাতিসংঘের নির্বাহী বোর্ডে তিনি দেশটির প্রতিনিধি এবং সেখানকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি ব্রাজিলের পরিবেশবিষয়ক নীতিনির্ধারক ও পরামর্শকও। কিয়োটো চুক্তির আলোচনার সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় সিডিএম পদ্ধতি তৈরি করতে সহায়তা করেন। এই সিডিএম পদ্ধতির প্রস্তাবনা এখনো পরিবেশবিষয়ক মহলে ব্রাজিল প্রস্তাব নামেই বেশি পরিচিত। রিও ডি জেনিরোতে মিগুয়েস আমার সঙ্গে আলাপকালে বলেন, শিল্পোন্নত দেশ থেকে শিল্পায়নের পথে যাত্রা করা দেশগুলোর জন্য এই পদ্ধতি প্রযুক্তিগত কৌশল এবং জ্ঞান স্থানান্তরে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অর্থ বিনিয়োগকেও ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই পদ্ধতির প্রবর্তন না হলে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি যারা এখন নিঃসরণ ক্রেডিট অনুসন্ধান করছে, তাদের কাছে বিষয়টা অজানাই থেকে যেত।

মিগুয়েস এই পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হয়ে ডিএনভি-এর ওপর তাৎক্ষণিক পরীক্ষা করার নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানিটির বহিষ্কারাদেশ কার্যকর হয়। তিনি বলেন, এর আগে যাচাইকারীদের ধারণা ছিল, স্বল্পসংখ্যক কর্মীকে দিয়ে তারা যে প্রতিবেদনই দাখিল করুক না কেন, জাতিসংঘে তা অনুমোদন পেয়ে যাবে। মিগুয়েস এই কাজে জনবল বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এখন তারা প্রতিটি প্রস্তাবনাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারছে। তার চোখে গোটা পদ্ধতিটির বড় দুর্বলতা হচ্ছে, নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে যাচাইয়ের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরতা। তিনি এই জায়গাকে 'ব্ল্যাক হোল' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সমস্যা হচ্ছে এখানে প্রকল্প উদ্যোক্তারাই হিসাব নিরীক্ষকদের নিয়োগ দেন।" মিগুয়েস বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থার ওপরেও গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "মাইক্রোসফটের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষকদের নিরীক্ষণ যদি ভালো না হয়, তাহলে সেখানে শেয়ারহোল্ডাররা অভিযোগ জানাতে পারেন। কিন্তু সিডিএম পন্থায় অভিযোগ জানানোর জন্য শেয়ারহোল্ডার নেই। বাইরে থেকে কোনো স্বতন্ত্র কাঠামো জবাবদিহির দিকটি দেখাশোনা করার জন্যও এখানে নেই।"

মিগুয়েস জানান, এই পুরো পন্থার মধ্যে সংস্কার আনার জন্য জাতিসংঘের ভেতরে-বাইরে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। সেখানে যাচাইকারী নির্বাচন ও নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী বোর্ডকে ক্ষমতা ও অর্থায়ন করার দিকটাই ছিল অন্যতম। এই প্রস্তাবনায় বলা হয়, প্রকল্প উদ্যোক্তারা জাতিসংঘকে একটি নির্দিষ্ট ফি দেবে, যা দিয়ে জাতিসংঘ একটি সাধারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রকল্পের জন্য যাচাইকারী নিয়োগ করবে। যদিও এই প্রস্তাব নির্বাহী বোর্ডে মিগুয়েসের সহকর্মীরা বারবার প্রত্যাখ্যান করেন। সেখানে কোনো নতুন আইন বাস্তবায়ন করতে আট ভোটের প্রয়োজন হয়। মাত্র তিনটি বিরুদ্ধ ভোটই যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। কোনো পরিবর্তন আনার বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল যাচাইকারীরাই। মিগুয়েস জানান, তারা বোর্ডের সদস্যদের কাছে পরিবর্তন ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত দেনদরবার চালায়। তিনি বলেন, "যাচাইকারীরা তাদের পারিশ্রমিকের বিষয়ে সরাসরি প্রকল্প উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দর-কষাকষি করার ক্ষমতা দাবি করে। জাতিসংঘ যদি মাঝখানে তাদের একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বেঁধে দেয়, তাহলে তারা দর-কষাকষির এই সুযোগ হারাবে।"

কিন্তু এই সংস্কার প্রক্রিয়া স্বার্থের দ্বন্দ্ব দূর করতে কাজ করলেও যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের লুকোনো ফাঁক নির্ণয়ে ভূমিকা পালন করবে না। বর্তমানে যে পরিদর্শনের কার্যক্রম বজায় আছে, তার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেসব দূরবর্তী অফিস রয়েছে, সেখানে মাঠ পর্যায়ের শত শত কর্মীর কাজের সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গীকার জড়িত রয়েছে। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র যদি 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' পদ্ধতিকে আইনসিদ্ধ করে দেয়, তাহলে অফসেট প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তা আকাশচুম্বী হবে। সেখানকার আইন বিভাগে অফসেটের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হয়েছে, তা বর্তমানে ইউরোপে ক্রয়-বিক্রয় হওয়া অফসেটের তুলনায় বেশ সম্প্রসারিত, কিন্তু জটিল। নিবিড় চাষাবাদের ক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের সম্ভাবনা, বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং কার্বনের অন্যান্য সম্ভাব্য শ্রেণি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রেই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ এবং এগুলো বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ।

প্রকৃতপক্ষে কার্বনকে একটি পণ্যে পরিণত করার ধারণাটা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যারও সূচনা হয়। এক টন কার্বন ক্রেডিটকে এক আউন্স স্বর্ণ অথবা এক টন শূকরের মাংসের মতো পুনরুৎপাদন করা সম্ভব নয়। প্রতিটি ক্রেডিট ভিন্ন ভিন্ন উপাদান এবং অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউক্যালিপটাস গাছ, শূকর পালনের খামার থেকে মিথেন গ্যাস অথবা কয়লার পরিবর্তে বায়ু-শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। প্রতিটি দৃষ্টান্তের মাঝেই যেমন স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনিশ্চিত বিশ্বস্ততার প্রসঙ্গও। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে কারা সেগুলো ভঙ্গ করছে এবং কারা ভঙ্গ করছে না, সে বিষয়টিও সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়নি। কাগজে কলমে 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয় হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রয়োগ কাঠামোর প্রয়োজন হয়। তবে কার্বন ট্যাক্স প্রতিস্থাপন করার জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে এই কাঠামো অপেক্ষাকৃত কম কঠিন।

আমি আবার মিগুয়েসের সঙ্গে দেখা করতে কোপেনহেগেন যাই। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সম্মেলন চলছিল। সম্মেলনস্থলে বসে থাকা প্রতিনিধিদের মুখগুলো বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। সেখানে নিঃসরণের মাত্রা, অফসেট কাঠামো, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, উন্নয়নশীল দেশের ভূমিকা নিয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তার আগের সপ্তাহে নির্বাহী বোর্ড 'এসজিএস'-এর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিসূত্রে জানা যায়, হিসাব নিরীক্ষকদের মান বিষয়ে কড়াকড়ি নিয়ে কোম্পানি ও অন্য 'ডিওই'দের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় বোর্ড। তাদের আরেকটি সিদ্ধান্ত বাজারে আবারও চাঞ্চল্য তৈরি করে। চীনের ১০টি উইন্ডমিল প্রকল্পের ক্রেডিট যাচাই হওয়ার পরেও স্থগিত করা হতে পারে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রশ্নে।

নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকার পরেও অফসেট ব্যবস্থা একটি নতুন ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 'কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড সিকুয়েস্ট্রেশন' প্রযুক্তি কৌশলকে পরীক্ষা করে দেখার বিষয়ে নির্বাহী বোর্ড উপসাগরীয় দেশসমূহ, রাশিয়া ও নরওয়ের একটি প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়। এই প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ ভূমি অথবা সমুদ্রের তলদেশে সরিয়ে দূষণকারী কারখানাগুলোর জন্য সহজপ্রাপ্য অফসেটের উৎস গড়ে তোলা যায় এমন একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ব্রাজিল। রিও ডি জেনিরোতে মিগুয়েস আমাকে বলেন, "কার্বন ক্যাপচার প্রকল্পের মাধ্যমে সস্তা কার্বন ক্রেডিট তৈরি করে শুধু বাজার নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কাজ হবে না। এ ধরনের ক্রেডিট ব্রাজিলের অফসেট প্রকল্পগুলোকে অবমূল্যায়িত করবে। অফসেট নিয়ে যুদ্ধে কোত্থেকে আসছে, সে প্রশ্নের পাশাপাশি কোন পন্থায় নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। " প্রস্তাবটি আবার কোপেনহেগেনে তোলা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া উত্তরে বলেন, "প্রত্যেকেরই আলাদা স্বার্থ আর আগ্রহ আছে।"

সম্মেলন চলাকালে এক রোববার আলোচনাকারীরা বিরতি নিতে চাইলে আমি 'গ্রিন বিজনেস' নামে একটি প্রদর্শনী দেখতে চলে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ কার্বন-অর্থনীতির অবয়ব কেমন হতে পারে তা দেখা। সেখানে বায়ু-শক্তি উৎপাদক, বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদক এবং ইথানলনির্ভর প্লাস্টিক তৈরির স্টল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের প্রযোজনায় 'গ্রিন আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি' বিষয়ক চমৎকার আয়োজনও চোখে পড়ে। একটি স্টলে চোখে পড়ে আবুধাবি সরকারের ব্যবস্থাপনায় 'কার্বন নিউট্রাল সিটি' বা কার্বন নিরপেক্ষ শহর প্রকল্পের প্রদর্শনী। তারা এই প্রকল্প একটি মরুভূমিতে তৈরি করছে এবং এই প্রকল্পের জন্য তারা সিডিএম অর্থায়নের আশা করছে। সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয় ডিএনভি-এর 'ক্লাইমেট স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড মার্কেট' বিভাগের পরিচালক মার্ক ট্রেকসলারের সঙ্গে। ট্রেকসলার প্রায় ২০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাজ করে আসছেন এবং সম্প্রতি ইকো সিকিউরিটিজে একজন নির্বাহী হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

সেখানে যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনাকালে ট্রেকসলার বলেন, "আমাদের যাচাইকারীদের সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই। আমরা কেবল জাতিসংঘের বিধিগুলো প্রয়োগ করি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে দুটি বিষয়ের সঙ্গে। একটি হচ্ছে, পদ্ধতির অগ্রাধিকার উদ্ভাবন এবং অন্যটি হলো সঠিকতার পরিবর্তে পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।" তিনি উদাহরণ হিসেবে বাড়িতে বসে গর্ভাবস্থা পরীক্ষার মতো পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। তার মতে, অফসেট পরিমাপের জন্য এ ধরনের পদ্ধতি ভালো অথবা মন্দ– দুই ধরনের সংবাদ দিতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে ভুল যাচাইয়ের সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। কেউ যদি বিভ্রান্তিকর বা ভুল ইতিবাচক ফলের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি সাজায়, তবে সেখানে ভুল নেতিবাচক ফলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, "জাতিসংঘ যদি শুধু এমন প্রকল্পকে প্রাধান্য দেয়, যেগুলোর 'অ্যাডিশনালিটি' আছে, তাহলে ভুল নেতিবাচক ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিছু বৈধ প্রকল্প তখন বিবেচনার বাইরে চলে যাবে।"

নিঃসরণ নিয়ে এই বাণিজ্যে কার্বন প্রকল্প উদ্যোক্তা, উন্নয়নশীল বিশ্বের বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা এবং সরকারগুলোর বেশিসংখ্যক প্রকল্প যাচাই করার ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থ রয়েছে। ট্রেকসলার বলেন, "ভুল নেতিবাচক বা ইতিবাচক পরিমাপের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার সিদ্ধান্তটি আসলে যতটা না প্রযুক্তিগত, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক।"

কার্বন এখনকার পৃথিবীতে একটি পণ্য। আর এই কার্বন পণ্যে পরিণত হয়েছে রাজনীতিক ও আমলাদের সিদ্ধান্তে। তারাই অফসেটের মানদণ্ড নির্ণয় করার জন্য নিঃসরণের মাত্রা ও সরবরাহ স্থির করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই কিয়োটো সম্মেলনের সময় 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' ব্যবস্থাপনার কাঠামো তৈরি করে এবং পরে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য বাকি বিশ্বের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চুক্তি থেকে সরে আসে। তারপর থেকেই পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত স্বার্থ এই চিন্তার পেছনে নিজেদের শ্রেণিবদ্ধ করে ফেলে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক বিরূপতার মুখে এই পদ্ধতি তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে সক্ষম। এখন ওবামা প্রশাসন, ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানি উপলব্ধি করতে পারছে যে, তাদের জন্য এখন সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড'। তারা এখন এই আশায় ভর করে আবার এই ধারায় ফিরে এসে বাজারকে আরও গতিশীল করে তুলতে চায়। এই বাজার একটি লুকোচুরি খেলার জায়গা। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর দেশে দেশে সরকারগুলোর তাৎক্ষণিক স্বার্থ হাসিলের জন্য উৎকৃষ্ট পথ। কিন্তু শেষে এসে তা আমাদের পরিবেশের সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ।

পরিশিষ্ট

মার্ক শাপিরো

জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবিলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানান উদ্যোগের বিষয়ে আমি নজর রাখছিলাম আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা ১৫০ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের একটি বাজার। এই তথ্য আমাকে চমকে দেয়। প্রথমে ভেবেছিলাম বানান বিভ্রাট; মিলিয়ন লিখতে গিয়ে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে। কিন্তু পরে দেখলাম, কোনো বানান বিভ্রাট নয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে এই বিশাল বাজার তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু মানুষ সেই বাজার এবং তা কীভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত। অনুসন্ধানের জন্য এই জায়গা খুবই আকর্ষণীয় বলে আমার মনে হয়।

আমি কার্বন বাজারের নতুন ধারণা বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট পড়তে শুরু করি। কোনো একটি বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করার আগে বিষয়টি সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা পাঠ করা খুবই প্রয়োজন। এতে ওই নতুন ক্ষেত্রটিতে প্রচলিত ভাষা এবং ধারণা আপনার পরিচিতি গড়ে উঠবে। আমি বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক জার্নাল, বিশেষজ্ঞদের লেখা এবং পত্রপত্রিকায় (ইউরোপ থেকে) প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে শুরু করি। আর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আমি মূল প্রশ্নটির প্রাথমিক কাঠামোটি দেখতে পাই। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই বাজার এমন যদি এমন একটি অস্তিত্বহীন একটি পণ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সেখানে এর পরিমাপ করছে কে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার কাছে এই প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও অন্যরা কেউ তা উত্থাপন করছে না।

এই উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়া এবং কার্বন পরিমাপের সত্যতা জানার ভাবনাই আমাকে পৌঁছে দেয় হিসাব নিরীক্ষক এবং যাচাইকারীদের একটি ছোট্ট গ্রুপের কাছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচার পণ্য কার্বনের পরিমাপ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমালোচনামূলক। এই জায়গা থেকে আমার অনুসন্ধানে আরেকটি নতুন প্রশ্ন যুক্ত হয়; যে নিঃসরণ হ্রাসের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তা সঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছে কি না। একটি কার্বন প্রকল্পকে অফসেটে পরিণত করে বিক্রির প্রক্রিয়াটাকে ভালোভাবে অনুধাবন ও মনের মধ্যে পুনর্গঠন করার জন্য আমি জাতিসংঘের বহু মূল্যায়নপত্র, বিশেষজ্ঞদের লেখা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন, ব্রিটেন, ফরাসি এবং জার্মান সরকার ও বিভিন্ন এনজিও সংস্থার মূল্যায়ন সংগ্রহ করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য স্বাধীনতা আইন থাকার পরেও তারা এ ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় সেখান থেকে কোনো তথ্য পাইনি।

তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একটা পর্যায় পর্যন্ত স্বচ্ছতা আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদিও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপির ওয়েবসাইট থেকে আপনি কার্বন অফসেট প্রকল্পের প্রস্তাবনার কপি, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাতিল হওয়ার নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এসব নথিপত্রের ভাষা খুবই জটিল এবং প্রায়োগিক কৌশলগত। এর অর্থ অনুধাবন করতে আমাকে অনেক সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে এবং পড়তে হয়েছে। ‘সিডিএম ওয়াচ’ নামে একটি এনজিও সংস্থা রয়েছে, যারা এ ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজে সহায়তা দেয়। তথ্যের অধিকার বিষয়ে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে যে আইন আছে, তা আপনার কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি আপনি জানেন ঠিক কী খুঁজছেন। এ ক্ষেত্রে ইইউর ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে *www.wobbing.eu*।

নথিপত্র পড়ার সময়ই সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলি। সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি প্রাধান্য দিই তাদের, যারা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি করেছেন অথবা যাদের কথা স্টোরিতে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি তাদের নাম এবং তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, তার একটি তালিকার মতো তৈরি করি।

এ ধরনের স্টোরির সবচেয়ে কঠিন দিক হচ্ছে বর্ণনা লেখা, যা পুরো স্টোরিটিকে সমন্বয় করবে। এই স্টোরি লেখার পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্যই ছিল কার্বন বিনিয়োগ এবং অফসেটের বিমূর্ত পৃথিবীকে বাস্তব করে তোলা। সাধারণ মানুষ যে বিষয়টাকে ভীষণ জটিল বলে ভাবে, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্বার্থের জায়গাগুলোকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। যে স্টোরি একটি ব্যবস্থাকে অনুসন্ধান করছে, সেখানে চরিত্র ও প্রকৃত বিন্যাস খুঁজে বের করাটা আসল চ্যালেঞ্জ।

আমার একেবারে প্রাথমিক ভাবনা ছিল লন্ডনের কার্বন কেনাবেচা হয় এমন একটি ডেস্কে লেনদেন করা একটি কার্বন অফসেট প্রকল্প অনুসরণ করা, যা তার মূল উৎস উন্নয়নশীল দেশে ফেরত গেছে। কিন্তু সেই অনুসরণের কাজটা করা সম্ভব হয়নি। ফলে আমাকে কাজের কৌশল বদলাতে হয়। আমি ব্রাজিলে কিছু যাচাইকারী এবং সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার থেকে একটি প্রকল্পের কার্বন বাজার পর্যন্ত ভ্রমণের সাধারণ পথটা তুলে ধরার চেষ্টা করি।

আমি যখন এ ধরনের একটি স্টোরি নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন খুব কম সাংবাদিক বিষয়টির সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। এই ব্যবস্থার একেবারে মূল দিকগুলো ব্যাখ্যা করা এবং ভেতরকার চোরা দরজাগুলো চিহ্নিত করার জন্য তখন কিছু মানুষ কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ, তার আগে সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হননি। যেকোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার সব সময়ই বাড়তি সুবিধা আছে। তবে নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করার অসুবিধাও কম নয়। কারণ, তখন মূল বিষয়গুলো আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয়। যেমন এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগেরই সাধারণ একটি প্রশ্ন হচ্ছে, অফসেট কী?

কার্বন প্রকল্প উদ্যোক্তাদের যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়, আমি সেখানে যাওয়ার জন্য বিশেষ সাংবাদিক পরিচয়পত্র জোগাড় করি। এ ধরনের মেলায় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মানুষ সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারে। আমিও এ ধরনের মেলায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার সুযোগ পাই। এ ধরনের কথাবার্তা প্রাপ্তির দিক থেকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও জানার ব্যাপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক পরে তথ্য উদ্‌ঘাটনের পথ খুলে দেয়।

যার সাক্ষাৎকার আপনি নেবেন, তিনি আপনার স্টোরির পুরো ব্যাপ্তি জানবেন না। পরে এই স্টোরির মতো জটিল একটি স্টোরিতে আপনাকেই বিভিন্ন ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি সাক্ষাৎকার, প্রতিটি নথির পৃষ্ঠা একটি বড় ধাঁধার অংশ। এগুলোই একসঙ্গে একটি বিষয়কে উদ্‌ঘাটন করে এবং আপনার স্টোরিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আমি সব সময়ই এমন একজন ব্যক্তিকে চাই, যিনি আমার স্টোরির সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাটুকু বুঝতে পারবেন। যিনি আমার স্টোরির পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন আমি যা উদ্‌ঘাটন করেছি, তা আমি বুঝতে পেরেছি কি না। আপনি যত স্টোরির গভীরে প্রবেশ করবেন, এই পদ্ধতি পুরো স্টোরি পর্যালোচনা করতে সাহায্য করবে। এ ধরনের মানুষদের আমি দিকনির্দেশনাকারী হিসেবে বিবেচনা করি। যখন স্টোরি করতে গিয়ে তথ্য নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়, কিছু কিছু প্রযুক্তিগত তথ্যের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে যায়, তখন এ ধরনের একজন মানুষ আপনার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে। স্টোরির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে আপনার অনুমান সঠিক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আপনি নতুন তথ্য হাতে পাওয়ার পরও আপনার আগের অনুমান যৌক্তিক অবস্থানে রয়েছে কি না, সেটাও দেখা উচিত। তখন একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনার পদক্ষেপগুলো স্পষ্ট করার পেছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে, আপনি তাকে বিশ্বাস করলেও এই কাজের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত না হওয়ায় স্টোরি সম্পর্কে তার উপলব্ধি ভিন্ন পথে চলতে পারে।

স্টোরি করার ক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো ছিল আমার মূল কৌশল

পড়া: যে বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করছেন, সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভাষা ও ধারণা সম্পর্কে বুঝতে হলে সব নথিপত্র ও লেখা আপনাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। কার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, তা-ও আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে।

সাক্ষাৎকার: যার বা যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে, বিষয়টির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা কত দূর, তা ভালোভাবে অবগত হতে হবে। তাদের লেখা বা অতীতে দেওয়া কোনো বক্তব্য থেকে প্রয়োজনে উদ্ধৃত করুন, যাতে তারা বুঝতে পারেন, আপনি বিষয়টি কতটা গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করছেন।

ভাবুন: আপনি যা নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, সে বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম তৈরি করুন। আপনার অনুমানকে একটি প্রশ্নের মধ্যে নিয়ে এসে নিজেই তার উত্তর দিতে পারছেন কি না দেখুন। আপনি যে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, তার বিস্তৃত তাৎপর্য আপনার স্টোরি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে কি না, সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

এগিয়ে নিন: আপনার এমন একজন পথনির্দেশকারী প্রয়োজন, যিনি জ্ঞানী এবং বিশ্বাসী। তিনি আপনার স্টোরি পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করে বলে দিতে পারবেন, আপনি সঠিক পথে এগোচ্ছেন কি না।

আমি প্রথমেই আমার স্টোরিতে যে বিষয়গুলো অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছি, সেগুলো সাজিয়ে নিয়েছি এবং প্রতিটির জন্য একটি করে আলাদা ফাইল তৈরি করেছি। সেখানে জরুরি নথিপত্র, প্রতিবেদন, প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের ক্লিপিং, সাক্ষাৎকার অথবা সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ রেখে দিয়েছি, যাতে পরে স্টোরি লেখার সময় হাতের কাছে সবকিছু পাওয়া যায়।

সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ করার পর আসে স্টোরি লেখার পর্ব। সব তথ্য স্টোরিতে প্রকাশ করার বিষয়টা নির্ভর করে লেখার গতি, ঢং এবং ছন্দের ওপর। লেখার মধ্যে একটি ছন্দ তৈরি করা খুব কার্যকর পদ্ধতি। আপনি লেখার মধ্যে একটি ছন্দ তৈরি করতে সক্ষম হলে পাঠকের জানা হয়ে যায়, একটি জটিল এবং স্নায়ুচাপে ভোগার মতো তথ্য উপস্থাপনের পর লেখার মধ্যে পরিচ্ছেদ ব্যবহারের মাধ্যমে খানিক বিরতি আসবে অথবা লেখার ভঙ্গি পাল্টে যাবে। তারা লেখার ছন্দ অনুসরণ করে স্টোরিতে কখন আরেকটি নতুন বক্তব্য বা ছবি চলে আসছে, তা-ও বুঝতে পারে। পাঠককে দীর্ঘ বর্ণনার জাল থেকে মুক্তি দিতে কখনো স্টোরিতে সামগ্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যবহার করতে হয়। তারপর আবার আপনি বর্ণনামূলক লেখায় চলে যেতে পারেন।

তবে মনে রাখতে হবে, এ ধরনের লেখার একেবারে শুরুতে একটি স্থানের বিবরণ দিয়ে অথবা অনুসন্ধানের বিষয়ের বিবরণ দিলে পাঠক সংকেত পেয়ে যায় এবং তারা আপনার ভ্রমণসঙ্গী হয়ে ওঠেন। একটি দীর্ঘ স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে লেখাটা রাতে অসমাপ্ত রেখে দেওয়াই ভালো। কারণ, পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে লেখার টেবিলে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু করার চেয়ে গত রাতের অসমাপ্ত অংশ শেষ করাই আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে।

এই স্টোরির ক্ষেত্রে হারপার ম্যাগাজিন ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিল। 'সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং'-এর পক্ষ থেকেও ওয়েব সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আর তার ফলাফল হিসেবে আমাকে অনেকগুলো রেডিও থেকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। অন্যান্য প্রকাশনায় লেখার উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়। মার্কিন কংগ্রেসে এই স্টোরি প্রচারিত হয়। সেই সময়ে কংগ্রেসে 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছিল। আমার স্টোরির প্রচারণায় আমি আনন্দিত হয়েছি। কারণ, সরকারের এমন সব স্তরের ব্যক্তিরা স্টোরিটি উদ্ধৃত করেছেন, যারা সত্যি সত্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিঃসরণে হ্রাসের জন্য শক্ত আইন প্রণয়ন চান অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য। তবে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে মূল্য দেন বেশি, তারাই আমার অনুসন্ধানের ফলাফলকে খাটো করতে চেয়েছেন নানাভাবে। একবার একটি টক শোর রক্ষণশীল উপস্থাপক আমাকে বলেন যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টা গোল্ডম্যান স্যাকস উদ্ভাবন করেছেন। আমি সেখানেই আমার ভিন্নমত প্রকাশ করি।

স্টোরিটি ইন্টারনেটেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও তা অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি বেশ কিছু অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পাই এবং বই লেখার অনুরোধ আসে প্রকাশকদের কাছ থেকে। কার্বন বাজারে সক্রিয় অনেকের কাছে আমি শুনেছি, স্টোরিটি 'ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, যা দীর্ঘ সময় ধরে স্বল্পায়তন পৃথিবীর কিছু বাসিন্দার জানা ছিল অথবা তারা অনুমান করতেন।

৪

চতুর্থ অধ্যায়

দায়িত্বে কে?
সুশাসনের সংকট অনুসন্ধান

১.
ফিলিপাইনের লোপাট হওয়া স্বাস্থ্য

আবিগেইল এম. ওলার্তে
এবং ইভোন টি. চুয়া

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর ওপর ব্যয় সংকোচন এবং লোকবল কমানোর একধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় আগে যে খাতগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পরিচালিত হতো, সেগুলোর দায়িত্ব চলে গেছে স্থানীয় পর্যায়ের হাতে। এখন প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাক্ষ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ায় বহু সরকারি সেবার তদারকি কঠিন হয়ে পড়েছে। ফিলিপাইন সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (www.pcij.org) ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রকাশ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তাদের প্রকাশিত এই ধারাবাহিক স্টোরিতে আমরা বিশদভাবে জানতে পারি, দুর্নীতি কীভাবে সংঘটিত হয় এবং তা কতটা নোংরা হতে পারে। এই দুটো স্টোরিতে আবিগেইল এম. ওলার্তে ও ইভোন টি. চুয়া নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তারা নিজেদের জীবন-জীবিকাও বিপন্ন করেছেন। জনগণ অনুসন্ধানী স্টোরির ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন তা হচ্ছে, তারা যা জানেন তা ভুল জানেন। আর একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক প্রথমত ও প্রধানত এই বিষয়ের ওপরেই নির্ভর করেন। জনগণের কাছ থেকে এই প্রত্যাখ্যানই তার কাছে হয়ে উঠতে পারে তথ্যের উৎস। আর সেই তথ্য ব্যবহার করে তিনি সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্রের সন্ধান পেতে পারেন, যা অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ধরনের নথির খোঁজ পাওয়ার জন্য প্রথম শর্তটি হলো, আপনাকে জানতে হবে কী খুঁজছেন। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাকে দেখতে হবে, সাধারণ প্রক্রিয়ায় একটি কাজ কীভাবে সম্পন্ন হয়। তারপর মিলিয়ে দেখতে হবে, সেই প্রক্রিয়ার বিপরীতে এখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এ ধরনের কাজে ওলার্তে ও চুয়া খুবই দক্ষ।

২০০৫ সালের ২৪ মে স্টোরিটি প্রথম প্রকাশিত হয়
ফিলিপাইন সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়।

প্রথম অংশ

স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা তহবিলের ৭০ ভাগই দুর্নীতির চক্রে উধাও

আবিগেইল এম. ওলার্তে

এক তরুণী মা তীব্র জ্বরে পুড়তে থাকা তার সাত মাস বয়সী সন্তানের শরীরটা আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে। তার সন্তান শ্বাস নিতে পারছিল না। শিশুটি শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহে ভুগছিল। সাধারণত এ ধরনের অসুখে ভেন্টোলিন বা স্যালবিউটামল দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক কোনো ওষুধ দিতে পারছিলেন না। তার কাছে কোনো ওষুধই ছিল না।

বুলাকানের একটি দরিদ্র পৌরসভা এলাকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত সেই চিকিৎসকের হাত কচলানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এ ঘটনার পর সেই শিশুর মায়ের দুই সপ্তাহ সময় লেগেছিল সন্তানের ওষুধ কেনার জন্য ৫০ পি (ফিলিপাইনি পেসো) জোগাড় করতে। শেষ পর্যন্ত শিশুটির জীবন বাঁচলেও জ্বর ও কাশিতে তাকে অনেক দিন ভুগতে হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে সেই চিকিৎসককে ৯ থেকে ১০০ জন রোগী দেখতে হয়। তাদের জন্য স্থানীয় সরকার যে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে, তা এতই সামান্য যে প্রতিবারই ফুরিয়ে যায়। চিকিৎসক জানান, ওষুধস্বল্পতার পাশাপাশি আরেকটি খারাপ খবর হচ্ছে ওষুধের অকারণ মূল্যবৃদ্ধি। কখনো কখনো প্রায় শতভাগ দাম বাড়ানো হয় এবং তাতে পকেট ভর্তি হয় একশ্রেণির স্থানীয় কর্মকর্তার।

১৯৯৩ সালে যখন সরকারের 'ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ' (ডিওএইচ) থেকে স্থানীয় সরকারের অধীনে বিকেন্দ্রীকরণ করে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন স্থানীয় কর্মকর্তারা স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাজেট ব্যয় করার ক্ষেত্রে প্রচুর স্বাধীনতা পেয়ে যান। কিন্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা খাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপচয়, দুর্নীতি এবং পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি। ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতির একটা আনুমানিক পরিমাপ পেতে যেসব চিকিৎসক, সরবরাহকারী এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, তাদের হিসাবে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর' (এসওপি), বিভিন্ন ধরনের ছাড়, অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত আর 'ভালোবাসার উপহারের' নামে মেয়র, গভর্নর এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের যে ঘুষ দেওয়া হয়, তা ঠিকাদারি চুক্তির অর্থের ১০ থেকে ৭০ শতাংশ।

এই অবস্থার ফলাফল হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র মানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। অথচ স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্থানীয় সরকারের অর্থায়নে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোই এই অসহায় মানুষদের ভরসাস্থল।

ডিওএইচ কর্মকর্তা হুয়ান এ. পেরেজ বলেন, "বিকেন্দ্রীকরণের আগে দুর্নীতির কেন্দ্রস্থল ছিল ম্যানিলা। তার মতে, সহায়তা-সম্পদ স্থানীয় সরকারের কাছে স্থানান্তরের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় সরাসরি সহায়তা পাওয়ার কথা, অথচ সেখানে সেবার পরিবর্তে কিছুদিনের মধ্যে গজিয়ে উঠতে শুরু করে দুর্নীতি। "প্রকৃতপক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ দুর্নীতির গণতন্ত্রায়ণ ঘটিয়েছে বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা।

আমেরিকাভিত্তিক সংগঠন 'সেন্টার ফর ইনস্টিটিউশনাল রিফর্ম অ্যান্ড দ্য ইনফরমাল সেক্টর' (আইআরআইএস)-এর ২০০০ সালে করা একটি প্রতিবেদনে ফিলিপাইনে এই বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে বলা হয়েছে, ইচ্ছেমতো কাজ করার স্বাধীনতা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি করেছে। এ প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, "যখনই কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন, তখনই ঘুষ দাবি করার আরও সুযোগ তাদের হাতে এলো।"

এই বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ওষুধ কেনাকাটার ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমিয়ে আনা। ওষুধ কেনায় দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে কাগজপত্রে ওষুধের বেশি দাম দেখানো, কারচুপিমূলক দরপত্র দাখিল, ভুয়া সরবরাহ এবং নিম্নমানের ওষুধ ক্রয়।

এই সমস্যায় জর্জরিত ১৬০০ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরাও হতাশ হয়ে পড়েন। প্রায় সময়ই এই চিকিৎসকদের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে যেতে দেখা যায়, যে কর্মকর্তারা মূল্যবান সহায়তা-সম্পদকে দুর্নীতি আর তোষণে অপচয় করছেন। কালাবারজোন অঞ্চলের একজন পৌরসভা কর্মকর্তা জানান, বহু চিকিৎসক এসব কারণে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ শুরু থেকেই সমস্যার মধ্যে পড়ে। স্থানীয় সরকার এই বিকেন্দ্রীকরণের জন্য খুব একটা প্রস্তুত ছিল না। ফলে ৭০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা দিতে গিয়ে তারা সংকটে পড়ে। পাশাপাশি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলো পরিচালনা করাও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এই সমস্যার সমাধান না হলেও জাতীয় সরকারি এবং বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখে।

এই বিষয়গুলো দরিদ্র মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাকে বিপন্ন করে তুলেছে। ২০০৩ সালে ফিলিপাইনে জাতীয় জনমিতি এবং স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ বেসরকারি ক্লিনিক বা হাসপাতালের চেয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার দ্বারস্থ হয়। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত বারাঙ্গে (গ্রাম) স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই রোগীর সংখ্যা বেশি। ২০০১ সালে বিশ্বব্যাংকের 'সোশ্যাল ওয়েদার স্টেশন' পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৩০ ভাগ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী তাদের নানান অসুখের চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেই উপস্থিত হয়। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো তাদের ওষুধেরও প্রধান উৎস।

তারপরও বহু স্থানীয় কর্মকর্তা স্বাস্থ্যসেবা খাতকে তাদের অবৈধ আয়ের উৎস হিসেবে দেখেন। তারা ওষুধ এবং হাসপাতালের চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ভাগও দাবি করেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহনের জন্য ২০০৩ সালে এক বিলিয়ন পেসো বরাদ্দ করা হয়। সেখানে সর্বনিম্ন ১০০ মিলিয়ন পেসো থেকে সর্বোচ্চ ৭০০ মিলিয়ন লোপাট হয়েছে শুধু ঘুষ-বাণিজ্যেই। ওষুধ সরবরাহকারীদের অভিযোগ, ওষুধ কেনার পেছনে তাদের খরচের ১০ থেকে ৭০ শতাংশ কমিশন দিতে হয়েছে। তুলনা করলে দেখা যাবে কমিশনের অর্থ দিয়ে সাধারণ জ্বরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ৫০০ মিলিয়ন পিস ৫০০ এমজি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কেনা সম্ভব হতো। তাতে প্রত্যেক স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ৬২ হাজার পিস ট্যাবলেট পেত।

কেইজন নগর সরকার ওষুধ ক্রয় বাবদ যে মূল্য পরিশোধ করেছে, তার সঙ্গে ন্যাশনাল অডিট কমিশনের বেঁধে দেওয়া ওষুধের ক্রয়মূল্যের মাপকাঠির তুলনা করলে দেখা যাবে, আইনত ক্রয়মূল্যের যে নির্দেশনা দেওয়া আছে, তার সঙ্গে বাস্তব ক্রয়মূল্যের মিল নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো অননুমোদিত বলে চিহ্নিত হয়েছে।

বর্তমানে বেশির ভাগ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের জন্য হয় সামান্য পরিমাণ ওষুধ আছে অথবা একেবারেই নেই। সরবরাহকারীরা যে পরিমাণ ওষুধ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন, তার অর্ধেকও সরবরাহ করা হয় না। পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধও নিম্নমানের হয়ে থাকে। কখনো অর্ধেক পথেই এসব ওষুধ কর্মকর্তারা বাজেয়াপ্ত করে। কখনো চুক্তির চাইতে ওষুধের পরিমাণ কম হয় অথবা নিম্নমানের উপাদান দিয়ে ওষুধগুলো তৈরি করা হয়, যাতে কমিশন খাতে দেওয়া অর্থের অঙ্ক পুষিয়ে নেওয়া যায়। আবার কখনো ওষুধ সরবরাহই করা হয় না।

লাগুনা পৌরসভার একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তিনি একবার ব্যবস্থাপত্রে কয়েকটি ওষুধের নাম লিখে দিলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী তাকে জানান, ওষুধ নেই। কিন্তু তিনি জানতেন, মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ওষুধের সরবরাহ এসেছে। ওষুধের খোঁজে তিনি কেন্দ্রের ওষুধ ভাঁড়ারে গিয়ে দেখেন, পুরো আলমারি ফাঁকা। সেখানে কোনো ওষুধ নেই। তিনি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে সরবরাহকারী প্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের আরেকজন চিকিৎসক আরেকটি ঘটনার জানান। একবার তিনি ইউনিটের জন্য প্রতি দুই মাস পর ১০ বাক্স করে ওষুধ আনাতেন। কিন্তু একবার দেখা গেল, ১০ বাক্সের জায়গায় মাত্র চার বাক্স ওষুধ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার জন্য। তাকে যখন রসিদে স্বাক্ষর করতে বলা হলো, তিনি দেখলেন, আগে লিখে দেওয়া ওষুধের মূল্য পরিবর্তন করে প্রতিটি ওষুধে দুই গুণ বেশি দাম ধরা হয়েছে। আর সেই রসিদটি আলাদা কাগজে টাইপরাইটারে লেখা। এরপর থেকে সেই চিকিৎসক ওষুধের মূল্যের ঘরে কিছুই লিখতেন না। কারণ, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তা পাল্টে যাবে।

'কমিশন অন অডিট' (সিওএ)-এর হাইদি মেন্দোজা বলেন, "সরবরাহকৃত ওষুধের বাড়তি দাম ধরা জালিয়াতির প্রচলিত একটি কৌশল। একবার এক মেয়র এক হিসাবরক্ষককে বলেছিলেন, ওষুধের দামের হেরফের যদি ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে ওষুধের দাম বাড়িয়ে ধরা হয়নি। সিওএর নথিপত্র দেখলে দেখা যাবে, ওষুধের বাড়তি মূল্য কোথাও ৭০০ শতাংশও নির্ধারণ করা হয়েছে।"

একজন ওষুধ সরবরাহকারী আমার কাছে স্বীকার করেন যে তিনি উত্তর লুজন প্রদেশের একটি স্থানীয় সরকারের কাছে অ্যামক্সিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করেছেন। প্রতি বাক্সে ১০০টি ট্যবলেট থাকে। প্রতিটি বাক্সের প্রকৃত মূল্য

২৮০ পেসো হলেও তিনি তা বিক্রি করেছেন ৩৮০ পেসো মূল্যে। প্রতি বাক্সে তিনি বাড়তি নিয়েছেন ১০০ পেসো। কাইনতা শহরের রিজিওনাল হেলথ অফিস (আরএইচও) বাড়তি দামে ওষুধ ক্রয় করেছে। তারা ৭৬৯ শতাংশ বেশি মূল্যে এই ওষুধ কিনেছে।

ওই ওষুধ সরবরাহকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, সরবরাহের চুক্তির ৩০ শতাংশ চলে যায় ঘুষে। ওষুধের প্রতি বাক্সে তাকে গুনতে হয় ২৫৬ পেসো। যে মূল্যে সরবরাহ চুক্তি করা হয়, তার ৫০ শতাংশ দিয়ে দিতে হয় 'ভালোবাসার উপহার' হিসেবে। অন্যান্য সরবরাহকারী এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, চুক্তির ৩০ শতাংশ যায় মেয়রের কাছে। ১৫ শতাংশ দিতে হয় হিসাবরক্ষক, বাজেট কর্মকর্তা এবং চুক্তি অনুমোদনকারীকে। এর মধ্যে কখনো ৫ শতাংশ চলে যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের কাছেও।

প্রজাতন্ত্র আইন, ৯১৮৪ অথবা সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী যেকোনো ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে সর্বনিম্ন মূল্যে ভালো মানের সামগ্রী কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি মফস্বল অথবা বড় শহরে মেয়র, হিসাবরক্ষক, বাজেট কর্মকর্তা, একজন সাধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানের সমন্বয়ে একটি নীতি নির্ধারক কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। এই কমিটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেন্টার এবং চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের বিষয়টিও দেখাশোনা করে থাকে।

কিন্তু মেন্দেজ বলেন, "ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা এবং দরদাতারা সব সময় সাধারণ দরপত্র দাখিলের বিষয়টা সুকৌশলে এড়িয়ে যান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরপত্র যাচাই হওয়ার আগেই বিজয়ী দরদাতা নির্ধারণও হয়ে যায়।"

সরবরাহকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী, ওই নীতি নির্ধারক কমিটির সদস্যরাই চুক্তিপত্র নিজেদের থলেতে ভরে ফেলার মূল কারিগর। সেই অ্যামক্সিসিলিন সরবরাহকারীর ভাষ্য হচ্ছে, চুক্তিপত্র তখনই অনুমোদন পায় যখন ভাগ-বাঁটোয়ারা চূড়ান্ত হয়। সরবরাহকারী বলেন, "চিকিৎসকেরাই গোটা প্রক্রিয়ার সূচনায় থাকেন। তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে ফেলতে পারলে চুক্তিপত্র অনুমোদন পেতে সমস্যা হয় না।" আরেকজন সরবরাহকারী বলেন, চিকিৎসকেরা সহায়তা না করলে কোনো ওষুধপত্র থাকে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

চিকিৎসকদের ধাপ পার হওয়ার পর আসে পৌর পিতা, হিসাবরক্ষক, বাজেট কর্মকর্তা, একজন সাধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তার প্রসঙ্গ। তাদের সঙ্গে দেনদরবার করে 'ভালোবাসার উপহার'-এর বিষয়টা নির্ধারণ করতে হয়। দর-কষাকষির পর ঘুষের যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়, তার ২০ থেকে ৫০ শতাংশ অগ্রিম হিসেবে দিতে হয়। বাকিটা সরবরাহকারী বিল পাওয়ার পর তাদের দেওয়া হয়। এই অর্থ বকেয়া রাখা হয় চুক্তির কাগজপত্র প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হওয়ার জন্য। সেই অ্যামক্সিসিলিন সরবরাহকারী জানান, "চেক যেহেতু সব সময় পেছনে একটি সূত্র রেখে যায়, তাই মেয়র সাধারণত নগদ অর্থ নেন।"

এই ওষুধ সরবরাহকারী একজন নারী। তার কাছ থেকে আরও জানা যায়, একটা দরপত্র প্রক্রিয়া যে সম্পন্ন হয়েছে, তা দেখানোর জন্য তিনি তার এক বন্ধুর কোম্পানির নাম ও নিবন্ধনের কাগজপত্র জমা দিতেন। সঙ্গে আরও দু-একটি ভুয়া দরপত্রদাতার নামে দরপত্র জমা দিতেন, যাতে বোঝা যায় সেখানে প্রতিযোগিতা হয়েছে। কখনো লোভী স্থানীয় কর্মকর্তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তাকে ঘুষের পরিমাণ বাড়াতে হতো। তারা তাকে বাড়তি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে লাভের অঙ্ক ঠিক থাকবে বলে আশ্বস্ত করত। সেই ওষুধ সরবরাহকারী স্বীকার করেন, এই বাড়তি দাবির সমন্বয়ের অর্থ হচ্ছে, নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি বিবেকের তাড়নায় কর্মকর্তাদের মনে করিয়ে দিতেন, বাড়তি ঘুষের মানেই কিন্তু নিম্নমানের ওষুধ।

একজন চিকিৎসক জানান, একবার তিনি পেটের পীড়ার কারণে তার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে এমন একটি ওষুধ খান। কিন্তু ওষুধ কোনো কাজ করেনি। রোগীদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমার কী করার আছে? এ ধরনের ওষুধই তারা সরবরাহ করে।"

এ ধরনের ঘটনা শুধু যে বিভিন্ন প্রদেশেই ঘটেছে এমন নয়। ২০০০ সালে কেইজন নগর সরকার ৮ মিলিয়ন পেসো মূল্যের ওষুধ তিনটি পৃথক চালানে ক্রয় করে। এই বিশাল ওষুধের চালানের মধ্যে লাইসিন সিরাপ যুক্ত ৬০২৮ বোতল মাল্টিভিটামিন এবং ৭৪০ বাক্স অ্যামক্সিসিলিন ক্যাপসুল ব্যুরো অব ফুড অ্যান্ড ড্রাগস (বিএফএডি)-এর বিশেষ পরীক্ষণে মানোত্তীর্ণ হয়নি। এই পরিমাণ ওষুধের মূল্য ছিল ১.৮ মিলিয়ন। বিএফএডির এই ফলাফলের পরেও স্থানীয় সরকার মূল সরবরাহকারী লা সিরোসাস ফার্মা ইনকরপোরেশনকে চুক্তির পুরো অর্থ প্রদান করে। সরবরাহকারী ক্রুটিপূর্ণ ওষুধগুলো সরিয়ে নতুন ওষুধ সরবরাহ করলেও সেগুলো বিএফএডির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওষুধের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে সিওএ আবিষ্কার করে সে সব ওষুধের দামও ৪.৩ মিলিয়ন পেসো বেশি ধরা হয়েছে। এত ঘটনার পরেও নগর সরকারের কর্মকর্তারা বলে যেতে থাকেন যে, লা সিরোসাস ফার্মা যে দরপত্র দাখিল করেছিল, তা ছিল সর্বনিম্ন। সিওএ

তাদের বক্তব্যে বলে, নগর সরকারের উচিত ছিল শুধু দাখিল করা দরপত্রের মধ্যে সীমিত না থেকে বাজারদরের সঙ্গে এসব ওষুধের দাম মিলিয়ে দেখা। ওই একই বছরে কেইজন শহরের অন্য তিনটি হাসপাতাল সেই একই ওষুধ কম দামে বাজার থেকে কিনেছিল।

আবার কোনো কোনো প্রদেশে নিয়মতান্ত্রিক একত্র চালান ক্রয়ের ব্যবস্থায় ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস করা যায়। পাঙ্গাসিনানে একেবারে প্রথম দিকে স্বাস্থ্য বিভাগের 'হেলথ সেক্টর রিফর্ম অ্যাজেন্ডা' (এইচএসআরএ) প্রবর্তন করা হয়েছিল। সেখানে একসঙ্গে বড় চালান ক্রয়ের ফলে দরপত্রে ব্যয় ৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

প্রাদেশিক হিসাবরক্ষকদের মতে কেনাকাটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিকল্পনা না থাকাটা একটি বিপৎসংকেত। কাইনতা ও রিজাল প্রদেশে ছয় বছর আগেও ওষুধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না। তখন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেনাকাটার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হতো। তখন ওষুধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের কেনাকাটার সঙ্গে ওষুধও যুক্ত করে দেওয়া হতো। কোনো জরুরি প্রয়োজন না হলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না।

সিওএর তথ্য অনুযায়ী কাইনতা প্রদেশে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০০০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ছোট ছোট এবং পৃথক ওষুধের চালান ক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণ দরপত্র আহ্বানের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি চালানের মূল্য ৬০ হাজার পেসোর বেশি ছিল না। কাইনতা স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর তখন এক মাসে এ রকম ১১টি চালান ক্রয় করে।

কাইনতা তৎকালীন পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, স্থানীয় সরকারের হাতে সাধারণ দরপত্র আহ্বানের মতো অর্থের জোগান ছিল না বলেই তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু সিওএর বক্তব্য হচ্ছে, কাইনতা ঘন ঘন কেনাকাটার প্রবণতা আসলে প্রমাণ করে না যে সেখানে অর্থের কোনো অভাব আছে। ওষুধ কেনাকাটায় কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকার বিষয়টি গোটা প্রক্রিয়াকে আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করে।

নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের যেকোনো কেনাকাটার আগে চিকিৎসক একটি চাহিদাপত্র তৈরি করেন। সেখানে অবশ্যই তাকে প্রতিটি ওষুধের পরিমাণ ও সম্ভাব্য মূল্য উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু কাইনতা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এ ধরনের কোনো চাহিদাপত্র তৈরি করেননি। যদিও তিনি কেনাকাটার ক্ষেত্রে অনিয়মের বিষয়ে অবগত ছিলেন।

কোনো কোনো ঘটনায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম ক্রয়ের বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত থাকেন না। ভিসায়াস প্রদেশের একজন চিকিৎসক জানান, সেখানকার সরকারি কর্তাব্যক্তিরা স্বাস্থ্য ইউনিটের প্রধানকে দিয়ে শুধু অর্থ প্রদানের রসিদে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। অনেক চিকিৎসকই বিষয়টি বুঝেও রসিদে স্বাক্ষর করেন, যাতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট তাদের সরবরাহ ঠিকভাবে পায়।

যারা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তারা স্থানীয় কর্মকর্তাদের ক্রোধের শিকার হন। মিন্দানাওয়ের একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের তরুণ চিকিৎসক প্রকাশ্যে স্থানীয় মেয়রের হাতে হেনস্তার শিকার হয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। এক যুগের বেশি সময় ধরে সেখানে কাজ করা ওই চিকিৎসকের অপরাধ ছিল, তিনি মেয়রের অফিসের মাধ্যমে কেনা ওষুধের সরবরাহ প্রাপ্তি রসিদে স্বাক্ষর করেননি। ওই চিকিৎসক জানান, ওষুধের মূল্য প্রায় ১০০ শতাংশ বেশি দেখানোর কারণেই তিনি স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। তিনি ওই সব ওষুধের প্রকৃত মূল্য জানতেন; কারণ, মাত্র এক সপ্তাহ আগে সরবরাহকারীর সঙ্গে তার কথা হয়।

জনসমক্ষে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে ওই তরুণ চিকিৎসক ওই এলাকা থেকে চলে যান। সেখানে দুর্নীতির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, দরিদ্র এলাকার ওই পৌরসভাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে ব্যাপক দুর্নীতি।

দ্বিতীয় অংশ

স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি, হতাশ চিকিৎসক

ইভোন টি. চুয়া

২০০২ সালে নগর চিকিৎসক হিসেবে ডা. ল্যারিওসা সামার অঞ্চলের একটি শহরে (শহরের নামটি উহ্য রাখা হলো) উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন, সেখানে সব ওষুধ মেয়রের কার্যালয়ে রাখা হয়। তথ্যটি জেনে তিনি খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে পেছনের কারণটা বুঝতে পারেন। ডা. ল্যারিওসা বলেন, "একজন রোগী ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার পরও ওষুধ পাবেন না, যদি তিনি মেয়রের রাজনীতির সমর্থক না হন। মেয়রের কার্যালয়ে ওষুধের মজুত থাকার পরেও বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতের রোগীকে বলে দেওয়া হয়, ওষুধ নেই।"

পরে মজুত ওষুধ স্বাস্থ্য ইউনিটে হস্তান্তর করার জন্য সেই মেয়রকে রাজি করানো হয়েছিল। অবশ্য তার দেওয়া শর্ত অনুযায়ী সাধারণ মানুষকে জানানো হয়েছিল, ওষুধ মেয়রের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। কিন্তু ২০০৪ সালের মে মাসের নির্বাচনের কিছু আগে আবারও ওষুধের সরবরাহ মেয়রের কার্যালয়ে আটকে যায়। পরে ডা. ল্যারিওসা তার কার্যালয়ে উপস্থিত হবেন– এই শর্তে মেয়র অর্ধেক ওষুধ ছেড়ে দিতে রাজি হন।

তখন থেকে এই তরুণ চিকিৎসকদের সঙ্গে মেয়রের সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে। একপর্যায়ে ল্যারিওসা নিজেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সরিয়ে দিয়ে মেয়রের অদক্ষ সমর্থকদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানান। আরেকটি ঘটনায় ল্যারিওসার ওপর মেয়রের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। একটি স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ শিবিরে খাবার সরবরাহকারীর ব্যাপারে তিনি আপত্তি জানান এবং সরবরাহকারীকে সরিয়ে দেন। কারণ, তার দেওয়া খাবার খেয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সবাই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। বলাই বাহুল্য, সেই সরবরাহকারী ছিল মেয়রের ঘনিষ্ঠ। ফল হিসেবে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ল্যারিওসাকে শহর থেকে সরিয়ে একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ল্যারিওসা কাজ করছেন বাতানিসের উইয়ুগান নামক একটি জায়গায়। তিনি আশা করেন, রাজনীতি আর তার কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

শুধু দুর্নীতি আর কর্তব্যে অবহেলাই স্থানীয় সরকার কাঠামোর স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জর্জরিত করেনি, পেছনে রাজনীতিও বড় ভূমিকা পালন করেছে। রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে। এই আবর্ত স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেও কাজে নিরুৎসাহিত করছে। রাজনীতির জটিলতায় না পড়লে কম বেতন আর কাজের চাপকে তারা হয়তো সহজে মেনে নিতেন।

মারিটোনা লাবাও 'বারিও ডক্টরস, লিডারস ফর হেলথ' কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, "একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটে রাজনৈতিক দলবাজি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা।" তিনি আরও বলেন, "রাজনীতিকদের সঙ্গে কাজ করা খুবই কঠিন। আমাদের স্বাস্থ্য কার্যক্রমই বাতিল হতে পারে যদি মেয়রের সহায়তা না পাওয়া যায়।"

এ রকম একটি পরিস্থিতি আদর্শবাদী তরুণ চিকিৎসকদের মোহভঙ্গ ঘটায়। এদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে 'ডক্টরস টু দ্য বারিও প্রোগ্রাম'-এ কাজ করে যাচ্ছেন। এই স্বাস্থ্য কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এক দশক আগে স্বাস্থ্যসচিব হুয়ান ফ্লাভিয়ারের আমলে। এই কার্যক্রমের অধীনে ইতিমধ্যে চিকিৎসকহীন তৃতীয় অথবা চতুর্থ পর্যায়ের ৩০০ শহরে ৪০০ জন চিকিৎসক পাঠানো হয়েছে। তারপরেও গ্রামাঞ্চলে অথবা ধনী শহর এলাকাগুলোতে এখনো চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক পৌরসভা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করলেও আরও অনেকে স্থানীয় সরকারের অধীনে আর কখনোই কাজ করবেন না এমন শপথ নিয়ে কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। একজন নারী বারিও চিকিৎসক মিন্দানাওয়ের একটি প্রান্তিক শহরে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ পান। কিন্তু চার বছর সময়কাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি কাজ ছেড়ে দেন। তার স্পষ্ট জবাব, "আমি রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ সহ্য করতে পারিনি।"

এই স্টোরি লিখতে গিয়ে রিচার্ড ল্যারিওসার মতো বহু চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে জানা গেছে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংঘাতের অসংখ্য কাহিনি। জানা গেছে মেয়রের ওষুধ আটকে রাখা অথবা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের গল্প। এই ঘটনাগুলো চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতার ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা রাজনীতিকে পৃষ্ঠপোষকতার কাজে ব্যবহার করেছেন। চাকরি এবং স্বাস্থ্য-সহায়তা দিয়ে তারা তাদের জন্য পরবর্তী নির্বাচনে সমর্থন ও ভোটের নিশ্চয়তা লাভের চেষ্টা করেছেন।

পশ্চিম মিন্দানাওয়ের দক্ষিণের একটি দরিদ্র শহরে পৌরসভার নারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, তিনি শুধু মেয়রের সমর্থক রোগীদের ওষুধ না দিয়ে সব রোগীর কাছে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে মেয়রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি ওষুধ ক্রয়ের চাহিদাপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কারণ, তার মনে হয়েছিল, সেই ক্রয়ের চাহিদাপত্রটি সন্দেহজনক। তার এই কাজেও মেয়র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। গত বছর সেই চিকিৎসক চাকরি ছেড়ে দিলে মেয়র নিজের পছন্দের একজন ধাত্রীকে এনে তার পদে বসিয়ে দেন। বর্তমানে তিনি আরেকটি দরিদ্র শহরে 'ডক্টরস টু দ্য বারিও' কর্মসূচির আওতায় কাজ করছেন। কিন্তু তার কাছে আগের চিত্রটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়নি। ওই এলাকার প্রথম মেয়র যথারীতি অদক্ষ মানুষদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। রোগীদেরকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট থেকে দেওয়া ব্যবস্থাপত্রে মেয়র অফিসের অনুমোদন নিয়ে তবেই ওষুধ নিতে হচ্ছে।

দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা সুপরিচিত একটি এনজিও সংস্থা 'ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেলথ' (এমএসএইচ)-এর যৌথ সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বহু স্থানীয় সরকার ইউনিটে রোগীদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের পরিবর্তে মেয়রের কার্যালয় থেকে ওষুধ সংগ্রহের বিষয়টা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই একই প্রতিবেদনে উত্তর লুজন প্রদেশের একটি শহরের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেখানে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের চিকিৎসক এক রোগীকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়ার পর তাকে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে গিয়ে নিজের দরিদ্র অবস্থার একটি অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সেই রোগী উপস্থিত হন পৌরসভার স্বাস্থ্য কমিটির সভাপতির কার্যালয়ে। সেখান থেকে রোগীকে বলা হয়, তাকে যে ওষুধ দেওয়া হবে তা বিতরণের বৈধতা বিষয়ে আবার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের কাছ থেকে একটি নির্দেশনা নিয়ে আসতে।

সেই সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ রকম ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির দিকটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "সমস্যা তখনই হয় যখন একজন রোগী চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়ার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটে আর ফিরে যায় না এবং রোগীকে যখন ভুল অকার্যকর ওষুধ সরবরাহ করা হয়।" চিকিৎসকেরাও আমাকে বলেছেন, বিরোধী রাজনৈতিক মতের সমর্থক রোগীরা ওষুধ আনার জন্য মেয়রের কার্যালয়ে যান না। কারণ, তারা জানেন, যে পরিমাণ ওষুধ তারা সেখান থেকে পাবেন, তা খুবই অল্প।

চিকিৎসকদের আরেকটি অভিন্ন অভিযোগ হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসনে কোনো রদবদল ঘটলেই নতুন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের জন্য তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। তবে নতুন যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, তারা বেশির ভাগই অদক্ষ। এই কাজে দক্ষ কিছু মানুষকে সরিয়ে তাদের নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।

পূর্ব ভিসায়াসে কর্মরত একজন চিকিৎসক জানান, গ্রামীণ মোড়লেরা সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীকে অপসারণ করেন, যারা তাদের রাজনৈতিক দলে সক্রিয় নন। তাদের জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয় অদক্ষ কর্মীদের। চিকিৎসকেরা অদক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তাদের বিরুদ্ধে ওঠে অযথা হস্তক্ষেপের অভিযোগ। তিনি বলেন, "গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মেয়র আকস্মিকভাবে অদক্ষ ধাত্রী নিয়োগ দিয়ে দেন।"

'লিডারস ফর হেলথ প্রোগ্রাম'-এর লাবাওর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এই গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় থাকেন। তারা নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করেন।

২০০৪ সালের নির্বাচনের আগে পূর্ব ভিসায়াস শহরের মেয়র এবং রাজনৈতিক প্রার্থীরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী, ধাত্রী এবং অন্যান্য কর্মীকে ভোটের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করে। ওই সময়ে তাদের কাজ ছিল গোটা এলাকা ঘুরে ঘুরে অধিবাসীরা কাকে ভোট দেবে, সেই তথ্য সংগ্রহ করা। একজন চিকিৎসক গোটা বিষয়টাকে 'কৌশলগত গোয়েন্দাবৃত্তি' আখ্যা দিয়ে বলেন, "রাজনীতিকেরা প্রতি ভোটের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে ৫ পেসো। আর যারা তাদের ভোট দেবে না বলে মনে হয়, তাদেরকে হাত করতে আরও বেশি অর্থ প্রদান করে থাকে।"

লাবাও জানান, এলাকার প্রশাসকদের কাছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের ভোটের সময় রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার বিষয়টা তার অজানা ছিল না। তাদেরকে রাজনৈতিক কাজের জন্য বেতনের অর্ধেক অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোনো চুক্তিভিত্তিক চাকরিতে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব

দেওয়া হয়। অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে মাসে তারা ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ পেসো বেতন হিসেবে পাবে বলেও প্রস্তাব দেওয়া হয়, যা একটি দরিদ্র শহরের বাসিন্দার জন্য অনেক।

বেশির ভাগ জায়গায় এই গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন কর্মস্থলে না এসেও বেতন ঠিকই নিয়ে যান। মিন্দানাওয়ের একজন চিকিৎসকের ভাষ্য অনুযায়ী এ ধরনের কর্মীদের 'এমজিএ ১৫-৩০ সিলা' নামে ডাকা হয়। এরা কোনো কাজ না করেও মাসের ১৫ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে টাউন হলে এসে বেতনের চেক সংগ্রহ করে নেন।

লাবাও মনে করেন, যে শহরে ২৪ জন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী আছে, সেখানে ১৮৪ জনও নিয়োগ পেতে পারে। কিন্তু তার ভাষায়, "অধিকসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী থাকার অর্থ এই নয় যে সাধারণ মানুষ আনুপাতিক হারে বেশি সেবা পাচ্ছে।"

কিছু কিছু মেয়র নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় স্বাস্থ্যকর্মীদের চাকরি দেওয়া এবং বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া বন্ধ করেননি। কিছু কিছু শহরে কোনো চিকিৎসক তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে তাদের পদাবনতি ঘটে অথবা কোনো উছিলায় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের জায়গায় নার্স অথবা ধাত্রীদের বসিয়ে দিয়ে পৌর স্বাস্থ্য কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করানো হয়।

যেসব জায়গায় মেয়রদের সঙ্গে চিকিৎসকদের সম্পর্ক ভালো নয়, সেখানে স্বাস্থ্য কার্যক্রমই কার্যকারিতা হারিয়ে বসে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, উত্তর মিন্দানাওতে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটে কর্মী এবং মেয়রের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ থাকায় সেখানে কোনো স্বাস্থ্য কার্যক্রমই পরিচালিত হয়নি।

যেসব এলাকায় চিকিৎসক এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, সেখানে সরকারের অন্য সংস্থাগুলোও চিকিৎসকদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে না বলে চিকিৎসকদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। মিন্দানাওয়ের একজন চিকিৎসক জানান, স্থানীয় স্বাস্থ্য বোর্ডের কেউ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎই করেন না। তাদের অধিকাংশই মেয়রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কাজ করেন। এই স্বাস্থ্য বোর্ড মেয়র, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের সভাপতি, গ্রামীণ চিকিৎসক, স্বাস্থ্য বিভাগের একজন প্রতিনিধি এবং নগর কাউন্সিলের একজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

রিচার্ড লারিওসা তার নিজের শহরে মেয়র ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। ওই শহরে মেয়র মাসের মধ্যে একবার আসেন এবং মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। বাকি সময়টা সেই মেয়র কালবায়োগ শহরে বসবাস করেন। সেখানে তার বাড়িও আছে। সেখানেই তিনি অন্যান্য সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। লারিওসা সেই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থাও করতে পারেননি। তার প্রস্তাবগুলো গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকে।

কিন্তু অলিখিত নিয়ম একবার ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল যখন মেয়রের ভাই বা বোনের ছেলে চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হন। তখন ওই সেন্টারের চিকিৎসক এবং কর্মী স্বাস্থ্য বিভাগের একটি প্রচারের কাজে বাইরে অবস্থান করছিলেন। যার ওপর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল সেই ব্যক্তি সেদিন কর্মস্থলেই উপস্থিত হতে পারেননি। ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়র সেই কেন্দ্রটিই বন্ধ করে দেন। পরদিন সকালে লারিওসা মেয়রকে বোঝান, তিনি যা করেছেন তা অন্যায়। সেন্টারের কেউ আনন্দ করার জন্য বাইরে ছিল না। তারপর সেই কেন্দ্রটি খুলে দেওয়া হলেও লারিওসা বিদায় নেওয়ার পর সেখানে আর কোনো চিকিৎসক আসেননি।

স্বাস্থ্য বিভাগ পরে অবশ্য একজন নগর চিকিৎসককে সেখানে পাঠায়। এ জন্য সরকারকে বোঝাতে হয়েছিল, স্থানীয় কর্মকর্তা এবং নেতৃবৃন্দ চিকিৎসকদের বিষয়ে খুবই সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করেন এবং সেখানে আরেকজন চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে লারিওসা ওই শহরের দ্বিতীয় চিকিৎসক, যিনি স্থানীয় রাজনীতির শিকার হন। তার আগে ড্যানিলো রেইনেস এ ধরনের ঘটনায় বিপত্তিতে পড়েন। তিনি ছিলেন বারিও প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচের চিকিৎসক। ওই শহরটিতে ড্যানিলোর আগে এক দশক কোনো চিকিৎসক আসেননি। শহরের কর্মকর্তারা মনে করতেন, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্যানিলোর সম্পর্ক ছিল।

লারিওসার আগে পশ্চিম সামার শহরে আরও দুজন চিকিৎসককে (তাদের নাম এখানে প্রকাশ করা হলো না) প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সেখানেও স্বাস্থ্য খাতে সীমিত সহায়তা ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সাহায্য করবেন এমন শর্ত মেয়র পালন করেননি।

আরও কয়েক বছর আগে উত্তর মিন্দানাও প্রদেশে সাতজন বারিও চিকিৎসকের মধ্যে দুজনের চাকরির সময়কাল দীর্ঘ হয়নি। তারা অভিযোগে বলেন, মেয়রের কাছ থেকে যে আচরণ তারা পেতেন, তা ছিল অসহনীয়। তাদের মধ্যে একজন চিকিৎসক বলেন, "আমি এত খারাপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম যে অন্য কোথাও পুনরায় কাজ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমার আদর্শের ভিত নড়ে গিয়েছিল

এবং আমার মোহভঙ্গ ঘটেছিল। আমি যদি আরেকটি ইউনিটে যেতাম, তাহলে সেখানেও আরেকজন মেয়র আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত।"

অনেক চিকিৎসক মেয়রদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসক, স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বরাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং বাজেট বিভাগে অভিযোগ জানান। কিন্তু সেসব অভিযোগের কোনো সুরাহা হয়নি।

তবে এত কিছুর পরেও স্থানীয় সরকার স্বাস্থ্যখাতকে গুরুত্ব দিলে সেখানে সাফল্যের দেখা মিলবেই। ২০০২ সালে ডক্টরস টু বারিও কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামবোয়াঙ্গা সিবুগের তালুসানে পাঠানো হয়েছিল আতেনিও দু জামবোয়াঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী পাসকুলিতো কনসেপসিওনকে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, স্থানীয় সরকার স্বাস্থ্যবান্ধব হলে একজন কমিউনিটি চিকিৎসকের পক্ষে কতটা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।'

পৌরসভা ও মেয়রের সহায়তায় তিনি একটি গুদামখানার মতো ভবনকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি স্বাস্থ্য ইউনিটকে ফিলিপাইনের স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির স্বীকৃতির আওতায় নিয়ে এসেছেন এবং ৫০০ দরিদ্র পরিবারকে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট মাত্র ৫০ সেন্টাভোস মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে অন্য জায়গায় এই ট্যাবলেটের মূল্য কম করে হলেও ৯০ সেন্টাভোস।

এই উদ্যোগ স্থানীয় কর্মকর্তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। তারা গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের জন্য উন্নয়ন খাত থেকে বরাদ্দ করে ১.২ মিলিয়ন পেসো। আগের বছর এই অঙ্ক ছিল ২০০০,০০ পেসো। তারা এই অর্থ থেকেই স্বাস্থ্য ইউনিটের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিমার কিস্তি পরিশোধের জন্য সুপারিশ করেছে। সেখানে স্থানীয় সরকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য কাজের জন্য পদ তৈরি করেছে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ম্যাগনা কার্টা বাস্তবায়ন করেছে। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ল্যাবরেটরিকেও মেডিকেল সেন্টার ল্যাবের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাবে। সেখানে পেপ স্মিয়ার, ব্লাড সুগার এবং বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ডা. রবার্ট ব্রিওনেসের ব্যক্তিগত রোগী দেখার কাজ খুবই ভালো চলছিল। কিন্তু তিনি অনায়াসে সব সুবিধা ছেড়ে দিয়ে সুরিগাও ডেল নরতে অঞ্চলের দ্বীপ শহর লরেতোতে একজন বারিও চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চলে আসেন। তিনি বলছিলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। স্ত্রী আর তিন শিশুসন্তানের কাছ থেকে তিনি বহু দূরে বসবাস করছেন এখন। তিনি বলেন, "আমি সব সময়ই স্ত্রী আর সন্তানদের কথা ভাবি। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে এসে একটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, যাত্রার শেষটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যাত্রাটিই।"

লারিওসাও জীবনের এত টালমাটাল অভিজ্ঞতার পরেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সেবা দেওয়ার কাজকে বাতিল করে দেননি। বারিও চিকিৎসক হিসেবে চুক্তি শেষ করার পর ইন্টারনাল মেডিসিন বা সার্জারি জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হবার কথা ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু লারিওসা বলেন, "এ সময়ে আমার মাথায় দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তা ঘুরছিল। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার বিষয়টা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং।"

লারিওসার ছোট বোন একটি মেডিকেল স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং তিনি আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী। কিন্তু লারিওসা তাকে বাতানেসে নিজের কর্মস্থল দেখাতে নিয়ে আসতে চান। তিনি বলেন, "এখানে নোংরামি আছে ঠিকই। কিন্তু তারপরেও আমার কাছে কাজটা সুন্দর।"

পরিশিষ্ট

আবিগেইল এম. ওলার্তে এবং
ইভোন টি. চুয়া

আমাদের দুজনের অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় কয়েকজন চিকিৎসকের একটি অলাভজনক গ্রুপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পর থেকে। তারাই আমাদের জানিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং প্রশাসন একেবারে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে চিকিৎসকেরা বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আমার সহলেখিকা চুয়া তখন 'ফিলিপিনস সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম'-এর মাসিক ম্যাগাজিনে 'ডক্টরস টু দ্য বারিও প্রোগ্রাম'-এর ওপর ধারাবাহিক ফিচার লেখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা তার কাছে মেয়রদের সঙ্গে তাদের নানান সংকটের বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হয়েছিলেন। আমরা দুজন তখন একসঙ্গে হয়ে এই কাজটা শুরু করি।

আমরা প্রথমে এই বিষয়ের ওপর অতীতে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ও নথিপত্র নিয়ে কাজ শুরু করি। যেকোনো ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে গবেষণালব্ধ উপাদানগুলো গুছিয়ে নেওয়া উচিত। সারাংশ অথবা একটি উপরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে তা গোটা অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে ভীষণভাবে সাহায্য করে। অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া চলার সময় তা যদি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের অনুমানকে আর সমর্থন না করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে স্টোরির কেন্দ্রবিন্দু এবং কাঠামো বদলে যায়।

আমরা প্রাথমিকভাবে অনলাইনে এই বিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলো এক জায়গায় করার চেষ্টা করি। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোও জোগাড় করি। এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু আইন নিয়েও আমরা কাজ করি। যেমন: ১৯৯২ স্থানীয় সরকার বিধি, সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংস্কার অধ্যাদেশ। আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের 'ডক্টরস ফর দ্য বারিও' কর্মসূচিতে চিকিৎসক নিয়োগ এবং অনান্য সংস্কার বিষয়েও গবেষণা করি।

আমরা অবশ্য এই কাজগুলো তথ্যের অবাধ অধিকার অধ্যাদেশের সহায়তা ছাড়াই করেছি। তত দিনে তথ্যের অবাধ অধিকার বিষয়টি সংবিধানে সন্নিবেশিত হলেও কংগ্রেস এটিকে আইন হিসেবে অনুমোদন দেয়নি। তখন সাংবাদিকেরা প্রজাতন্ত্র আইন, ৬৭১৩ থেকে সাহায্য পেতে পারতেন। এই আইনকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণবিধি এবং নৈতিক মানদণ্ড বলা হয়। এই আইনে তথ্য পাওয়ার অধিকারের কথা বলা থাকলেও সরকারি দপ্তর থেকে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালার উল্লেখ ছিল না।

আমাদের প্রাথমিক গবেষণার কেন্দ্রে ছিল কয়েকটি বিষয়। যেমন স্থানীয় সরকারের বাজেট, ক্রয়ের তালিকা, বিভিন্ন রসিদ, ওষুধের মূল্যতালিকা এবং অডিট প্রতিবেদন। ওষুধের মূল্যতালিকা এবং রসিদ জোগাড় করার কাজটা ছিল কঠিন। তবে বিভিন্ন চিকিৎসক পরিচয় প্রকাশ না করার স্বার্থে আমাদের এগুলো সরবরাহ করেন।

আমরা অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এক ডজনের বেশি চিকিৎসক এবং ওষুধ সরবরাহকারীর সঙ্গে কথা বলি। অনেক চিকিৎসক কথা বলার সময় নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। তাদের মনে ভয় ছিল নগর মেয়রের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার। তাদের কেউ কেউ অন্য প্রদেশে বদলি, চাকরি হারানো এমনকি খুন হয়ে যাওয়ার ভয়েও ভীত ছিলেন। কোনো কোনো ওষুধ সরবরাহকারী দরপত্র দাখিল বন্ধ হওয়া এবং চুক্তি বাতিল হবার ভয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছেন। তবে আমাদের এই কাজে খুবই সাহায্য করেছেন একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটের চিকিৎসক এবং একজন ওষুধ সরবরাহকারী। সেই সরবরাহকারী একই ওষুধের বিভিন্ন দামসংবলিত রসিদ আমাদের দিয়েছেন, যেগুলো স্থানীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের ভালো তথ্যের উৎস খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। কিন্তু একবার এ রকম সূত্রের সন্ধান পেয়ে গেলে আপনি একটি চমৎকার অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন।

আমরা যে সাক্ষাৎকারগুলো নিয়েছি, সেখানে সব তথ্যই ছিল সরকারি দলিল দ্বারা সমর্থিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা স্বতন্ত্রভাবে ওষুধের দাম যাচাই করার জন্য উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য আমরা আবার যাচাই করেছি চিকিৎসকদের সরবরাহ করা ক্রয়তালিকার সঙ্গে।

তবে কখনো তথ্যও মিথ্যা বলে। যেকোনো অনুসন্ধানে নথিপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে একটি তথ্যের সঙ্গে অন্য তথ্য মিলিয়ে যাচাই করে নিলে অনুসন্ধানে পাওয়া ফল সঠিক হয়। সাক্ষাৎকার ও নথিপত্র ঘেঁটে জড়ো করা তথ্য যাচাই করতে সাহায্য করে।

অনুসন্ধানের কাজ করতে করতেই চুয়া স্টোরির একটি কাঠামো তৈরি করে ফেলেন। এ ধরনের কাঠামো লেখক ও গবেষকদের একটি দলকে খুব ভালোভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এতে রিপোর্ট লেখা চূড়ান্ত হয়ে গেলে এর সঠিকতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। কোনো জায়গায় সংশোধন নিয়েও কোনো কথা থাকে না। আমাদের গবেষক এবং নীতি নির্ধারকদের ওপর যারা প্রভাব বিস্তার করেছেন, আমরা তাদের পরিষ্কারভাবে পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছি। তবে স্টোরির প্রভাব সম্পর্কে পরিমাপ করাটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। আমরা বলতে পারি, ডক্টরস টু দ্য বারিও কর্মসূচির সমালোচনামূলক আলোচনায় এই স্টোরি অবদান রাখতে পারে অথবা স্থানীয় প্রশাসন বিষয়ে নীতিপত্র তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, নেটওয়ার্ক অব এশিয়া প্যাসিফিক স্কুল, ইনস্টিটিউটস অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড গভর্ন্যান্স এবং ডেভিড আলটামেনের ২৪ আওয়ার্স ইন গ্লোবাল ইকোনমি কর্তৃক ২০০৬ সালে 'দ্য রোল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বিল্ডিং আ হারমোনিয়াস সোসাইটি' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইতে আমাদের স্টোরি থেকে উদ্ধৃত করা হয়।

২.
সাজানো দুর্ভিক্ষ

ইথিওপিয়ায় পানির সংকট নেই, কিন্তু উন্নয়নকর্মীরা বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে চাইছে, সেখানে বিপর্যয়কর খরা চলছে

লাৎজ মুকি

ভূমিকা

গত এক দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন ঘটছে এবং সেগুলোর ভয়াবহতার মাত্রাও বেশি। ধীরে ধীরে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টিও সমন্বিত হয়ে উঠেছে, সেটা ভালো, তবে মাঝে মাঝে তাতে মন্দও ঘটে। ত্রাণকাজে তহবিল গঠন এবং সহায়তা বৃদ্ধিতে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহায়তার অংশীদারত্বের নতুন মোড় নিশ্চিতভাবে বহু প্রাণ রক্ষা করেছে, এ কথা বলাই যায়। কিন্তু এই স্টোরিতে লাৎজ মুকি দেখিয়েছেন, কখনো কখনো সংকটের আগাম অনুমান অপ্রত্যাশিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও তৈরি করে। মুকি জার্মানির অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন 'নেটওয়ার্ক রিসার্চ'-এর এক স্তম্ভ। যেসব কর্মকর্তা দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করেন, তাদের আন্তরিকতা নিয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। তার লক্ষ্য হচ্ছে সেই ব্যবস্থা, যা কখনো তারা পরিচালনা করেন এবং একই সঙ্গে যার দ্বারা তারা পরিচালিত হন। মুকির মতে, কখনো শুভ ইচ্ছা খারাপ ফলও বয়ে আনে।

তার এই স্টোরি খুবই সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সেখানে বহু মানুষের সাক্ষ্য স্থান পেয়েছে। তারা তাদের সাক্ষ্যে এমন এক সমাজের কথা বলেছেন, যা ভুল ধরন এবং ভুল জায়গায় পৌঁছানো 'সাহায্য' নামের বস্তুর কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এতে সহায়তা করেছে আত্মপ্রসাদে ভুগতে থাকা সাংবাদিকেরা। মুকি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, সব অনুসন্ধানী স্টোরি যে নথিপত্রের ওপর নির্ভর করবে এমন কোনো কথা নেই। মানুষের সাক্ষ্যও এ ধরনের স্টোরি তৈরিতে সহায়তা করে। তবে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, এই কাজটা কখনো নথিপত্রের প্রমাণ জোগাড় করার চেয়েও কঠিন। এ ধরনের একটি স্টোরি করা একজন সাংবাদিকের জন্য বিশাল ঝুঁকির বিষয়ও। তার সামান্য ভুলে বহু মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই মুকিকে তথ্যসূত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। অপেক্ষা করতে হয়েছে এমন কারও জন্য, যিনি তাকে স্টোরির ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবেন।

ডি সাইথ (জার্মানি)
১৭ নভেম্বর ২০০৪

ওয়াগদি ওসমান ইথিওপিয়ায় খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম' (ডব্লিউএফপি)-এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত জাতিসংঘের কার্যালয়ে বসে তিনি দেশটির বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে সর্বশেষ তথ্যগুলো নিজস্ব প্রতিবেদনে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। অনাবৃষ্টির কারণে উঁচু ভূমিতে কৃষকদের চাষাবাদ ব্যাহত হবে, প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হবে। সাহায্যের ব্যবস্থা না করা গেলে দেশটির লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটবে ক্ষুধার কারণে– এসব আগাম সতর্কবাণীমূলক তথ্যের সঙ্গে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে তিনি প্রতিবেদনে যোগ করেন, "আমরা ১৯৮৪ সালের চেয়েও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি বলে মনে হয়।"

ইথিওপিয়ার ভয়াবহ অবস্থার চিত্র সেই সময়ে পৃথিবীজুড়ে প্রচারিত হয়েছিল। বহু মানুষই সেই সময়টা ভোলেননি যখন পত্রিকা অথবা অন্য গণমাধ্যমে শিশুদের নিঃসাড় শরীর আর বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকার অসহায় ছবি ফুটে উঠত। অল্প বয়সী মায়েদের দেখা যেত তাদের শীর্ণ সন্তান কোলে নিয়ে বসে থাকতে। আশ্রয়শিবিরগুলো ভরে উঠত ক্ষুধার্ত মানুষে, যারা বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে খাবারের কথা শুনে।

ওসমানের দপ্তরের টেবিলে সুদৃশ্য মোড়কে আবৃত ৬৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন, যার মধ্যে বিভিন্ন রেখাচিত্র ও তথ্যের মাধ্যমে ২০০৩ সালে ইথিওপিয়ায় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষের আগাম বার্তা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুর্ভিক্ষ ১৯৮৪ সালের দুরবস্থাকেও ছাড়িয়ে যাবে। ডব্লিউএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই দুর্ভিক্ষে ইথিওপিয়ায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ওসমানের প্রতিবেদনে বার্তা দেওয়া হয়েছে, এবার দেশটির প্রায় সব অঞ্চলে ভয়াবহ ফসলহানি ঘটবে। শুধু আমহারা, ওরোমিয়া ও সোমালি অঞ্চলেই ৮০ লাখ মানুষ তীব্র অনাহারের কবলে পড়বে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির জন্য সরবরাহকৃত তথ্যে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, দেশটির মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষকে বাঁচাতে এ বছর ১৪ লাখ ৪১ হাজার ১৪২ টন খাদ্য এবং ৭ কোটি ৫১ লাখ ৯ হাজার ৫৫৯ ডলার জরুরি ত্রাণ প্রয়োজন।

পানির জন্য সবল গবাদিপশু ও উট চলে যায় পূর্ণ জলাধারের কাছে

৪২ বছর বয়সী ওসমান বিবিসির সাবেক সাংবাদিক। এখন তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সাংবাদিকেরা আসেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। তিনি আশা করেন, সাংবাদিকেরা গোটা বিশ্বকে এই বিপজ্জনক পরিসংখ্যানগুলো সম্পর্কে অবহিত করবেন। তাদের পরিবেশিত খবরেই আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো নড়েচড়ে উঠবে। ইথিওপিয়ায় আগামী মাসগুলোতে কত মিলিয়ন ডলার সহায়তা আসবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হচ্ছে এই গণমাধ্যম। ওসমান বলেন, "আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস এই অশনিবার্তার কথা জেনে ইতিমধ্যে ব্যাপক সহায়তার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছে। জার্মানি এখনো কিছু জানায়নি।"

দুই দিন টানা বাস ভ্রমণের পর আমরা এসে পৌঁছাই ইথিওপিয়ার সোমালি অংশের রাজধানী জিগজিগায়। আমরা ইথিওপিয়ার পাহাড়ি এলাকার উঁচু-নিচু প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পথ ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার বেগে পাড়ি দিয়ে সোমালি অংশের সমতল ভূমিতে পৌঁছানোর পর তীব্র গরম অনুভব করি। লক্কড়ঝক্কড় বাসটা আমাদের নামিয়ে দেয় জিগজিগা শহরের মূল চত্বরে। ঔপনিবেশিক সময়ে আঞ্চলিক ভাষায় এই জায়গার নাম ছিল ওগাডেন।

জিগজিগা একটি ছোট্ট শহর। কয়েকটি প্রশাসনিক ভবন, ব্যস্ত বাজার এলাকা, নোংরা আবাসিক হোটেল, কয়েকটি পানশালা আর সেনা ক্যাম্পের চারপাশে ছড়িয়ে আছে টিনের চাল দেওয়া মাটির ঘর। শহরটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলিম জনগোষ্ঠী। শহরের প্রধান সড়কে চোখে পড়ে সেনাবাহিনীর ছুটে চলা জিপ আর ঘোড়ায় টানা গাড়ি। দিনের মধ্যভাগে শহরের তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। শহরটির প্রান্তসীমায় বসবাস করে কয়েক হাজার দেশছাড়া মানুষ। পার্শ্ববর্তী দেশ সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে তারা দশ বছর ধরে তাঁবুবাসের নিয়তি বেছে নিয়েছে। সীমান্তের কাছে ওই এলাকায় যেতে সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক। সেখানে সীমান্তের ওপারে সোমালিয়ায় চোরাই পণ্য পাচারের ব্যবসার রমরমা। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ওই অঞ্চলের রাস্তায় সেনাচৌকি বসিয়ে সোমালিয়াগামী সকল যানবাহন আটকে দেওয়া হলেও এই চোরাই বাণিজ্য বন্ধে সেনাবাহিনী কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইথিওপিয়ার সরকার গত কয়েক মাসে ওগাডেনের ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধের জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে। তাদের সেনাবাহিনী পুরোনো শত্রু সোমালিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকেও অভিযান পরিচালনা করছে।

ডব্লিউএফপি প্রতিবেদনে রুক্ষ আর কাঁটাঝোপে আচ্ছাদিত সোমালি অঞ্চলটিকে খরাকবলিত অঞ্চলগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিসংখ্যানে বলা হচ্ছে, শুধু এই এলাকাতেই ১১ লাখ মানুষ খরাকবলিত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, জিগজিগার আশপাশের অঞ্চলে ২ লাখ ৬৪ হাজার সোমালীয় মানুষ অনাহারে আক্রান্ত হতে পারে। এখানে গবাদিপশু ও উটের কৃশকায় অবস্থার কথাটাও আলোচনায় উঠে

এসেছে। প্রতিবেদনে পানির সংকটকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করে বলা হয়েছে, দুই বছর ধরে অনাবৃষ্টি থাকায় মানুষ এবং পশু উভয়ের অবস্থাই সংকটাপন্ন।

তাই যেন বাইবেলের কাহিনির মতো শুষ্ক মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দেখা যায় প্রচুরসংখ্যক সবল উট, ছাগল ও ভেড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলে যায় ওমানে পশুদের পানি পান করার পূর্ণ আধারগুলোর দিকে। এই পশুদের নিয়ে কখনো কৃষক এবং যাযাবর রাখালেরা দুই দিনের পথও পাড়ি দেয়।

২২ বছর বয়সী ফয়সাল আহমেদের পরনে ছিল অ্যাডিডাস কোম্পানির জীর্ণ টি-শার্ট আর পায়ে গাড়ির টায়ার দিয়ে তৈরি স্যান্ডেল। আমরা তার দীর্ঘদেহী দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। তারাই আমাদের জানায়, পশুদের পানি খাওয়ানোর জন্য সব কটি জায়গাই তাদের পরিচিত। তারা জানায়, তাদের পরিবারের কোনো সদস্যই বর্তমানে অনাহারে ভুগছে না। আশাবাদী হাসি হেসে তারা বলে, এই অবস্থার সহসা পরিবর্তন ঘটবে না। তাদের গোত্রে সবচেয়ে বর্ষীয়ান ব্যক্তিটি আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান দেখে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। তখন তারা তাদের গবাদিপশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ধূলিধূসর ঢাল বেয়ে আরও দূরে যেখানে কর্দমাক্ত পানি পাওয়া যাবে।

জিগজিগা শহরে একটি উত্তপ্ত দিনের শেষে সন্ধ্যার মৃদু হাওয়ায় হোটেল আফ্রিকার সামনের ছোট্ট বাগানে মোহাম্মদ বেউল বসে মিনারেল ওয়াটারের বোতলে চুমুক দিচ্ছিলেন। আশপাশে রাখা একটা লাউড স্পিকারে কর্কশ শব্দে স্থানীয় গান বাজছিল। একটা টুপিতে মুখের প্রায় অর্ধেক ঢেকে বসে থাকা এই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা পাইলট নামে সম্বোধন করে। সোমালিয়ায় তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি ছিলেন যাযাবর শ্রেণির মানুষ। পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকায় জঙ্গি বিমানের পাইলট হিসেবে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। এখন তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন। নিয়মিত অবসর ভাতাও পান। তিনি সান ডিয়েগোতে বসবাস করলেও মাঝেমধ্যে নিজের দেশে চলে আসেন। কথা বলতে গেলে বেউল আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "আপনি এখানে দুর্ভিক্ষ নিয়ে স্টোরি করতে এসেছেন? তাহলে বলতে হবে, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।" তিনি বলেন, "আমি সম্প্রতি ওগাডেন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানে নানান ধরনের সমস্যা থাকলেও দুর্যোগ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

আমাদের কথোপকথন চলার সময় ডব্লিউএফপির স্টিকার লাগানো একটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামেন পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি। বেউল আমাকে বলেন, "আপনার এদের সম্পর্কে লেখা উচিত। এরা বড় বড় গাড়ি চালায়, মোটা অঙ্কের বেতন পায়। একজন যাযাবর রাখালের জীবন সম্পর্কে এদের ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই।" উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ব্যাপারে বেউলের রয়েছে নানান অভিযোগ। এই সংস্থাগুলো তার গোত্রের যাযাবর সোমালীয়দের জন্য তথাকথিত লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। আর তাতে করে তার গোত্রের লোকেরা নিজেদের ভ্রমণ পথ বদল করে যেখানে বিনা পয়সায় খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, সেখানেই চলে যাচ্ছে। তিনি জানান, এই খাবারের বেশির ভাগই হয় গবাদিপশুকে খাওয়ানো হচ্ছে অথবা অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

বেউল বলেন, "আমার গোত্রের মানুষেরা পুষ্টির জন্য আজকাল এই শস্যদানার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে। তাদের কাছে বিষয়টা অনেকটা নেশার মতো। কিন্তু একটা সময় তাদের খাদ্যের অবলম্বন ছিল গবাদিপশু।"

আলোচনার মাঝখানে বেউল হঠাৎ করেই হাসতে শুরু করেন। তারপর হাসি থামিয়ে বলেন, "আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার দুর্ভিক্ষ কিন্তু এখনই ধুয়ে মুছে যাবে।" তার কথা শেষ হতে না হতেই শুনতে পাই হোটেলের গাড়িবারান্দার চালে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ার শব্দ। সেদিন গোটা রাত এবং পরের কয়েক দিন ধরে টানা চলল বৃষ্টিপাত।

দিরে দাওয়া শহরটায় জিগজিগা থেকে যেতে অর্ধেক বেলা সময় লাগে। গিয়ে দেখি সেখানেও বৃষ্টি পড়ছে। ১৯০২ সালে ইথিওপিয়ার সম্রাট মেনেলিকের নির্দেশে এটি একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আদ্দিস আবাবা ও জিবুতি– এই দুই শহরের মাঝে রেলপথকে ব্যবহার করে চলত বাণিজ্য। এই শহরটাই এখন ইথিওপিয়ার একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শহরের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে ট্রেন চলাচল করে জিবুতি থেকে এডেন উপসাগরের দিকে।

শহরের মূল রাস্তার পাশেই হারার ক্যাথলিক সার্ভিস নামে একটি ত্রাণদাতা সংস্থার কার্যালয়। এই সংস্থার প্রধান ড. পাওলো পিরিওন্তি যাযাবর সম্প্রদায়ের বিষয়ে একজন সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৮ বছর ধরে ইথিওপিয়ায় বসবাস করছেন। তিনি সেখানেই একটি ছোট্ট ঘরে বসে কাজ করতেন। ঘরটার আরেকজন ভাগীদার ছিলেন শহরের আবাসিক যাজক। তার অধীনে ৮০ জন উন্নয়নকর্মী ছিলেন যারা নিম্নাঞ্চলের যাযাবর এবং উঁচু এলাকায় কৃষকদের মধ্যে কাজ করতেন। পিরিওন্তির মতে, এখানকার নিম্নাঞ্চলে কেউ অনাহারে মারা যাবে না কথাটা একটু নাটকীয় এবং বাড়াবাড়ির মতো শোনায়। এটা প্রমাণ করাও কঠিন। পিরিওন্তি বলেন, "মূল সমস্যাটা হচ্ছে আদ্দিস আবাবার

বহু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ তাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কার্যালয় থেকে বের হন না। যাযাবরদের জীবন সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। তাই তারা একটি অসুস্থ উটকে আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্ব সংকেত বলে ধরে নেন।"

সৌদি আরবের অর্থায়নে ইসলামের রেনেসাঁ

পিরিওন্তি আগের কথাগুলো বলে বেশ রেগে যান। তারপর রাগ কমাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, "গত কুড়ি বছরে এ দেশে যে খাদ্যশস্য এসেছে, তা দরিদ্র মানুষকে বাঁচানোর জন্য নয়। এই সরবরাহ পাঠানো হয় আমেরিকা, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে শস্যের উদ্বৃত্ত ফলনের চাপ কমানোর জন্য। তা না হলে এই দেশগুলোর আমাদেরকে নগদ অর্থ না দেওয়ার আর কোনো কারণ আছে? পৃথিবীর এই অংশে নগদ অর্থে আমরা সাহায্যের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারি। এখানে খাবারের দাম অনেক কম আর এত দূর থেকে পরিবহনের ব্যয় বহনেরও কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাই না।" পিরিওন্তির গলায় আরও ক্ষোভ ঝরে পড়ে, "ইথিওপিয়াকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের এত মাথাব্যথা কেন? এর একটাই কারণ– সুদান ও সোমালিয়ার মাঝে ইসলাম ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব। আরেকটি কারণ হচ্ছে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক আরব উপদ্বীপের উল্টো দিকে।"

এই দেশটিতে গোঁড়া খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তার বদলে ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটছে সেখানে। সৌদি আরবের অর্থে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ, মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে হাসপাতালও। এ ধরনের উন্নয়নের পরিসংখ্যান অনেক দিন ধরে আড়ালে থাকলেও এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইথিওপিয়ার জনসংখ্যার অর্ধেকই মুসলমান।

পিরিওন্তি একটা সিগারেট শেষ করে আরেকটা ধরান। তারপর ঝাঁজালো কণ্ঠে বলেন, "৯/১১-এর ঘটনার পর এই দেশে খ্রিস্টান সরকারের জন্য খাদ্য ও সামরিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য আমেরিকার কাছে এই কারণগুলোই তো যথেষ্ট। এই দেশে মানুষ অনাহারে আছে এবং তাদের অভাব আছে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অবস্থাটা এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গেল কেন? আপনি যদি দুর্ভিক্ষ নিয়ে স্টোরি লিখতে চান, তাহলে আমি বলব মিয়েসো চলে যান। সেখানে অনেক গ্রামে আবাদের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানকার মানুষ দুরবস্থার মধ্যে আছে। টেলিভিশনে দুর্ভিক্ষের যে ছবি আপনারা দেখেন, তা ওই অঞ্চলেরই। সাংবাদিকেরা স্টোরি করার জন্য সেখানেই যান সচরাচর। এ দেশের প্রেসিডেন্টও সম্প্রতি কয়েক ঘণ্টার জন্য ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন।"

মিয়েসো যাওয়ার পথটা খুবই বন্ধুর। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে প্রায় আড়াই হাজার মিটার। বৃষ্টির ফলে রাস্তায় ঘন কাদা হওয়ায় আমাদের গাড়ি খুব ধীরগতিতে চলছিল। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। গাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ানোর যন্ত্রটা নষ্ট থাকায় প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছিল।

আমরা প্রথম যে গ্রামটায় পৌঁছাই, তার নাম মেলকাহোরা। সেখানে একটা পথের পাশে কৃষক আলী মুমেদের বাড়ি। আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মুমেদ তাড়াহুড়া করে তার বাড়ির পাশে পানি-কাদায় মাখামাখি মাঠের কাছে আসেন। তিনি ঠান্ডায় কাঁপছিলেন। আমরা সবাই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে জড়সড় হয়ে আশ্রয় নিই একটা বাবলা গাছের নিচে। মুমেদের আড়াই হেক্টর জমি আছে। কিন্তু সে জমির ফসল স্ত্রী আর চার সন্তানের সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তার কাছে জানতে চাইলাম, এই বৃষ্টি তার কোনো উপকারে আসবে কি না। উত্তরে ৫৩ বছর বয়সী মুমেদ বলেন, "এই বৃষ্টি আমার দুটি মহিষের জন্য উপকারী হবে। কারণ, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাঠে ঘাস হবে, যা থেকে তাদের খাবারের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে। এ ছাড়া বৃষ্টির আর কোনো সুবিধা দেখতে পাচ্ছি না।" আমাদের কথার মাঝখানে মুমেদের আরও কয়েকজন প্রতিবেশী যোগ দেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, "আমরা প্রতি মাসে ত্রাণ সহায়তা হিসেবে মাথাপিছু ১০ কিলোগ্রাম করে ভুট্টা পাই। এ ছাড়া আমরা পুরো মাসে আর কিছু খেতে পাই না। কিন্তু অবাক বিষয় হচ্ছে, এই ভুট্টার বীজ আমরা বপন করতে পারি না। কারণ, বিদেশি ত্রাণ সাহায্যের অধীনে আসা ভুট্টার বীজ বন্ধ্যা।"

সেই প্রতিবেশী আরও বলেন, "আমরা যদি বীজ কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে তো ত্রাণ সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।" মুমেদ প্রতিবেশীর কথা শুনতে শুনতে একবার তার হাত আকাশের দিকে তুলে আবার হতাশায় নামিয়ে এনে বলেন, "এই যে দেখুন আমার জমিন চাষ করা আছে। কিন্তু সেখানে চাষাবাদ করতে পারছি না। হয়তো এবার ভাগ্য আমার সহায় হবে।" হঠাৎ কথা থামিয়ে নীরব হয়ে যান মুমেদ। তার চোখেমুখে অস্বস্তি। বৃষ্টি আরও বেড়ে গেলে তিনি নিজের ঘরে চলে যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

নানান কারণেই ইথিওপিয়ায় যে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ভুট্টা আসে, সেগুলোর বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। কিছু বীজ দেখা যায় রোপণের যোগ্য নয় আর কিছু ভুট্টা এত আগের মজুত করা যে সেগুলোর অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতাই শেষ হয়ে গেছে। বীজ নিয়ে এই সংকট ইথিওপিয়ার সরকার কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পেরে বীজ ও সার কৃষকদের কাছে বাকিতে বিক্রির একটি কৃষি প্যাকেজ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্প যারা বীজের অভাবে আছে, তাদের জন্য কিছুটা হলেও সাহায্যের বার্তা নিয়ে এসেছে। তবে তারা বীজের পুনরায় মূল্য পরিশোধের হারের কারণে এবং এ ধরনের বীজের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য নিজেদেরকে বিপদাপন্নও করে। উচ্চ ফলনশীল এই বীজ সরবরাহ করে আমেরিকার কোম্পানি পাইওনিয়ার হাইব্রিড ইন্টারন্যাশনাল। এই কোম্পানি তাদের বীজ থেকে উচ্চ ফলনের নিশ্চয়তা দেয় শুধু এক মৌসুমের জন্য। ফলে পরের বছর আবার এই বীজ অবশ্যই কিনতে হবে।

আদ্দিস আবাবা থেকে প্লেনে আকাশে ওড়ার দেড় ঘন্টার মধ্যে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের একটি ছোট বিমান আমাদের নিয়ে বাহির দার বিমানবন্দরে অবতরণের উপক্রম করল। আকাশ থেকেই দেখা যাচ্ছিল, ৩,৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে লেক টানা রোদ পড়ে ঝলমল করছে। নীল নদের উৎস এই লেক ঘিরে বিস্তীর্ণ এলাকা খুবই জনবহুল। আকাশে বিমানে বসেই চোখে পড়ল ছোট ছোট খেতে কাজ করছে কৃষকেরা।

বাহির দার শহরটি বহু পুরোনো এবং সন্ন্যাসীদের হাজার বছরের পুরোনো মঠের জন্য বিখ্যাত। ওই শহর থেকে আমাদের গন্তব্য দেবরে তাবোর নামে আরেকটি শহর। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের শহরটি দক্ষিণ গোনদারের আমহারা প্রদেশে অবস্থিত।

সেই শহরে কাজ করেন কৃষি বিশেষজ্ঞ ক্লাউস ফেল্ডনার। তার প্রকল্পের নাম 'ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম সাউথ গোনদার'। সরকারি তথ্যমতে, তার অঞ্চলটিও খরায় আক্রান্ত এলাকার একটি। কিন্তু জার্মানির অধিবাসী ফেল্ডনার দুর্যোগের ওপর বিভিন্ন পরিসংখ্যান পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে তার অবিশ্বাসের কথা জানিয়ে বলেন, "আরও কয়েকটি এলাকা আছে, যেগুলো পুষ্টিহীনতার মাপকাঠিতে নিচের দিকে। আমি সাত বছর ধরে এখানে কাজ করছি। সব সময়ই দেখি, পরিসংখ্যানের তালিকা থেকে একটি এলাকার নাম বাদ পড়তে। কোনো বছর ফসলের উৎপাদন ভালো বা মন্দ হোক, এদের অবস্থান একই জায়গায় রয়ে যায়। এই অঞ্চলের গ্রামগুলোতে কখনো একটি পরিবারের হয়তো ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু পুরো গ্রামই এ রকম সংকটে পড়েছে তেমন নজির নেই।" ফেল্ডনার গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, ইথিওপিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে এবং অন্য দেশে তারা শস্য রপ্তানি করতে সক্ষম। তার ভাষায়, "এই দেশটির অনেক সম্ভাবনা আছে।"

ফেল্ডনার ৩৬ বছর ধরে উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। অবসরে যাওয়ার আগে দক্ষিণ গোনদারের প্রকল্পটিই তার শেষ কাজ। এখানেই তিনি প্রথমবার সাফল্যের মুখ দেখেছেন। তিনি 'ট্রিটিকেল' নামে একটি বিশেষ ধরনের শস্যবীজ সেখানে রোপণ করেছেন। এই উচ্চ ফলনশীল বীজটি গম এবং রাই নামে দুটি ফসলের মিশ্রণ। এই বীজ দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেলেনবশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। দেখা গেছে এটি আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায়। তার মাধ্যমেই এই বীজ ইথিওপিয়ায় ব্যবহার করা হয়। এর আগে দেশটির সরকার এই বীজ ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়। এরই মধ্যে এই বীজ আমহারা রাজ্যে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রিটিকেল থেকে উৎপাদন দুই গুণ বেশি পাওয়া সম্ভব এবং এটি নতুন বীজ ধারণে সক্ষম। ইথিওপিয়ার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রদূতেরা দেবরে তাবোর এলাকায় ফেল্ডনারের এই বিশাল কাজ দেখার জন্য ভ্রমণ করেছেন।

কোট-টাই পরিহিত উন্নয়নকর্মী দেখে ক্ষিপ্ত

এই সাফল্য পাওয়ার জন্য ৬০ বছর বয়সী ফেল্ডনারকে রীতিবিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। তিনি মাসের পর মাস শুল্ক বিভাগের দরজায় অপেক্ষা করতে চাননি। বাড়াতে চাননি আমদানি ব্যয়। সরকারি মহলকে ট্রিটিকেল বীজের গুরুত্ব বোঝাতে সময় নষ্টও করতে চাননি। এসব রীতির বাইরে গিয়ে তিনি বীজ আর যন্ত্রপাতি চোরাই পথে ইথিওপিয়ায় নিয়ে আসেন। বেশ কয়েকবার ফেল্ডনার ইথিওপিয়ার অর্থডক্স চার্চের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ, আমহারা অঞ্চলের চার্চ সেখানকার ধর্মপ্রাণ কৃষকদের একাধিক সরকারি ছুটির দিনে খেতে কাজ করতে নিরুৎসাহিত করেছে। ওই অঞ্চলের কৃষকেরা বছরে মাত্র ১২০ দিন কৃষিকাজ করার অনুমতি পায়। আদ্দিস আবাবায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যারা কাজ করছে, তাদের ভিড়ে ফেল্ডনার একজন আলাদা মানুষ। তিনি এখনো দূর কোনো জনপদে অবস্থার উন্নয়নের জন্যও কাজ করে চলেছেন। তিনি ইথিওপিয়ায় উন্নয়নকর্মীদের কর্মকাণ্ড দেখে বিরক্ত। তার কাছে মনে হয়েছে, অনেক যোগ্য বিজ্ঞানী কাজ করছেন দেশটিতে। কিন্তু তারা কোট-টাই পরে রাজধানীর সাজানো অফিসের শোভা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করছেন না। এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে ফেল্ডনার ক্ষুব্ধ। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, "এরা কি কেউ খেতে লাঙল চালাতে সক্ষম?"

ফেল্ডনার ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) বা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির বিরুদ্ধে দ্বৈত নীতি গ্রহণের অভিযোগ তুললেন। তিনি মনে করেন, এই সংস্থা একদিকে যেমন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, আবার তেমনি তারা নিজেদের স্বার্থের বাইরে কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় না। আর তাই হয়তো পৃথিবীর মানুষের সামনে তারা দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দেয়। ফেল্ডনারের সোজা কথা, "যদি পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ না থাকে, তাহলে ডব্লিউএফপি তাদের বিশাল সংস্থা পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করতে পারবে না। তাদের সরবরাহ করা প্রতি টন খাদ্যের জন্য টাকা দিতে হয়। আর ঠিক এ কারণেই ইথিওপিয়া, দক্ষিণ সুদান অথবা বাংলাদেশে তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সংকটের চিত্র তৈরি করে। এই দেশগুলো বিগত শতাব্দীতে ডব্লিউএফপির জন্য অর্থ প্রবাহের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।"

দক্ষিণ গোনদারে উচ্চ পর্যায়ে প্রভাবশালী বন্ধু ছাড়া কোনো কাজ করানো কঠিন। সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জোনাস বেকেলে ফেল্ডনারের তেমনই একজন বন্ধু। তার একটা ফোন পেয়েই বেকেলে আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়ে গেলেন। তার দপ্তরে 'ইথিওপিয়ান পিপলস রেভল্যুশনারি ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইপিআরডিএফ) সদস্যদের উপচে পড়া ভিড়। বেকেলে অবশ্য আমাকে যা জানান, তা সাধারণভাবে আমরা সব সময় শুনে থাকি। তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে খাদ্যাভাবের জন্য আবহাওয়াকে খুব বেশি দায়ী করা যায় না। তবে কয়েক দশক ধরে খাদ্য সহায়তা নিয়মিত পাওয়ার ফলে পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন মানুষ এই সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। আর তাতে তাদের মধ্যে পরনির্ভরতার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অবস্থাটা এমন হয়েছে যে ত্রাণ আমাদের কাছে এখন সূর্যের মতোই স্বাভাবিক একটি বিষয়।"

সরকার সমালোচকদের কথা শুনে সময় নষ্ট করেনি

জোনাস বেকেলের কথা শুনে তার সহকারীরা মৃদু হাসলেও তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, "কৃষকেরা যাতে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারে এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। সাধারণ মানুষকে খাবার সরবরাহ করে যাওয়া দাতা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব হয়ে উঠতে পারে না। উন্নয়নকর্মীদের মানুষকে শেখাতে হবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কৌশল। গত ২০ বছরে উন্নয়ন সাহায্যের নামে প্রচুর অর্থ অপব্যয় হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়া দরকার! কিছু কিছু উন্নয়ন সংস্থা সমস্যার সমাধান করার বদলে তা আরও জটিল করে তোলে। কারণ, তাদের কর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিছু একটা তো করতে হবে।" 'অ্যাসোসিয়েশন অব এইড অর্গানাইজেশন ইন ইথিওপিয়া'-এর সদস্য সংখ্যা ১৪১। তাদের ধারণা অনুযায়ী, ইথিওপিয়ায় নিবন্ধিত ৩২৫টি ত্রাণ সংস্থার এক-তৃতীয়াংশই খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। মানুষকে সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে– তাদের এই মূল স্লোগান কিন্তু চার্চে রোববারের সাপ্তাহিক প্রার্থনাসভায় আর নথির খসড়াতেই বন্দি হয়ে থাকে।

বেকেলে আমাদের জানান, ইথিওপিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝেই বিপুল উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে নিকট অতীতে এ ধরনের উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়েছিল ২০০১ সালে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সুফল অভাবী মানুষ অথবা উৎপাদক কেউই পায়নি। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার অভাব, অন্যদিকে খাদ্য সাহায্যের অবারিত প্রবাহ। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ইথিওপিয়ায় প্রতিবছর যে ৮ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, তার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ঘটনাক্রমে সরবরাহ করার পরিবর্তে দেশটির বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের বাজারে অবিশ্বাস্য রকম কম মূল্যে বিক্রি হয়। কোনো কৃষকের পক্ষেই এই বাজার মূল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে ফসল আবাদ করার কাজই বন্ধ করে দিচ্ছে কৃষকেরা। পরিবর্তে বাড়ছে 'খাট' নামে একধরনের ভেষজ মাদকের চাষ। বিভিন্ন অঞ্চলে ঝোপের মতো হয়ে এগুলো বৃদ্ধি পায়। 'কাটামিনস' নামে অবসাদ তৈরির উপাদান এই মাদকে রয়েছে। পূর্ব ইথিওপিয়ার বিস্তীর্ণ সমতলে এই মাদকের এখন চাষাবাদ চলছে এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

খাট নামের উদ্ভিদের সবুজ পাতা এখন কৃষকদের অর্থের মুখ দেখাচ্ছে। এই মাদকদ্রব্য এখন আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে প্রবেশ করছে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে। ইথিওপিয়া থেকে কফি, তেল, ডাল আর গবাদিপশুর সঙ্গে খাটও রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে।

বিভিন্ন সরকারি ঘোষণায়, আলোচনা সভায় এবং সরকারের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে খাদ্য সহায়তা ছাড়াই ইথিওপিয়ার মানুষের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তারাই আবার খাদ্য সহায়তার পুরো ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছেন। ইথিওপিয়ায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ইপিআরডিএফ। তারা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যও গড়ে তুলেছে। তাদের ভাষায় খাদ্য সহায়তা জরুরিভিত্তিক কোনো সমাধান নয়, এটি হচ্ছে আশীর্বাদ। ১৯৮৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই দেশের ক্ষমতাসীনেরা আমদানি করা ১৪ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হয়েছেন।

বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহন কোম্পানিগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক আবার ক্ষমতাসীনেরাই। প্রতি টন পরিবহনে তারা ১৫০ ডলার আয় করে। জরুরি প্রয়োজনে এই অর্থের অঙ্ক আবার বৃদ্ধি পায়। এ থেকেই ধারণা করা যায়, প্রতিবছর লাখ লাখ টাকায় তাদের পকেট কী পরিমাণে ভর্তি হচ্ছে। এখানে আরেকটি প্রয়োজনীয় তথ্য হচ্ছে, এই পরিবহন এবং খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দলটির সমর্থকেরা অগ্রাধিকার পায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোট খাদ্য সহায়তার ৩০ শতাংশই চলে যায় টিগরে প্রদেশে। এই প্রদেশেই ইপিআরডিএফের বড় অংশ সমর্থকেরা বসবাস করে। যদিও ওই অঞ্চলে শতকরা হিসাবে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষের এই সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। 'গ্রেইন মার্কেট প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প থেকে ১৯৯৮ সালে চালানো এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। জরিপ থেকে আরও জানা যায়, খাদ্য সহায়তার মাত্র ২২ শতাংশ পৌঁছায় সেই মানুষদের কাছে, যাদের সহায়তার সত্যি সত্যি প্রয়োজন রয়েছে। বাকি খাদ্য সহায়তা সেখানে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সরকার এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো মিলিতভাবে কর্মচারী, কার্যালয় এবং যানবাহন ইত্যাদি খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে রেখেছে। একদল মার্কিন ও ইথিওপিয়ান গবেষক অপুষ্টির শিকার মানুষ এবং যারা সাহায্য পাচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন জরিপে।

এই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরপরই দ্রুত গবেষণা প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রকল্প কিন্তু ইথিওপিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তাবিষয়ক কর্তৃপক্ষ ইউএসএআইডি এবং মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক টম জেইন তখন ছিলেন এই প্রকল্পের প্রধান। তিনি বলেন, "আমাদের ওপর ইথিওপিয়ার রাজনৈতিক মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় জরিপের ফল পাল্টে দেওয়ার জন্য। তারা আমাদের কয়েকজন ইথিওপিয়ান সহকর্মীকে বদলি করে এমন কয়েকজনকে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করে, যারা দলের প্রতি অনুগত। আমরা যখন তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিলাম না এবং আমাদের প্রাপ্ত তথ্য ও সহকর্মীদের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুললাম না, আমাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হলো।"

এই জরিপ কেন আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না, তা নিয়ে এই অধ্যাপকের আজও মনে বিস্ময় কাজ করে। এ বিষয়ে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে ইথিওপিয়া সব সময়ই গুরুত্ব বহন করে। ৯/১১-এর ঘটনার আগে থেকেই পশ্চিমা মহল মনে করে, রাজনৈতিক অর্থনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইথিওপিয়ায় ক্ষমতায় থাকা সরকারের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ওপর এখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পশ্চিমা রাষ্ট্র বিষয়টি মেনে নেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তারা মনে করে, দেশটির ক্ষমতাবলয়ের নিয়ন্ত্রণ অভিজাত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের হাতে থাকা উচিত। তারাই এখন ইথিওপিয়া শাসন করছে।

এই অভিজাত সম্প্রদায় খ্রিস্টধর্মের মূল্যবোধকে লালন করে না। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা সংহত করে রাখা। ইথিওপিয়ার শাসকেরা তাদের সমালোচকদের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। অসংখ্য বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী বিচার ছাড়াই দিনের পর দিন কারাগারে বাস করছে, সরকারবিরোধীরা মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হচ্ছে, ছাত্রদের প্রতিবাদ শাসনের স্টিম রোলারের চাকার তলায় পিষ্ট হচ্ছে, সরকারের নীতির সঙ্গে একমত না হলে দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে উন্নয়নকর্মীদের, কথা বলতে পারছেন না সাংবাদিকেরা।

বেরাহানু নেগা ইথিওপিয়ার একজন অর্থনীতিবিদ ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা। তিনি দেশটির অন্যতম বিরোধীদলীয় সদস্য। ২০০১ সালে ছাত্রদের প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেওয়ায় তাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। নেগা আদ্দিস আবাবার শেরাটন হোটেলে আসেন আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। হোটেলটির এক রাতের ভাড়া একজন ইথিপিয়ান নাগরিকের এক বছরের আয়ের প্রায় দেড় গুণ বেশি (১৫০ ডলার)। নেগাকে স্বাগত জানানোর জন্য হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করছিল তার দলের কর্মীরা। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করে নেগা এসে বসেন সাক্ষাৎকারের জন্য। আমি তাকে প্রথমেই প্রশ্ন করি, "আপনি কি মনে করেন, এই দেশে একটি খরা মৌসুমের পরপরই দুর্ভিক্ষ আসে?" উত্তরে তিনি বলেন, "এই ধারণা সঠিক নয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটার পেছনে কাঠামোগত কিছু কারণ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এ দেশে প্রতি একর জমির মালিকানা সরকারের। তাই বেসরকারি খাতের কোনো বিনিয়োগ এখানে বেশির ভাগ সময় সমস্যার মুখোমুখি হয়। যেমন বলা যায় সেচ বা আবাদের কোনো নতুন পদ্ধতির কথা। আমাদের কৃষকেরা এখনো কাঠের লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করে। ৩ হাজার বছর আগেও তারা তাই করত। একজন কৃষক এখন গড়ে এক হেক্টরের মতো জমি চাষ করে।" সাক্ষাৎকারের এই পর্যায়ে এসে নেগা খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তারপর নিজের আবেগ কিছুটা সামলে নিয়ে বলেন, "আমাদের সরকার আসলে কোনো কিছুই বদলাতে আগ্রহী নয়। তারা ব্যক্তিমালিকানায় জমি কখনোই ছেড়ে দেবে না, অন্যদিকে শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনাও করবে না। কেন তাদের এই নীতি? কারণ, তারা এভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। এসব কারণে তারা শহরাঞ্চলে তাদের সমর্থন হারিয়েছে অনেক আগেই। বাইরে থেকে খাদ্য সাহায্য নিয়ে এসে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না বরং ভবিষ্যতে আমার মতে

সমস্যাগুলো আরও প্রকট হবে।" তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে দাতা দেশ এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উচিত ইথিওপিয়ায় গণতন্ত্রায়ণের বিষয়ে কাজ করা। লাগসই উন্নয়নের বিষয়টা তখনই এখানে নিশ্চিত হবে।"

সব টেলিভিশন চ্যানেলে দুর্ভিক্ষের একই ছবি

আদ্দিস আবাবায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধিদের প্রধান কার্যালয় সিটি সেন্টার ও বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই ভবনেই আগে সাবেক পূর্ব জার্মানির দূতাবাস ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সেখানে বসেই দেশটিতে আসন্ন দুর্ভিক্ষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার জন্য তথ্য-উপাত্ত গোছানোর কাজ করছিলেন। কিন্তু যারা সেখানে কর্মরত ছিলেন, তাদের মধ্যেই তথ্য ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। সেখানকার একজন কর্মী, যিনি বিষয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, তার মত হচ্ছে, পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগুলোর বিশ্বস্ততা যথাযথ নয়। এই কাজে ইথিওপীয় সরকারের প্রতিনিধি, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি মিলিয়ে ২৪টি দল কাজ করেছে। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে তারা অবস্থা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ-প্রতিবেদন দেয়, সেটা খুবই তাড়াহুড়া করে করা একটি কাজ ছিল। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অনেক তর্কবিতর্কের পর তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে প্রতিবছর খাদ্য সরবরাহের বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে পরবর্তী কয়েক মাসে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের অভুক্ত মানুষের জন্য বিপুল খাদ্য সহায়তা আসা শুরু হয়ে যায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রতিবেদনে নাটকীয় অঙ্কগুলোর প্রয়োজন ছিল।

ইথিওপীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সংখ্যা বিশ্বের সামনে আরও বেশি আসা উচিত বলে বিতর্ক তোলা হলেও ইইউর প্রতিনিধিরা এই সংখ্যা কম দেখাতে বলেন। শেষে তারা একটি সমঝোতায় পৌঁছান।

সাংবাদিক হান্স জোসেফ ড্রেকম্যান জার্মানির ফার্স্ট টেলিভিশন প্রোগ্রাম এআরডির আফ্রিকা প্রতিনিধি ছিলেন ১৩ বছর। ড্রেকম্যান মনে করেন, উন্নয়ন সংস্থা এবং গণমাধ্যমের মধ্যে মিলের জায়গাটা হলো, তারা উভয়েই বেঁচে থাকে বিপর্যয়ের ওপর নির্ভর করে। ৬৪ বছর বয়সী এই সাংবাদিক বলেন, "ধনী দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ইথিওপিয়া একটি কার্যকর অস্ত্র। কারণ, পৃথিবীর মানুষ ১৯৮৪-৮৫ সালের সেই মারাত্মক বিপর্যয়ের কথা ভোলেনি।" তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "সেই সময়ে ইথিওপিয়ার সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিন্তু হাজার হাজার মানুষের অনাহারে মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল। টেলিভিশনের পর্দায় সেই অবর্ণনীয় অবস্থার ছবি সেবারই প্রথম দেখা গিয়েছিল। সেই ছবিগুলো পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল এবং ইথিওপিয়ার সরকার সেই ছবিগুলোই ট্রাম্পকার্ড হিসেবে বারবার ব্যবহার করছে। এই ছবির মাধ্যমে ইথিওপিয়াকে একটি প্রতীক বানিয়ে জনমত গঠন করাও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য সহজ হয়েছে।

ড্রেকম্যান ইথিওপিয়ায় সর্বশেষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা লাভ করেন ২০০০ সালে। তখন রাতারাতি টিভির পর্দায় ভেসে উঠছিল আঁতকে ওঠার মতো সব ছবি। আবারও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা গণমাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের উড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে। বিবিসি, রয়টার্স, সিএনএনের মতো বড় বড় গণমাধ্যম সেখান থেকে সংবাদ প্রচার করে। ২০০০ সালে ইথিওপিয়া দ্রুত বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগ তাদের আফ্রিকা প্রতিনিধিদের কাছে টেলিভিশনে দেখা খবরগুলোই সংগ্রহ করার জন্য তাড়া দিতে থাকে। এমনকি হলুদ সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত খবরের কাগজগুলোও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না। ড্রেকম্যান মনে করতে পারেন, তখন প্রকৃতপক্ষে ওগাডেন রাজ্যের ছোট একটি শহর গোদেতে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল। কিন্তু টেলিভিশনগুলোতে সম্প্রচারিত ছবিগুলো এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যে সবার ধারণা হয়েছিল গোটা ইথিওপিয়ার ওপর দুর্ভিক্ষ আঘাত করেছে। প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকেরা দুর্ভিক্ষের একই ছবি প্রচার করছিলেন এবং একই মানুষদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিচ্ছিন্ন ঘটনা পলকেই একটি দেশের ঘটনা বলে সম্প্রচারিত হলো। প্রচার করা হলো, ১০ মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তৎকালীন প্রধান ক্যাথেরিন বার্তিনির কাছেও দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রচারের পুরো বিষয়টা বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। তিনি বার্তাও পাঠিয়েছিলেন যে, দুর্ভিক্ষটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু তার বার্তা অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয় এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে একের পর এক রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই থাকে এবং একটি থেকে আরেকটি রিপোর্টকে আর আলাদা করা সম্ভব হয় না। এআরডির প্রতিনিধি হিসেবে ড্রেকম্যান তাদের সম্পাদকীয় বিভাগের নির্দেশে ইথিওপিয়ায় গিয়ে সেই বিপর্যয়ের ওপর স্টোরি করতে রাজি হননি। কর্তৃপক্ষ সহজেই তারই সহকর্মী হান্স হুবনারকে তার জায়গায় কাজ করতে পাঠিয়ে দেন।

হুবনারের বয়স এখন ৬৩। সেই সময়ে তিনিও ইথিওপিয়ায় পৌঁছে উপলব্ধি করতে পারেন, সেখানে মানুষ অপুষ্টির শিকার, তবে তারা কেউ খাদ্যাভাবে ভুগছে না। তিনি জার্মানির হামবুর্গে একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'তাগেশাও'-এ দুর্ভিক্ষ নিয়ে স্টোরি পাঠান। কিন্তু তার স্টোরিতে নাটকীয় তথ্যের উপস্থাপনা কম থাকায় সেটি ত্রাণ সহায়তা বিষয়ে জনমত তৈরিতে ব্যর্থ হয়। তবে হুবনার মনে করতে পারেন, তার প্রতিবেদনের পাশাপাশি পত্রিকাটি সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রকাশ করে। আর তাতেই চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে তার মতদ্বৈধতা তৈরি হয়।

হুবনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ইথিওপীয় সরকার এবং সেখানকার বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধি ওয়াগদি ওসমান সেবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ওই বছরের এপ্রিল-মে মাসে দুর্ভিক্ষ তীব্র আকার ধারণ করবে। তারা আমাদেরকেও খবর প্রকাশের জন্য তাড়া দেন। তত দিনে ইথিওপিয়ায় লাখ লাখ ডলার এবং খাবার ভর্তি প্যাকেট প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে।

পরিশিষ্ট

আমার পদ্ধতি

লাৎজ মুকি

প্রথম পদক্ষেপ: আমি বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত নথিপত্র এবং বই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমি জানতাম, ইথিওপিয়াবিষয়ক এই স্টোরি বেশ জটিল এবং জড়ো করা সমস্ত তথ্য আমাকে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: সংগৃহীত প্রায় পাহাড়সম নথিপত্র পাঠ করার পর আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করি। ইউরোপের অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ হয়। আমাকে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাদের সবার নাম এখানে প্রকাশ করা যায়নি। কারণ, তাদের সংখ্যা অনেক। লেখায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রদের তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলোই উত্থাপিত হয়েছে। আবার এমন অনেক সূত্র এই স্টোরিতে কথা বলেছে, যাদের পরিচয় আমাকে গোপন রাখতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কূটনীতিক, কেউ ব্যবসায়ী। আবার অনেক ইথিওপীয় নাগরিক নিরাপত্তার কারণে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হননি।

আমি সাধারণত ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে বিষয়টা সম্পর্কে যতটা সম্ভব পাঠ করে নিই এবং কথা বলি বিভিন্ন ধরনের সূত্রের সঙ্গে। এই স্টোরি তৈরি করতে গিয়ে এই কাজে আমার সময় লেগেছে তিন থেকে চার সপ্তাহ। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দবোধ করি না। কারণ, আমি মনে করি, অর্জিত জ্ঞান আমাকে মুক্ত একটি মন, পরিচ্ছন্ন চিন্তার শক্তি আর সজাগ দৃষ্টি অর্জন করতে সাহায্য করে। এই বিষয়গুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রয়োগই হচ্ছে আমাদের কাজের শিল্পিত রূপ।

তৃতীয় পদক্ষেপ: এই স্টোরির কাজে আমার ব্যয় বহন করেছে জার্মানির অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের একটি সংগঠন 'Netzwerk Recherche'। তারা আমাকে কাজের জন্য ১,৫০০ ইউরো দেয়, যা না পেলে এই স্টোরি তৈরি করা সম্ভব হতো না।

যারা বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করেছি। মনে রাখতে হবে, না দেখে এবং না বুঝে কোনো কিছুই বিশ্বাস করা যাবে না। একজন মানুষের ভেতরের অবয়বটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এই কাজের জন্য আমি সাংবাদিক ভিসা এবং যথাযথ অনুমতি না নিয়ে একজন পর্যটক হিসেবে অনেক সময় ভ্রমণ করেছি। স্পর্শকাতর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমি রেকর্ড করেছি। এর মধ্যে দুবার আমাকে পালাতে হয়েছে। একবার আমি একজন ইথিওপীয় নাগরিকের সাক্ষাৎকার নিই। তিনি জার্মানিতে লেখাপড়া করেছেন। ইথিওপিয়ার এই সরকারি কর্মকর্তা জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আমি বোকার মতো তাকে আমার স্টোরির বিষয় বলে ফেলি। শোনার পর ভয়ে সেই ব্যক্তির মুখ সাদা হয়ে যায় এবং তিনি পুলিশ ডাকেন। আমি কোনোমতে সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা দুটি টেপ হোটেলের বাথরুমে পুড়িয়ে ফেলে ব্যাগ নিয়ে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাই। আমি সেদিন একটি গাধায় টানা গাড়িতে লুকিয়ে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাই।

তবে আদ্দিস আবাবায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনৈতিক কার্যালয়ে একজন কূটনীতিকের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম, তা আমার কাছে ছিল খুব মূল্যবান। ইথিওপিয়া ছেড়ে চলে আসার দুদিন আগে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিন সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গায় টানা ভ্রমণ আর স্টোরির গবেষণার কাজ করে আমি তখন ক্লান্ত। কিন্তু সেই কূটনীতিকের কাছ থেকে পাওয়া কিছু স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর কয়েকজন সূত্রের ঠিকানা আমার সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছিল। ভীষণ আনন্দের সেই অনুভূতি পরবর্তী কিছুদিন আমাকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল।

সারমর্ম: স্টোরির জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রেখে বিশ্বাসযোগ্য একজন সূত্রের জন্য সব সময় সন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধানের শুরুটা হবে নথিপত্র পাঠ দিয়ে। তারপর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তাদের কথা

উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখবেন, কোনো কিছু উপলব্ধি না করে এবং না দেখে বিশ্বাস করা যাবে না। পাশাপাশি সামনে উপস্থিত হওয়া যেকোনো ঘটনা বা মানুষের প্রকৃত অস্তিত্বটাকে বুঝতে হবে।

চতুর্থ পদক্ষেপ: গবেষণায় পাওয়া তথ্যের ভার কমাতে হবে।

পঞ্চম পদক্ষেপ: স্টোরি লেখার ঝক্কিটা অনেক বড়। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, সব সময় ঘটনার ভেতরে সেরা চরিত্রটিকে বেছে নিতে হবে। নির্ভর করতে হবে একাগ্র অনুভূতি, বক্তব্য এবং নথিপত্রের ওপর। এই পর্বের পরেই আমি আমার উপসংহারে পৌঁছে যাই এবং ইথিপিয়ায় প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের ওপর স্টোরিটা লিখে ফেলি।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ: আমার সহকর্মীদের সঙ্গে স্টোরি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। সে জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। স্টোরিটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। কিছু বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, রোমে জাতিসংঘ, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কার্যালয় এবং জার্মানিতে ইথিওপিয়ার দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমার প্রকাশক এবং হামবুর্গের দপ্তরে প্রতিবাদলিপি পাঠানো হয়। স্টোরির কয়েকজন পাঠক অভিযোগ করেন, আমি ইথিওপিয়ার মানুষের দুর্ভোগকে অনেকটা আপেক্ষিকভাবে উপস্থাপন করেছি। অন্যদিকে আমি বহু পাঠক এবং ইথিওপিয়ার নাগরিকের বিপুল প্রশংসাও পেয়েছি। ডি সাইথ জার্মানি থেকে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক কাগজ। তারা আমার সঙ্গে থাকায় জার্মানির অনেক সাহায্য সংস্থা বা অন্য কেউ আমার বিরুদ্ধে মামলা করেনি। স্টোরিটি নিয়ে তারা বিতর্কও করেনি। সম্ভবত তারা চায়নি স্টোরিটি নিয়ে সাধারণ মানুষ আলোচনায় জড়িয়ে পড়ুক।

এই স্টোরি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। স্টোরিটি একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, স্টোরিটির রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেশি দূর যেতে পারেনি। দেশটিতে কোনো কিছুই তেমন পাল্টায়নি। যেসব সাহায্য সংস্থা এই ত্রাণ নিয়ে বাণিজ্য করে, তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, সমালোচনা তাদের কাজকে আরও গঠনমূলক করতে সহায়তা করে।

৫

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বায়নের স্থানীয় অবয়ব

১.
অবহেলিত অস্থায়ী শ্রমিক

আলভিন চিয়িংগা

ভূমিকা

কোনো অনুসন্ধানের ফল হতে হবে একটি দীর্ঘ স্টোরি, এমন কোনো অলঙ্ঘনীয় নীতি নেই। জিম্বাবুয়েতে অবস্থিত তামার খনির ওপর আলভিন চিয়িংগার করা স্টোরিতে শব্দসংখ্যা এক হাজারের কম হলেও সেখানে তিনি একটি অমানবিক ব্যবস্থার অন্দরমহলকে উন্মোচন করেছেন। তার স্টোরির মূল নীতি ছিল, একটা দেশে শ্রম আইন খাতাকলমে আছে, কিন্তু তা পড়ে দেখা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারও যে মাথাব্যথা নেই, তা প্রকাশ করা। স্টোরিতে পিরামিডের আকৃতির মতো সরকারের উদাসীনতা ও অকার্যকারিতার চিত্রটি আঁকা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক স্বরে। পরে চিয়িংগার লেখায় এই অনেকটা অবনমিত স্বরভঙ্গিতে আমাদের জানিয়েছে, স্টোরিটা তৈরি করা কতটা কঠিন ছিল।

জাম্বিয়া ডেইলি মেইল
২০ এপ্রিল ২০১০

কিংসলে কাভউইলিকে প্রতিদিন ৪০০ ফুট গভীর তামার খনির সুড়ঙ্গে নেমে কাজ করতে হয়। ভীষণ গরম সেই সুড়ঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি প্রতি মাসে বেতন পান জাম্বিয়ান মুদ্রায় দেড় লাখ কোয়াচা। এই বেতনে একজনের পক্ষেই জীবনধারণ করা কঠিন। কাভউইলির পরিবার আছে।

জাম্বিয়ার শ্রম আইন অনুযায়ী, একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ২ লাখ ৬৮ হাজার ৮০০ কোয়াচা নির্ধারণ করা আছে। এই আইনে প্রত্যেক শ্রমিক মজুরির সঙ্গে পরিবহন ভাতা হিসেবে পাবেন ৮০ হাজার কোয়াচা, দুপুরে খাবারের ভাতা হিসেবে ৭০ হাজার কোয়াচা এবং বাড়িভাড়া হিসেবে পাবেন মূল বেতনের ৩০ শতাংশ। শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবার দিকটি দেখাশোনার দায়িত্ব মালিকপক্ষের। কাভউইলি এসব সুযোগ-সুবিধার কিছুই পান না; কারণ, তিনি একজন 'অস্থায়ী খনি শ্রমিক'। চাকরিদাতার সঙ্গে এসব সুবিধা আদায় অথবা ভালো বেতনের জন্য কোনো ধরনের দর-কষাকষি করার সুযোগ তার নেই।

অন্য নিয়মিত শ্রমিকদের মতো অস্থায়ী শ্রমিকেরা খনি এলাকায় বসবাস করতে পারেন না। তাদের ঠাঁই হয় খনি এলাকার আশপাশে জীর্ণ হয়ে যাওয়া কিছু ঘরবাড়িতে। কাভউইলি বাস করেন লুয়া এলাকার একটি খনির কাছে, ছোট্ট খুপরিতে। অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজ করার সময় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো বিশেষ পোশাক ব্যবহারের অনুমতি নেই। তারা সর্বক্ষণ পেশাগত ঝুঁকির মুখে থাকলেও নেই চিকিৎসা পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা। পেশাগত কারণেই অস্থায়ী খনি শ্রমিকদের নানান ধরনের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে; সেগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ। খনিতে নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এগুলোর প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরে মারাত্মক হয়ে থাকে।

খনিগুলোর দুরবস্থা, দূষণ এবং শ্রমিক শোষণ কিছু মানুষের জীবনকে শুধু কান্নার দিকে ঠেলে দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের সাবেক মন্ত্রী অ্যালিস সিমাঙ্গো তো বিদেশি অর্থায়নের একটি খনিতে শ্রমিকদের ছেঁড়া জামাকাপড়, অভুক্ত মুখ আর কোনো ধরনের নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি ছাড়াই কাজ করতে দেখে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে কেঁদে ফেলেন। তার সহকর্মী শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক উপমন্ত্রী সাইমন কাচিম্বাও একটি বিদেশি মালিকানাধীন ঢালাই কারখানায় শ্রমিকদের কোনো ধরনের দস্তানা এবং বুট জুতা ছাড়াই ভীষণ উত্তপ্ত ঢালাই লোহা নিয়ে কাজ করতে দেখে ভীষণ বিস্মিত হন।

দেশটিতে সরকারের পরেই সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা খনির মালিকেরা। কিন্তু এই খাতে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা কেউ সঠিকভাবে জানে না। ২০০৪ সালে 'ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটি স্টাডিজ' (আইএসএস) নামে একটি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শ্রমিকদের সংখ্যা বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য কাজ করেছিল। তাদের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির খনিশিল্পে ২৯ হাজার ৮৬৮ জন শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অস্থায়ী শ্রমিক।

সেই সময় থেকেই এই অস্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এশিয়ান ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের (এফডিআই) সামাজিক ও আর্থিক প্রভাব বিষয়ে এক প্রতিবেদনে ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাম্বিয়ায় খনিশিল্পের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই খাতে কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের খুবই কম মজুরি দিয়ে থাকে। শ্রমিক নিয়োগে চাকরির যথাযথ বিধানের বাইরে গিয়ে তারা অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে বেশি আগ্রহী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এখানে পেশার গুণগত মান নিচু থাকায় চাকরির মান মোটেও ভদ্রস্থ নয়। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ। নিয়োগকর্তারা এসব বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এ ধরনের শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়া হয় এবং কাজের পরিবেশও ভালো থাকে না।

খনিশিল্প জাম্বিয়ার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জাম্বিয়ার রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। দেশটির মাথাপিছু আয়েরও অর্ধেকটা নির্ভর করে এই খাতের ওপর। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকেও জাম্বিয়ায় খনিশ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো বেশ শক্তিশালী ছিল। রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি শক্তি হিসেবে তাদের উত্থান ঘটেছিল এবং তারা রাজনৈতিক মহলে প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ ছিল। রিপাবলিকান শিবিরের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ড. ফ্রেডারিক চিলুবা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর তার প্রভাবের কারণেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

জাম্বিয়ায় ২০০০ সালে খনিশিল্পের বেসরকারীকরণের ফলে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে। চীনের অনেকগুলো কোম্পানি এখানে এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে। এই কোম্পানিগুলোর অনেকগুলোই অস্থায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে চাম্বিশি এলাকায় একটি বিদেশি কোম্পানির কথা উল্লেখ করা যায় (সম্পাদক কোম্পানিটির নাম স্টোরিতে ব্যবহার করতে দেননি)। আইএসএসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে ১৮০০ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। বিপরীতে সেখানে মাত্র ৭১ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। অন্যদিকে বহু আগে প্রতিষ্ঠিত কনকোলা তামার খনিতে মোট ১৬ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৬ হাজার শ্রমিক অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। একজন শ্রমিক কাভউইলির এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেও তার সহকর্মী ব্রায়ান লুন্ডে তাদের খারাপ অবস্থার জন্য খোলাখুলিভাবে কর্তৃপক্ষকেই দোষারোপ করলেন। তিনি বলেন, "নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের কোনো প্রতিনিধিও নেই।"

লুন্ডের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। কারণ, শ্রমিকদের অবস্থা দেখার জন্য অবশ্যই কর্তৃপক্ষের দিক থেকে ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ, এই অস্থায়ী শ্রমিকেরাও জাম্বিয়ার আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এই আইনে বলা আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন শ্রমিক তিন মাস কাজ করার পর অবশ্যই তাকে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে।

কর্তৃপক্ষের দিক থেকে উদাসীনতার কারণেই জাম্বিয়াতে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জ্যেষ্ঠ শ্রম ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা চিকুলা চিনিয়ান্তাও একমত যে দুর্বল তদারকি ব্যবস্থার কারণে এ রকম অবস্থা তৈরি হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও জানান, মন্ত্রণালয় যখন জানতে পারল যে কোম্পানিগুলো অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ করছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে আঁতাত করা হলো। তিনি বলেন, "এখন পর্যন্ত আমরা আইন ভঙ্গের জন্য কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারিনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতে এ-সংক্রান্ত মামলায় হেরে গেলে তারা মামলার ব্যয়ভার পরিশোধ করতেও আগ্রহী হয় না।"

মাইন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অব জাম্বিয়ার (এমইউজে) সভাপতি রেফোর্ড মবুলু বলেন, "বেশির ভাগ অস্থায়ী শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত নন বলে তাদের দাবিদাওয়ায় সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। তা ছাড়া বেশির ভাগ চীনা কর্তৃপক্ষ এমইউজেকে স্বীকার করে না। আমাদের সংগঠন অস্থায়ী শ্রমিকদের ইস্যুটি আদালতে নিয়ে গেছে এবং মামলায় বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টায়নি।"

যখন কাভউইলি, ব্রায়ান লুন্ডে অথবা তাদের মতো আরও অনেক অস্থায়ী শ্রমিক সামান্য মজুরির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তখন তাদের নিয়োগকর্তারা জাম্বিয়া থেকে লাভের মোটা অঙ্ক নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। জাম্বিয়ায় খনিশিল্পে শোষণ বন্ধ করতে শুধু শ্রমিক সংগঠনগুলো একা কাজ করে কোনো সমাধান টানতে পারবে না।

পরিশিষ্ট

আলভিন চিয়িংগা

অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথ বেয়ে জাম্বিয়ার খনিশিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার এই স্টোরি বিকশিত হতে শুরু করে। আমি যে ভাবনা থেকে স্টোরির কাজ শুরু করেছিলাম, তা দিয়েই স্টোরি শেষ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মনে হয়েছে, কখনো আমি জাম্বিয়ার খনিগুলোতে অস্থায়ী শ্রমিকদের পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি।

আমি স্টোরি নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি খনি অথবা তার আশপাশের এলাকায় ভ্রমণের সময়। মনে হয়েছিল, সেখান থেকে অস্থায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব। ভুক্তভোগী মানুষদের যত কাছে যেতে পারব, আমার পক্ষে বিষয়টা বুঝতে পারা তত সহজ হবে। তাই আমার কাজের সূচনা হয় মনুষ্য সূত্র ব্যবহার করে। একটি স্টোরির কাজ শুরু করার আগে আপনারও উচিত সূত্র এবং এলাকা নির্দিষ্ট করে ফেলা।

আমি খনি এলাকায় যাই একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে কাজ খোঁজার জন্য। আমার এই ছদ্মবেশ আমাকে খনির অন্দরমহলে প্রবেশের কাজটা সহজ করে দেয়। ওই এলাকায় ঢুকে শ্রমিকেরা কতটা অসহনীয় পরিস্থিতিতে কাজ করে, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তবে কয়েক দিন ধরে লাগাতার কাজ খোঁজার পর কাজের প্রস্তাব পেয়েও আমি তা নিচ্ছি না দেখে সেখানকার নিয়োগদাতাদের কারও কারও মনে প্রশ্নের উদয় হয়।

আমি ইন্টারনেটে এই অস্থায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে কিছু তথ্য পেয়েছি। সুশীল সমাজের কিছু কিছু সংগঠন এশিয়া থেকে আসা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে। প্রকৃতপক্ষে জাম্বিয়ায় তথ্য পাওয়া বেশ কঠিন বিষয়। বিশেষ করে সেসব তথ্য যদি সরকারের সমালোচনামূলক হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ, মানুষ ভয় পায় সরকারকে। দেশটিতে তথ্যের স্বাধীনতাবিষয়ক কোনো আইনের অস্তিত্বও নেই। তবে ইতিবাচক একটি খবর হচ্ছে, এ ধরনের একটি আইন তাদের সংসদে অনুমোদন পেতে যাচ্ছে।

যেসব জায়গায় সহজে তথ্য পাওয়া যাবে বলে ধরে নিয়েছি, সেখানেই তথ্য পাওয়ার কাজটা কঠিন হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় খোদ শ্রম মন্ত্রণালয়ের কথা। তারা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, তাদের তথ্য সংগ্রহের উৎস খুবই সীমিত। তাই তারা আমাকে তথ্য সরবরাহ করতে পারছে না।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তথ্য সংগ্রহে আমার সমস্যার মূল কারণ ছিল চীনারা। কারণ, যেসব খনিতে অস্থায়ী শ্রমিক বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়, সেগুলোর কর্তৃত্ব চীনাদের হাতে। জাম্বিয়ায় চীনের যেকোনো প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারের ঢালাও সমর্থন রয়েছে। তাই এদের বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেও সরকারি মহল থেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, কাজ শুরু করার আগে নিজের কাছে থাকা উপাত্ত গুছিয়ে নেওয়া ভালো। কারণ, এই কাজে অনেক সময় ব্যয় হয়। গোছানোর কাজটা আগে থেকে না করলে শেষে গিয়ে আপনার কাছে থাকা তথ্যের কোনটা ভুলে বাদ পড়বে অথবা ভুল জায়গায় ব্যবহৃত হবে তাড়াহুড়ার কারণে।

স্টোরি আমি সব সময় বিশদ বিবরণ দিয়ে লিখতে আগ্রহী। কারণ, তাতে করে প্রথম অনুচ্ছেদেই বোঝা যায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিক কী বলতে চাইছেন। সব তথ্য খুব পরিষ্কার এবং সহজভাবে উপস্থাপন শুধু লেখককে সুবিধা দেয় তা-ই নয়, পাঠকও খুব সহজেই বুঝতে পারেন, স্টোরিটি কী জানাতে চাইছে। আমি মনে করি, নিজের চিন্তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে বাক্যের গঠন ছোট হওয়া উচিত।

স্টোরিটি বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) থেকে জানায়, তারা ভবিষ্যতে অস্থায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া খনিমালিকদের ওপর দৃষ্টি রাখবে। বহু পাঠকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ প্রশংসা পেয়েছি এই স্টোরির জন্য। তারা পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এই স্টোরি আসলে পানির নিচে ডুবে থাকা বিশাল বরফখণ্ডের অগ্রভাগ মাত্র।

কিছু চীনা খনিমালিক স্টোরিতে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে বিশেষ করে চীনা মালিকানাধীন জাম্বিয়ার খনিগুলোর বিষয়ে বিশদ তথ্য ছিল। তবে সব সময় অঙ্কবাচক সংখ্যার ক্ষেত্রে বারবার যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আপনি কখনো ভুল তথ্য ব্যবহার করতেও পারেন।

আমি এই স্টোরির পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আরেকটি স্টোরি করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু জাম্বিয়ায় বসে এ রকম স্টোরির জন্য অর্থায়ন জোগাড় করা খুব সহজ নয়। আমি একটি সরকারি পত্রিকার জন্য কাজ করি। তারা এ ধরনের অনুসন্ধানী কাজে খুব বেশি সহায়তা দেয় না। তবে আশা করেছিলাম, আইএলও হয়তো আমাকে পরবর্তী কাজে সহায়তা দেবে। কারণ, শ্রমবিষয়ক কাজে সহায়তা করার সামর্থ্য তাদের আছে।

২.
একটি নৈতিক প্রশ্ন: লুন্ডবেকের চিঠি

অ্যান লিয়া ল্যান্ডস্টেড

ভূমিকা

ওষুধশিল্পের মতো আর কোনো শিল্প পৃথিবীতে এতটা নিয়ন্ত্রিত নয়। আর কোনো শিল্প ওষুধশিল্পের মতো কলঙ্কে জর্জরিতও নয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নিয়ন্ত্রক সালিশ। যেকোনো ব্যবসার জন্য এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি উপযোগী আইনি পরিবেশ খুঁজে নেওয়া হয়। বিষয়টা কখনো শ্রম আইন, অথবা পরিবেশবিষয়ক বিধি, অথবা এ স্টোরির ক্ষেত্রে যেমন, কীভাবে ওষুধ অনুমোদন লাভ করে এবং বাজারে বিজ্ঞাপিত হয়। এখানে, একটি কোম্পানি এমন একটি ওষুধ দূরের একটি দেশে বিক্রির চেষ্টা করছে, যা তাদের নিজ দেশেই অনুমোদন পায়নি। অ্যান লিয়া ল্যান্ডস্টেডের লেখার বিদ্রূপাত্মক শেষ লাইনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এ ধরনের ঘটনা আগে বা এখন নতুন কোনো বিষয় নয়। একজন সাংবাদিক পেশায় সক্রিয় থাকা অবস্থায় এ ধরনের একটি স্টোরি করার সুযোগ পায়। ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ডেনমার্কের সাংবাদিকতার অধ্যাপক এবং সক্রিয় সাংবাদিক ল্যান্ডস্টেড সে কাজটি সুচারুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। এই স্টোরিতে ওষুধ ক্ষতিকর চরিত্রে আবির্ভূত হয়নি। এখানে যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, তা হচ্ছে এই পণ্য শ্রীলঙ্কায় সংশ্লিষ্ট দক্ষ ব্যক্তিদের কাছে অননুমোদিত হয়েও কীভাবে সেখানকার বাজারে প্রবেশ করল।

স্টোরিটি প্রকাশিত হওয়ার পর দৃশ্যপট বদলে যায়। লুন্ডবেক কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুল সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ওষুধ ল্যান্ডস্টেড কখনোই প্রত্যাখ্যান করেননি। তার লক্ষ্য ছিল কোন প্রক্রিয়ায় এটি বাজারজাতকরণ হলো তা প্রকাশ করা। ল্যান্ডস্টেড প্রকৃতপক্ষে ধনী ও দরিদ্র দেশের চিকিৎসা পদ্ধতির সংযোগের অন্তর্নিহিত জায়গাটি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তার স্টোরিতে। আমাদের সামনে একটি ব্যবস্থার ভেতরের কলকবজাগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। এখানে লক্ষ রাখতে হবে, স্টোরিতে তিনি নিয়ন্ত্রণবিধির মতো অন্যান্য জটিল বিষয়কে সহজে বোঝানোর জন্য সংলাপধর্মী স্টাইল বেছে নিয়েছেন। এই স্টাইলের মাধ্যমে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। শ্রীলঙ্কার যে যে নাগরিকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন, তাদের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন স্টোরিতে। এই সাক্ষাৎগুলো আপনাদের এ-ও জানায়, দেশটি কীভাবে চলে...

শিপ্লায়েস্কে
(দ্য নার্স ডেনমার্ক) ২১ মে, ২০০২

এখানে বিষয়বস্তু নৈতিকতা অথবা তার অভাব। ডেনমার্কের একটি বৃহৎ এবং প্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মানতেই পারেনি যে বিষণ্নতা এবং মৃদু মনোবৈকল্যেও চিকিৎসায় তাদের একটি কম্বিনেশন ওষুধ অনুমোদনের আবেদন উন্নয়নশীল একটি দেশ কর্তৃপক্ষ দু-দুবার নাকচ করে দেবে। ওষুধটি বিক্রির জন্য নিবন্ধিত ছিল না। অর্থাৎ সেটা ডেনমার্কেই ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ছিল না।

সেই ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম 'এইচ লুন্ডবেক এ/এস। তাদের তৈরি ওষুধটির নাম ডিনজিট। এই ওষুধ শ্রীলঙ্কা বাতিল করে দিলেও পরে তা অনুমোদন দেয়। দ্য নার্স পত্রিকা এ বিষয়ে সব নথিপত্র পরীক্ষা করেছে এবং লুন্ডবেকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যে সাতজন

মনোবিজ্ঞানী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন (যে বৈঠকে ওষুধটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পাওয়ার কথা) তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এই সাত মনোবিজ্ঞানী শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ওষুধটির জন্য অনুমোদন প্রার্থনা করেন। তবে জানা যায়, এদের মধ্যে অন্তত দুজন বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, তারা কেউই জানতেন না ওই ওষুধ ডেনমার্কে নিবন্ধিত নয় এবং শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে দুবার ওষুধটির অনুমোদনের জন্য আবেদন বাতিল হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী মনোবিজ্ঞানী ড. হেমামালি পেরেরা আগেরবার শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বাতিলের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ওই বৈঠকে লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। তাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি ক্ষিপ্ত হন। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি বলেন, “যা ঘটেছে তা অগ্রাহ্য করে ওষুধটি যদি নিবন্ধিত হয়ে যায়, তাহলে তো আমার কাজের কোনো অর্থ থাকে না।”

অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত দেশগুলোর ওপর ভরসা

এই স্টোরির সূচনা হয় ১৯৯৭ সালের ২ মার্চ। এই দিন শ্রীলঙ্কার ‘ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটির (এসএল ডিআরএ) কাছে ডেনমার্কের ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি লুন্ডবেক তাদের তৈরি ‘ডিনজিট’ নামে একটি ওষুধ অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র পাঠায়। বিষয়টি নতুন কিছু নয়। এই কোম্পানির বেশ কয়েকটি ওষুধ আগে থেকেই শ্রীলঙ্কায় পরিচিত। কিন্তু ডিনজিট ‘ফ্লুপেনথিসল এবং মেলিট্রাসেন নামের দুটি উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি বলে এর বিষয়টা ছিল আলাদা। ফ্লুপেনথিসল উপাদানটি মানসিক রোগের চিকিৎসায় পরিচিত উপাদান হলেও মেলিট্রাসেন তা নয়।

লুন্ডবেকের আবেদনের সঙ্গে আরও দুটি নথি শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল ওষুধ প্রস্তুতকারক হিসেবে লুন্ডবেক কোম্পানির অনুমোদনপত্র এবং অন্যটি ডিনজিট রপ্তানি করার জন্য প্রত্যয়নপত্র। তাদের পাঠানো আবেদনের সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরেকটি চিঠিতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল ডিনজিট ডেনমার্কসহ আরও ২০টি দেশে নিবন্ধিত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ এ ধরনের একটি সংমিশ্রিত ওষুধের অনুমোদনের বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা ধনী দেশ নয় এবং ওষুধের মান পরীক্ষার জন্য তাদের কাছে যথাযথ যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ফলে তখন একরকম বাধ্য হয়েই তাদেরকে ওষুধের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা আছে এমন দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। এই দেশগুলোর তালিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত। এই ওষুধ যদি তালিকাভুক্ত যেকোনো একটি দেশে বিক্রির জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকে এবং তাদের কাছে বিক্রির অনুমোদনপত্র থাকে, তাহলে সংমিশ্রিত ওষুধ হলেও তা শ্রীলঙ্কায় বাজারজাতকরণে কোনো বাধা নেই।

ডেনমার্কেই বাজারজাত করা হয়নি

মজার বিষয় হচ্ছে, ডিনজিট ওষুধটি কিন্তু তালিকাভুক্ত দেশগুলোর কাছ থেকে কোনো অনুমোদন পায়নি। ফলে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই শ্রীলঙ্কাও প্রথমবারের মতো এই ওষুধের অনুমোদনের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। সেখানকার ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ড্রাগ ইভ্যালুয়েশন সাব-কমিটির (ডিইএসসি) সাবেক সচিব ডা. ক্রিস উইরাসুরিয়া বলেন, “আমরা প্রথমেই দেখি ফ্লুপেনথিসল ও মেলিট্রাসেন অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত দেশগুলোর তালিকায় আছে কি না। আমরা জানতে পারি, ফ্লুপেনথিসল শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশে একটি একক উপাদান হিসেবে নিবন্ধিত। কিন্তু মেলিট্রাসেন কোনো আলাদা ট্যাবলেট অথবা ফ্লুপেনথিসলের সঙ্গে সংমিশ্রিত উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। তাই একটি জানা উপাদানের সঙ্গে আরেকটি অজানা উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি ওষুধ আমরা বাতিল করে দিই। এখানে উল্লেখ্য, এই ওষুধ অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত কোনো দেশেও বাজারজাত করা হয়নি।” ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকাতেই ক্রিস খারিজ করে দেন লুন্ডবেকের আবেদন।

আবেদন খারিজ হওয়ার পর লুন্ডবেক শ্রীলঙ্কার কাছে ২৫টি দেশের একটি তালিকা পাঠায়, যেখানে ১৯৯৭ সাল থেকে ডিনজিট অনুমোদিত। তবে ওই ২৫ দেশের তালিকায় ডেনমার্কের নাম ছিল না। লুন্ডবেকের খাতাকলমে এই ওষুধ ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত। কিন্তু তা আবার ১৯৯৭ সালে এসে নিবন্ধন তালিকার বাইরে কীভাবে চলে গেল, বিষয়টা বোধগম্য নয়।

ডেনমার্কের মেডিসিন এজেন্সির ওষুধ অনুমোদন বিভাগের প্রধান পের হেলবো বলেন, "লুন্ডবেক কখনোই অভ্যন্তরীণ বাজারে ওষুধ হিসেবে ডিনজিট অনুমোদনের জন্য আবেদন করেনি। শুধু তথাকথিত রপ্তানি খাতায় ওষুধটির নাম ছিল। তাই ১৯৯৩ সালে ওষুধটি ডেনমার্কে বিক্রির অনুমোদন পায়নি। শুধু রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুমোদন ছিল। ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের কঠোরতা কম থাকলেও ডেনমার্কে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি।" তিনি জানান, ওষুধ রপ্তানি করার ক্ষেত্রে প্রধানত দেখা হয়, যথাযথ উপাদানের উপস্থিতি এবং সন্তোষজনক পরিবেশে ওষুধ তৈরি করা হয়েছে কি না।

হেলবোর কাছে প্রশ্ন ছিল, ডেনমার্কে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে উৎপাদকদের কাছে তাদের কী কী দাবি থাকে? উত্তরে তিনি বলেন, "নতুন ওষুধের ক্ষেত্রে আমাদের দাবিগুলো বেশ কঠোর। আমরা ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিশদ নথিপত্র দাবি করি।"

ডেনমার্কে অবস্থিত লুন্ডবেকের দপ্তর থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান কখনোই ডেনমার্কে ডিনজিট ওষুধটির জন্য অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা করেনি। কারণ, ডেনমার্কে ওষুধ-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ সংমিশ্রিত ওষুধের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল।

শ্রীলঙ্কাও এ ধরনের সংমিশ্রিত ওষুধের ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে থাকে। কিন্তু ডেনমার্কের এই ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি তাদের উৎপাদিত ডিনজিট শ্রীলঙ্কার বাজারে নিবন্ধনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯৭ সালে কোম্পানিটি আবারও শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের আবেদন পুনর্বিবেচনা করার জন্য চিঠি পাঠায়। সেই চিঠির সঙ্গে তারা ডিনজিটের ওপর তৈরি করা একটি প্রতিবেদনও যুক্ত করে দেয়। ওই প্রতিবেদন তৈরি করেন লুন্ডবেকের ফার্মাসিস্ট এবং মেডিকেল ব্যবস্থাপক ইয়োর্গেন নাইবো অ্যান্ডারসন। সেখানে একটি বিশদ কারিগরি ব্যাখ্যা দেওয়া থাকলেও ওষুধটির প্রায়োগিক পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো মূল্যায়ন উল্লেখ করা ছিল না। ৯ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে ৪১টি উদ্ধৃতি দিয়ে একটি দীর্ঘ পাদটীকাও সংযুক্ত ছিল। উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে ১৪টি ছিল ১৯৭০ সালের এবং ২৪টি ছিল আশির দশকের শুরু অথবা মধ্যবর্তী সময়ের। মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি ছিল নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের। দুটি উদ্ধৃতি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় একটি বক্তৃতা থেকে ব্যবহার করা হয়। আরেকটি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কোপেনহেগেনে একটি বিজ্ঞানবিষয়ক সভার পোস্টার।

অধ্যাপক উইরাসুরিয়া সেই প্রতিবেদন বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "তারা যেসব নথিপত্র আবেদনের সঙ্গে পাঠিয়েছিল, সেগুলো কোনো বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। ফলে সেগুলো তাদের পাঠানো দরখাস্তকে সমর্থন জোগাতে পারেনি। পাশাপাশি নথিগুলোর এক-তৃতীয়াংশই ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে জার্মান ও ফরাসি ভাষায় লেখা। ফলে সেগুলো কার্যকারিতা হারায়। কিন্তু তারপরেও আমরা লুন্ডবেক কোম্পানিকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখি এবং একজন মনোবিজ্ঞানীকে গোটা বিষয়টা পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করি।"

১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় দফায় ডিনজিটের অনুমোদন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখানের কারণগুলো ছিল:

১. সংমিশ্রিত উপাদানে তৈরি ট্যাবলেটের কার্যকারিতা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাত্রা পরীক্ষা করা কঠিন।

২. ওষুধটি একেবারেই নতুন ও অজানা।

৩. ডিনজিট যে ধরনের রোগ সারানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে ধরনের প্রচুর ওষুধ শ্রীলঙ্কায় আছে।

৪. ডিনজিটের কার্যকারিতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এই পর্যায়ে এসে স্টোরিটি শেষ হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি।

শ্রীলঙ্কা, জানুয়ারি ১৯৯৯

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর পাঁচতারা তাজ সমুদ্র হোটেল থেকে ভারত মহাসাগরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এখানে বসে কোনো সন্ধ্যাবেলা কেউ চমৎকার সূর্যাস্ত দেখতে পারেন। হোটেলের বিশাল দেয়াল এবং বড় বড় গাছ সামনের রাস্তা থেকে হোটেলটিকে আড়ালে রেখেছে। হোটেলের ঢোকার সব পথে রয়েছে কড়া পাহারা। বাইরেও রয়েছে সেনা টহল।

অবস্থান এবং কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের সভা এবং ব্যবসায়িক বৈঠকের জন্য হোটেলটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে লুন্ডবেক একটি বৈঠকের আয়োজন করে এই হোটেলে। সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় শ্রীলঙ্কার সাত প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীকে।

ওই বৈঠকের পর লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটির কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। বিগত দুই বছরে ডিনজিট ওষুধটির অনুমোদনের জন্য তাদের লাগাতার ব্যর্থ চেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়। চিঠিতে তাজ সমুদ্র হোটেলে বৈঠকের উল্লেখ করে বলা হয়, "লুন্ডবেকের মেডিকেল ব্যবস্থাপক ইয়োর্গেন নাইবো অ্যান্ডারসন সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় এসেছিলেন। সেখানে তিনি শ্রীলঙ্কার কয়েকজন উপদেষ্টা মনোচিকিৎসকের সঙ্গে 'মিক্সড অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন ডিজঅর্ডার এবং এই রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ডিনজিটের কার্যকারিতা বিষয়ে এক খোলামেলা মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।" চিঠিতে সাত মনোবিজ্ঞানীর নামও উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে চার নম্বর বিষয়ে এসে লেখা হয়, মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ছিল খুবই ফলপ্রসূ এবং ইতিবাচক। তারা মৃদু থেকে মাঝারি পর্যায়ে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার রোগীদের জন্য ডিনজিটকে একটি কার্যকর ওষুধ হিসেবে সেখানে স্বীকৃতি দেন।

লুন্ডবেক কর্তৃপক্ষ আরেকটি কাজ করে। তারা চারজন মনোচিকিৎসকের ডিনজিটের প্রতি সমর্থনের ঘোষণাটি হাতে লিখে এই চিঠির সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। তিনটি ঘোষণা তারা জানুয়ারি মাসের বৈঠকের আগেই নিশ্চিত করে ফেলে। ঘোষণাপত্রটি পাঠ করলে যে কারও মনে হবে, এটা একজন ব্যক্তির নির্দেশনা মোতাবেক লেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: ডিনজিটের কার্যকারিতার বিশদ বিবরণ পাঠ করে উপলব্ধ হয়েছেন মনোচিকিৎসকেরা। তারা এই ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখতে পারেন। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, ওষুধটি নথিবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুমোদন লাভের জন্য বিবেচিত হতে পারে।"

সমর্থনের চতুর্থ ঘোষণাটি সংগ্রহ করা হয় ১৯৯৯ সালের ১২ জানুয়ারি; ইয়োর্গেন নাইবো অ্যান্ডারসন তার কয়েক দিন আগে শ্রীলঙ্কা ঘুরে যান। এই ঘোষণাপত্রের ভাষা অন্যগুলোর থেকে খানিকটা আলাদা হলেও বিষয়বস্তু ছিল একই।

চিঠির পাঁচ নম্বর বিষয়ে লেখা হয়েছে, ওই তিন মনোচিকিৎসককে বলা হলে তারা প্রকাশ্যেই এই ওষুধের বিষয়ে মৌখিক সমর্থন দিতে রাজি আছেন।

চিঠির ছয় নম্বর বিষয়ে এসে কেন মনোচিকিৎসকেরা উদ্বেগ ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত একজন রোগীর চিকিৎসায় ডিনজিট ব্যবহার করবেন, তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে ওষুধটির কার্যকারিতা সর্বজনবিদিত। চিঠির শেষে বলা হয়েছে, "এই আলোকে আমরা আস্থাশীল যে আপনারা ওষুধটির নিবন্ধনের জন্য সমর্থন জানাবেন।" চিঠিতে স্বাক্ষর করেন শ্রীলঙ্কায় লুন্ডবেকের প্রতিনিধি (তার নাম এখানে উল্লেখ করা হলো না)। চিঠিটি ২০ জানুয়ারি গ্রহণ করে শ্রীলঙ্কার 'ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি'।

লুন্ডবেক কর্তৃপক্ষের পাঠানো চিঠির দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়। চিঠির বিষয়বস্তু হুবহু এক হলেও দেখা যায়, একটি চিঠি দাপ্তরিক প্যাডে লেখা হয়নি। আরেকটি চিঠি অবশ্য শ্রীলঙ্কায় কোম্পানি প্রতিনিধির দাপ্তরিক প্যাডেই লেখা। শ্রীলঙ্কায় লুন্ডবেকের স্থানীয় প্রতিনিধির দপ্তরের একজন কর্মী জানান, চিঠিটি তাদের প্রধানের লেখা। লুন্ডবেক অবশ্য এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে জানায়, চিঠিটি ডেনমার্কে প্রধান কার্যালয় ও শ্রীলঙ্কায় তাদের স্থানীয় দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে লেখা হয়েছে। লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ওই বৈঠকে মোট ১০ জন মনোচিকিৎসক যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সাতজন ওষুধটির পক্ষে সুপারিশ করেন।

এ ঘটনার পাঁচ দিন পর ডা. উইরাসুরিয়া দেখতে পান, শ্রীলঙ্কায় ডিনজিট বিক্রি হচ্ছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমার মনে প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি তৈরি হয়। আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করে ডিনজিট অনুমোদন না দেওয়ার পক্ষে মত দিলেও তারা ঠিকই পেছনের দরজা দিয়ে নিবন্ধন জোগাড় করে ফেলেছে।" তার ধারণা, ওই সাত চিকিৎসকের ঘোষণাপত্রই শ্রীলঙ্কার 'ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটির' মত পরিবর্তন করে দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কা, ডিসেম্বর ২০০১

কলম্বো শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে অবস্থিত বরেলা কবরস্থানটি প্রাকৃতিকভাবে খুব শান্ত ও নিরিবিলি জায়গায়। তার পাশেই মানসিক ভারসাম্যহীনদের জন্য শাহানায়া নামে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার ও পরামর্শ কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রটির চারপাশ ঘিরে গলফ খেলার বিশাল

মাঠ। কেন্দ্রের প্রধান ডা. নালাকা মেন্ডিজ জানান, "প্রথমে এই মাঠে খেলতে আসা মানুষেরা আমাদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি। তারা আমাদের এখান থেকে উৎখাত করার জন্য শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের উত্তর ছিল, 'এখানে থাকা না থাকার বিষয়টা তাদের একান্ত নিজস্ব। এখানে আমার কিছু বলার নেই।' তারপর থেকে আমরা এখানে টিকে আছি। তারাও আমাদের উপস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।"

সাহানায়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। এখানে বিনা খরচে পানাসক্ত এবং বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত মানুষদের সহায়তা দেওয়া হয়। সাহানায়ায় গবেষণার পাশাপাশি চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। বেসরকারি অনুদান নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান বেঁচে আছে। প্রতিষ্ঠানের সব কর্মচারী এখানে বিনা বেতনে কাজ করেন। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক নালাকা মেন্ডিজ এখান থেকে কোনো বেতন নেন না। লুন্ডবেক ফাউন্ডেশন এখানে বিনা পয়সায় ওষুধ সরবরাহ করে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্র ও পুস্তিকা মুদ্রণে সহায়তা দেয়।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে হোটেল তাজ সমুদ্রে বৈঠকে উপস্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই নালাকা মেন্ডিজ। পরে লুন্ডবেক থেকে শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো চিঠিতেও এই অধ্যাপকের নাম প্রকাশিত হয়। তিনি তার অফিসে আমাকে সময় দেন। ছোট অফিস ঘরে একটা ফ্যান চলছিল এবং খোলা জানালা দিয়ে ছোট ছোট পাখির ডাক আর মাঝেমধ্যে কাকের কর্কশ ডাক ভেসে আসছিল। অফিসে বসে নালাকা মেন্ডিজ আমাকে বলেন, "যত দূর মনে পড়ে, আমি ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না। খুব কমসংখ্যক মানুষ সেখানে আমন্ত্রিত হন এবং তারা ডিনজিট নামক ওষুধটি শ্রীলঙ্কায় অনুমোদনের বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিল। কিন্তু আমার জানামতে, অনুমোদনের বিষয়ে তাদের কিছু সমস্যা ছিল। তবে সে বিষয়ে বিশদ কিছু জানতাম না এবং এই ওষুধের নাম আমি কখনোই ব্যবস্থাপত্রে লিখিনি।"

কেন এই ওষুধ রোগীকে সুরারিশ করেন না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে সংমিশ্রিত উপাদানের ওষুধ পছন্দ করি না। ডিনজিট ওষুধটি আমার খুব পরিচিত নয় এবং কেউ আমাকে এখন পর্যন্ত এই ওষুধের কার্যকারিতা বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেনি। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, আমি বলব, এই ওষুধ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই।"

আমি তখন তাকে লুন্ডবেকের চিঠির কিছু অংশ উচ্চ স্বরে পাঠ করে শোনাই। চিঠিতে লেখা ছিল, "এখানে উল্লিখিত মনোচিকিৎসকদের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই ইতিবাচক এবং আশাব্যঞ্জক। তারা সবাই একমত যে ডিনজিটের মতো সংমিশ্রিত উপাদানের একটি ওষুধ মৃদু অথবা মাঝারি মানসিক ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় খুবই কার্যকর।" সেই তালিকায় নালাকার নাম ছিল।

চিঠি পড়ার সময় তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "না না, কথাগুলো সত্য নয়। আমি কখনোই এ ধরনের মন্তব্য করিনি। আমি এই ওষুধ সম্পর্কে কিছুই জানি না। না জেনে আমি কখনোই এ রকম সুপারিশ করতে পারি না।"

কথা বলতে বলতে আমাদের জন্য চা এলো। তিনি আমাকে ডে-কেয়ার সেন্টার ঘুরিয়ে দেখালেন। সেখানে জাপানের অর্থ সহায়তায় একটি ছোট রান্নাঘর, একটি কারখানা এবং গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। রান্নাঘর থেকে রান্না করা খাবারের গন্ধ ভেসে আসছিল। আমার আসা উপলক্ষে সেখানকার নারী কর্মচারীরা প্রথা অনুযায়ী একটি পানিভর্তি পাত্রে ফুল সাজিয়ে রেখেছিল। দিনের বেলা যে রোগীরা সেন্টারে থাকে, তারা সবাই গাছের তলায় পাতা একটি ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসেছিল।

ডিনজিটের নিবন্ধনের জন্য লুন্ডবেক তার নাম ব্যবহার করেছে দেখে নালাকা মেন্ডিজ বেশ ভয় পেয়ে যান। তিনি বলেন, "যখন কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট ওষুধের অনুমোদন পাওয়ার জন্য আমার সুপারিশ চায়, আমি তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে বলি। কারণ, একটি ওষুধ অনুমোদন পাবে কি পাবে না, তা নির্ধারণ করবে তারাই। একটি ওষুধ সম্পর্কে না জেনে আমি কখনোই কোনো মতপ্রকাশ করি না।"

লুন্ডবেকের সেই তালিকায় চতুর্থ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন একজন নারী। তার নাম ডা. কে. জে. এম. পি ফার্নান্দো। কলম্বো থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে নিগম্বোতে নিজের বাড়িতে তার একটি ছোট ক্লিনিক রয়েছে। তার বাসার নাম 'ম্যাডোনা'। এলাকায় তিনি 'লেডি ডক্টর' হিসেবে বেশি পরিচিত। খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের বয়স্ক ডা. ফার্নান্দোর মনোচিকিৎসায় অভিজ্ঞতার ঝুলিটা অনেক গভীর। তিনি দীর্ঘকাল ইংল্যান্ডে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি নিজের দেশে ফিরে আসেন।

তিনি আমাকে বলেন, "বেশ কয়েকবার লুন্ডবেক কোম্পানির প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তারা চাইত, আমি রোগীদের যেন ডিনজিট সুপারিশ করি। কয়েকবার ওষুধটি আমি ব্যবস্থাপত্রে লিখেছিও। কিন্তু রোগীদের কাছ থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। তারা এই ওষুধ খেয়ে নিজেদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন টের পাননি।"

তার কাছে লুন্ডবেকের প্রতিনিধি প্রথমবার উপস্থিত হন বছরখানেক আগে। তারপর থেকে তাদের আসা-যাওয়া বাড়তে থাকে। সব মিলিয়ে তার বাড়িতে তিনজন প্রতিনিধি আলাদাভাবে উপস্থিত হন। এই মনোচিকিৎসক বলেন, "তারা আমাকে দিয়ে ডিনজিটের বিপণন করাতে চেয়েছে। ওই প্রতিনিধিরা আমাকে বলেছে, কলম্বোতে আমার সহকর্মীরা এই ওষুধ ব্যবহার করে ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। শেষবার তারা এখানে এসে আমাকে বলেছে, ওষুধের কার্যকারিতা বিষয়ে কোনো মতামত দেওয়ার আগে আমি যেন এক মাসের জন্য ওষুধটি রোগীদের জন্য সুপারিশ করি। আমি এখন তাই করছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি ডিনজিট ওষুধটি পছন্দ করি না। আমার মনে হয়েছে, তারা এ ব্যাপারে আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করছে।" তিনি বলেন, "সব ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির আচরণ একই রকম। তারা সবাইকে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বেড়ায়। লুন্ডবেকও এর ব্যতিক্রম নয়।"

তাকে লুন্ডবেকের চিঠিটা পাঠ করতে দিলে তিনি ড্রয়ার থেকে চশমা বের করে চিঠিটা পড়তে শুরু করেন। মজার বিষয় হচ্ছে, তিনিও এই চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। চিঠিতে নিজের নাম দেখে স্পষ্টভাবেই বলেন, "আমি ওই বৈঠকে কখনোই যাইনি। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। তারা চিঠিতে লিখেছে, উপস্থিত মনোচিকিৎসকেরা ওষুধটির বিষয়ে খুবই ইতিবাচক ছিলেন এবং তারা একমতও হয়েছেন। কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিতই ছিলাম না। তাদের বক্তব্য সঠিক নয়।"

শ্রীলঙ্কার ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক লুন্ডবেকের ওষুধ দুবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার খবরটাও ডা. ফার্নান্দোর কাছে নতুন ছিল।

লুন্ডবেক কোম্পানির তালিকায় ডা. জি. এস জ্ঞানাসিংগমের নামও ছিল। তিনি কলম্বোর সেন্ট্রাল হাসপাতালের কাছেই মেডিকেয়ার নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি সেই বৈঠকের কথা স্মরণ করে বলেন, "বৈঠকটা ডিনজিটবিষয়ক ছিল। আমি কয়েকবার ব্যবস্থাপত্রে ডিনজিটের কথা লিখেছি রোগীর জন্য। কিন্তু কিছু রোগী এই ওষুধে ভালো ফল পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ পাননি। তবে আমি জানতাম না ওষুধটি ডেনমার্কেই বিক্রি হয় না।"

ডা. সিংগম ওষুধটির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আমাকে যদি বলা হতো, ডিনজিট পরীক্ষিত এবং কার্যকর, তাহলে এর ব্যবহার নিয়ে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওষুধটি শ্রীলঙ্কাতেই খারিজ করা হয়েছে, যা আমার কাছে একটি সংবাদ।"

লুন্ডবেকের সমর্থকদের তালিকায় ডা. পি কুলানায়াগমের নাম আছে। তিনিও পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। টেলিফোনে তিনি আমাকে জানান, ডিনজিট বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। এখন অবসর জীবন কাটালেও কলম্বো শহরে তিনি একদা সেরা মনোরোগ চিকিৎসক ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলম্বোর বিত্তশালী এলাকায় আশা সেন্ট্রাল হাসপাতালে মাঝে মাঝে রোগী দেখেন।

এই মনোরোগ চিকিৎসকের সঙ্গে কিছুদিন পরে আমার দেখা হয় ক্লিনিকের চেম্বারে। আমাকে দেওয়া সময়ের প্রায় ১৫ মিনিট পর তিনি উপস্থিত হন। তার আগে একজন নার্স এসে ঘরের এসি চালিয়ে দিয়ে স্টেথোস্কোপসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রেখে যান টেবিলে। তিনি আমাকে একজন রোগী ভেবেছিলেন।

কুলানায়াগম এসেই জানতে চান, আমি লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে এসেছি কি না। আমি তাকে পরিষ্কারভাবে জানাই, 'দ্য নার্স' পত্রিকার পক্ষ থেকে ডিনজিটের শ্রীলঙ্কায় অনুমোদন লাভের বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। আমার কথা শুনেই তিনি বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, "লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে কোনো অনুমতি না নিয়ে ডিনজিট বিষয়ে কথা বলার অধিকার নেই। তারা জানতে পারলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে। এটা আমার দিবানিদ্রা দেওয়ার সময়; আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।"

পরমুহূর্তে তিনি সুর পাল্টে আমাকে বলেন, "লুন্ডবেকের সঙ্গে বৈঠকটির কথা আমার মনে আছে। তবে আমি ডিনজিট বিষয়ে সুপারিশও করিনি, অনুমোদনও দিইনি। আমি জানতাম না শ্রীলঙ্কার ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি দুবার ওষুধটির অনুমোদন দেয়নি। তবে যেহেতু এটি বিপজ্জনক ওষুধ নয়, তাই এর ব্যবহার নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

চলে আসার সময় ভদ্রলোক আমার কাছে ভিজিটিং কার্ড চান। ওই একই দিনে শ্রীলঙ্কায় লুন্ডবেকের প্রতিনিধি আমাকে টেলিফোন করেন। তিনি লুন্ডবেকে কাজ করতে করতেই ফার্মাকোলজি বিষয়ে লেখাপড়া করেন। (এখানে তার নাম উল্লেখ করা হলো না।) টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর ছিল বেশ সন্ত্রস্ত। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি আমাকে জানান, ডা. কুলানায়াগমের কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর পেয়ে তিনি ফোন করছেন। আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান।

একটি হোটেলের পানশালার বারান্দায় আমার সঙ্গে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার তিনি সময় পাল্টান। সেদিন সময়টা ছিল শেষ বিকেল। সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। পানশালায় মানুষের ভিড়। সেখানে বসেই তিনি জানতে চান, আমি আসলে কী করতে চাইছি? তিনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, লুন্ডবেক যা করছে, তা অস্বাভাবিক কোনো কাজ নয় এবং মনোচিকিৎসকদের কাজের

অভিজ্ঞতা এবং ডিনজিট বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির ওপর ভিত্তি করেই তাদের বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি আমাকে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কিন্তু পরদিন তিনি আমাকে ফোন করে জানান, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বার্ষিক হিসাবের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমার সঙ্গে কথা হবে না।

লুন্ডবেকের কর্তাব্যক্তি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না হলেও সেই স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। আমি কোথায়, কার সঙ্গে কথা বলেছি, কী কী তথ্য পেয়েছি– সবকিছু তিনি নিয়মিত জানতে চাইতেন। প্রতিদিন আমার কাছ থেকে একই উত্তর পেলেও তিনি হাল ছাড়েননি। আমি ডেনমার্কে ফিরে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি আমাকে ফোন করে বলেন, "আমি জানি, তালিকায় নাম আছে এমন সব মনোচিকিৎসকের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন।" আমি তাকে উত্তরে বলি, "একজন ছাড়া।"

সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল, আমি মিসেস ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কিন্তু আসলে আমি কথা বলতে পারিনি ডা. উইমাল দে অলউইসের সঙ্গে। লুন্ডবেকের তালিকায় থাকা এই মনোচিকিৎসক আমার ফোন পেয়ে লাইন কেটে দেন। তিনি যদি সেই বৈঠকে যোগ দিয়ে থাকেন, তাহলে হিসাব অনুযায়ী সাতজন চিকিৎসকের মধ্যে পাঁচজন আসলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর অলউইস যদি বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল চার।

অবাঞ্ছিত

ডা. হেমামালি পেরেরা মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। মনোবিজ্ঞানী হিসেবে একমাত্র তিনিই ড্রাগ ইভ্যালুয়েশন সাব-কমিটির (এসএল/ডিআরএ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রীয় হাসপাতালে তার অফিস কক্ষের টেবিলে সাইকোফার্মাকোলজিক্যাল ওষুধের অনুমোদনের জন্য করা আবেদনপত্রের স্তূপ চোখে পড়ার মতো।

হেমামালি পেরেরা বলেন, "আমরা ওষুধের মূল্য, ওষুধটির কার্যকারিতা এবং আদৌ এটি আমাদের প্রয়োজন কি না– এসব বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করি।" ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তার মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয়বার ডিনজিট ওষুধের অনুমোদন খারিজের চিঠি লুন্ডবেক কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়। সংমিশ্রিত উপাদানে তৈরি ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে তার ভাষ্য হচ্ছে, "এ ধরনের ওষুধের খুব একটা সুনাম নেই। এ ধরনের ওষুধ প্রয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। মিশ্রিত উপাদান দুটির কারণে এ ধরনের ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমার মনে আছে, ওষুধটি সম্পর্কে লুন্ডবেক যেসব তথ্যাদি পাঠিয়েছিল, তার বেশির ভাগই কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাই এ থেকে আমি এই উপসংহারে পৌঁছাই যে, ওষুধটি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। তা ছাড়া বিষণ্ণতা এবং মানসিক উদ্বেগ রোগের চিকিৎসার জন্য সাইকোফার্মাকোলজিক্যাল ওষুধ আমাদের দেশেই রয়েছে।"

এর মধ্যে ডা. পেরেরা ছুটিতে দেশের বাইরে যান। ফিরে এসে তিনি দেখেন, ডিনজিট নিবন্ধন অনুমতি পেয়ে গেছে। তিনি বলেন, "নিবন্ধনের আবেদন খারিজ হওয়া একটি ওষুধ কীভাবে বাজারে প্রবেশের অনুমতি পেল, বিষয়টি জানতে আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাকে জানানো হয়, ডিনজিট ওষুধটি সাময়িক নিবন্ধনের অনুমতি পেয়েছে। অন্য কথায় এক বছরের জন্য এটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।"

এ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ তিনবার ডিনজিটের অনুমোদনের সীমা বাড়িয়েছে। আমি ভদ্রমহিলাকে লুন্ডবেক থেকে আসা চিঠি এবং সাত মনোচিকিৎসককে নিয়ে সেই বৈঠকের বিষয়ে অবহিত করলে তিনি হতভম্ব হয়ে বলেন, "এ ধরনের ঘটনা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এ ধরনের কাণ্ড ঘটাতে পারে না। আসলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ রকমই ঘটে থাকে। বড় বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি মনে করে, এসব দেশে তারা তাদের ওষুধ অনুমোদন করানোর জন্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আমাদেরকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই রাখে না। এ ধরনের আচরণ সঠিক নয়।"

ডা. পেরেরা আরও বলেন, "এ দেশে মনোরোগ চিকিৎসকেরা সবাই বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল পাঠ করেন এবং তারা সবাই শিক্ষিত। একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পনি তাদের ওষুধকে কার্যকর বলছে বলেই আর একটি কথা না বলে ওষুধটি গ্রহণ করা আমাদের উচিত হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে জ্ঞানভিত্তিক ওষুধ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের হাতে তথ্যভাণ্ডার রয়েছে এবং একটি ওষুধ নিবন্ধন দেওয়ার আগে আমরা অনেক অনুসন্ধান করে থাকি। কারণ, একটি ওষুধ বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো ওষুধটি সুপারিশ করার জন্য চিকিৎসকদের প্রভাবিত করতে সবকিছু করতে পারে।"

তিনি আমাকে জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি শ্রীলঙ্কার ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেনমার্কে ফিরে আমি লুন্ডবেকের ইয়োর্গেন নাইবো অ্যান্ডারসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ফোনের ওপার থেকে খুবই আন্তরিক গলায় তিনি জানান, ডিনজিট ও শ্রীলঙ্কা বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী, তবে তা হবে তাদের যোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে। আমি ওই বিভাগের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি বিরক্ত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করেন, ডিনজিট ও শ্রীলঙ্কা বিষয়ে বিস্মিত হওয়ার মতো কী তথ্য আমার কাছে আছে? আমি তাকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে বলি, আমার বিস্মিত হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় লুন্ডবেক আয়োজিত সেই বৈঠকে অন্তত দুজন চিকিৎসক উপস্থিত না থাকার পরেও কীভাবে তারা সাতজনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করল এবং ডেনমার্কে নিবন্ধনের জন্য আবেদন না করেও তারা কীভাবে দাবি করল, ডিনজিট তাদের দেশে নিবন্ধিত?

কিছুদিন পর লুন্ডবেকের পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তা জানান, তিনি আমার সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করতে চান। সেখানে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে বিশদ জানাবেন। তারপর আমাকে বিবেচনা করতে হবে, আমি স্টোরিটা করব কি না। ১৫ ফেব্রুয়ারি কোপেনহেগেনে লুন্ডবেকের প্রধান কার্যালয়ে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করা হয়। লুন্ডবেকের সেই কর্মকর্তা আমাকে জানান, ডিনজিট ওষুধটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ চিকিৎসকেরা ব্যবস্থাপত্রে লিখে থাকেন। তিনি আমাকে জানান, কোনো কিছু গোপন করার জন্য ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়োর্গেন নাইবো অ্যান্ডারসনের সঙ্গে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে শ্রীলঙ্কার 'ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি' এবং 'ড্রাগ ইভ্যালুয়েশন সাব-কমিটির কোনো প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এমন ধারণা সঠিক নয়। শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ ডিনজিট ওষুধটির দুবার নিবন্ধন বাতিল করেছে এবং ওষুধটি ডেনমার্কেও নিবন্ধিত ছিল না এমন তথ্য তারা গোপন করেছে বলে যে অভিযোগ আছে, তা-ও সঠিক নয়। একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি তাদের কোনো পণ্যের নিবন্ধন বাতিল হওয়ার পর ক্রমাগত আবার তা পাওয়ার চেষ্টা করে চলে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

সারসংক্ষেপ জানার পর আমি আবার লুন্ডবেকের কর্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করলে তিনি জানান, আমার তথ্য তারা বিশ্বাস করেন না এবং আমি আমার স্টোরির বক্তব্য পরিবর্তন না করলে তারা কোনো কিছুতেই অংশ নিতে চান না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, "এই স্টোরির মাধ্যমে আপনি কি বলতে চাইছেন, একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করতে চাইছে?"

উত্তরে আমি বলি, "সেটাই আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাইছি।"

পরিশিষ্ট

অ্যান লিয়া ল্যান্ডস্টেড

ওষুধ এবং সেগুলোর প্রস্তুতকারক কোম্পানি নিয়ে কাজ করার ভাবনা মাথায় আসে প্রখ্যাত স্পাই থ্রিলার লেখক জন লে কারের একটি উপন্যাস পড়ে। 'দ্য কনস্ট্যান্ট গার্ডেনার' নামে তার সেই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে আফ্রিকায় একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির দুর্নীতি নিয়ে। আমি বইটি পড়ে উৎসাহিত হয়ে ডেনমার্কের ওষুধ কোম্পানিগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডার' নামে চিকিৎসকদের একটি সংগঠন আছে। ওই সংগঠনের একজন চিকিৎসক আমাকে জানান, প্রায় এক বছর আগে তিনি শ্রীলঙ্কার ফার্মাকোলজির একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে একটি ই-মেইল পান। মেইলে অধ্যাপক বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন, শ্রীলঙ্কায় লুন্ডবেকের তৈরি ডিনজিট ওষুধের বাজারজাতকরণ তারা দুবার খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ওষুধই এখন শ্রীলঙ্কায় ওষুধের দোকানে কীভাবে বিক্রি হচ্ছে, তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। সেই চিকিৎসক তার কম্পিউটারে রয়ে যাওয়া পুরোনো মেইল ঘেঁটে চিঠিটি আমাকে দেন। বিষয়টা আমার কাছে একেবারেই কাকতালীয় মনে হয়েছিল।

আমি নেটে "way back machine" (see http://web.archive.org/) to find hidden documents এই সাইটগুলোতে ডিনজিট ও লুন্ডবেক বিষয়ে তথ্যের জন্য অনুসন্ধান চালাই। ডেনমার্কের ওষুধবিষয়ক কর্তৃপক্ষ, মনোরোগ চিকিৎসক এবং শ্রীলঙ্কায় ফার্মাকোলজির অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলি। শ্রীলঙ্কার অধ্যাপকেরা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতারিত হয়েছেন বলে ভাবছিলেন। লুন্ডবেক কর্তৃপক্ষ আমাকে কোনো সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়নি। ডেনমার্কে তথ্যের স্বাধীনতাবিষয়ক আইন থাকলেও আমি তখনই সেই আইনের সাহায্য নিইনি। পরিবর্তে আমি বিভিন্ন উৎস থেকে লুন্ডবেক, ডিনজিট ওষুধ এবং শ্রীলঙ্কার ওষুধবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করি।

বিভিন্ন ব্যক্তিসূত্রের মাধ্যমে পাওয়া নথিপত্রেই স্টোরির মূল অংশটা পেয়ে যাই। সেই নথি ছিল লুন্ডবেকের কাছ থেকে এসএল/ডিআরএর (শ্রীলঙ্কার ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি) কাছে পাঠানো একটি চিঠি। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কার সাতজন প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শ্রীলঙ্কায় ডিনজিট ওষুধটির নিবন্ধন বিষয়ে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি সত্য নয়। চিঠিতে লুন্ডবেকের প্রতিনিধি এবং সাতজন চিকিৎসকের মধ্যে বৈঠকের বিষয়টি উল্লেখ করা ছিল। শ্রীলঙ্কার ওষুধবিষয়ক কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বারের মতো ডিনজিটের নিবন্ধন আবেদন খারিজ করার ছয় মাস পর বৈঠকটি হয়।

আমার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ স্টোরিতে বেশ কিছুটা নাটকীয়তা যুক্ত হয়েছে, কথাটা সত্য। তবে এ ধরনের ভ্রমণ আমার জন্য ছিল বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। আমার ভাগ্য ভালো যে 'দ্য নার্স' এবং 'রেডিও'র দুজন সম্পাদক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। 'নার্স' আমার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করে এবং আমার বেতনের কিছু অংশ রেডিওর সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ফলে আমাকে অর্থের জোগান নিয়ে ভাবতে হয়নি।

শ্রীলঙ্কার সেই ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ছাড়া অন্য কেউ আমার সেখানে যাওয়ার কথা জানত না। ভয় ছিল, বিষয়টা লুন্ডবেক কোম্পানি জেনে গেলে ওই সাত চিকিৎসককে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না। অনুমান সঠিক ছিল। লুন্ডবেকের প্রতিনিধিরা শ্রীলঙ্কায় আমার উপস্থিতির কথা জেনে আমাকে স্টোরি করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তত দিনে মনোরোগ চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি। লুন্ডবেকের একজন প্রতিনিধি খানিকটা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির অপকর্ম বিষয়ে কোনো স্টোরি লিখছি কি না। তার কথাটা আমার স্টোরির লক্ষ্যকে আরও স্পষ্ট করে দেয়।

এই স্টোরিতে আমার সব তথ্য এবং তথ্যের সূত্র সংগঠিতভাবে রাখার জন্য এক্সেল এবং নিজের তৈরি একটি টাইমলাইনের সাহায্য নিয়েছি। গুগল ম্যাপও এই কাজে সহায়ক ছিল। আমার তৈরি টাইমলাইনের ছক আমাকে স্টোরির মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে দেয়নি। আমি সব সময়ই বলি, আপনার স্টোরি যদি গোছানো থাকে, তাহলে লেখার পর্বটি অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে এই স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে একটু কঠিন ছিল। সত্যটা সহজভাবে লেখায় তুলে ধরার কাজটা আমার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি নিয়ে কাজ করার ঝামেলা আছে। তারা হুট করে মামলা করে দিতে দ্বিধা করে না। তাই প্রকাশের আগে স্টোরির বিষয়ে তিনজন আইনজীবীর পরামর্শ নিয়েছিলাম।

‘লুন্ডবেকের চিঠি’ স্টোরিটি পত্রিকায় নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত এবং রেডিও ডকুমেন্টারি হিসেবে প্রচারিত হয়। রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল এবং গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সঙ্গে আমিও যোগাযোগ করি। কৌশলটি কাজে লাগে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্টোরিটি আলোচিত এবং উদ্ধৃত হয়। একটি পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে লুন্ডবেকের শীর্ষ ব্যবস্থাপক এরিক স্পুক ইয়ানসেন পুরো বিষয়টাকে কেলেঙ্কারি হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি ঘটনার দায় স্বীকার করে তদন্ত করারও নির্দেশ দেন। কয়েক মাস পরে লুন্ডবেক কোম্পানির পক্ষ থেকে ওই তিনজন মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়, যাদের বক্তব্য ব্যবহারে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানিটি ডিনজিট ছাড়াও অন্য ওষুধগুলো শ্রীলঙ্কার বাজার থেকে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেয়। ওই সময়ে এসএল/ডিআরএ শ্রীলঙ্কায় ডিনজিট বিক্রির ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে নেয়। তবে এই পদক্ষেপের কোনো প্রতিক্রিয়া সেখানকার লুন্ডবেক কোম্পানির প্রতিনিধিদের ওপর পড়েনি। আমি স্টোরিটি নিয়ে যতটুকু আশা করেছিলাম, তার চেয়ে ফল অনেক ইতিবাচক হয়েছিল।

৩.

মহামারি রপ্তানি

অ্যাসবেস্টস শিল্পের বিস্তারে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু

জিম মরিস

ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস

মেক্সিকো সিটি থেকে আনা আভিলা, ওয়াশিংটন থেকে ড্যান ইটিনজার, বোগোটা থেকে কার্লোস এদুয়ার্দো হুয়ের্তাস, দিল্লি থেকে মুরালী কৃষ্ণান, মস্কো থেকে রোমান শ্লেইনভ এবং সাও পাওলো থেকে মার্সেলো সোয়ারেস এই স্টোরিতে ভূমিকা রেখেছেন

ভূমিকা

অ্যাসবেস্টসের সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্যসংকট অন্য স্বাস্থ্য ইস্যুগুলোর চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ভবন নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত এই সামগ্রী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যে একটি ঝুঁকি, তা বহুদিন আগে থেকেই স্বীকৃত। কিন্তু এই শক্তিশালী শিল্পের রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য খাতের সহায়ক শক্তিগুলো বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তুলে, অস্বীকার করে অথবা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে পুরোটাই দৃষ্টির আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে যখন মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল, তখনই ঘটনার শিকার মানুষদের স্বজন এবং আইনজীবীদের মাধ্যমে ইস্যুটি প্রকাশ্যে চলে আসে। বেশির ভাগ উন্নত দেশে অ্যাসবেস্টস ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আর দশজন মানুষের মতো আমিও ভেবে নিয়েছিলাম, স্টোরিটি এখানেই চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। মাঝে মাঝে ঘটনার শিকার মানুষদের স্বজনেরা আদালতে করা মামলায় জয়লাভ করলে সেটাই এই বিষয়ে একমাত্র খবর হতে পারে; এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু এই স্টোরি করতে গিয়ে আমি শিখলাম, অ্যাসবেস্টস কখনো শেষ হয় না। নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই শিল্পের মালিকেরা শুধু তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে এমন সব দেশে ঢুকে পড়েছে, যেখানে নিষেধাজ্ঞা নেই।

তারা সেখানে গিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে চালানো কিছু সমীক্ষার জোরে সরকারের কাছে বিধি মোতাবেক কাজ করার অনুমোদন চাইল। এই প্যাটার্ন নতুন নয়। সম্প্রতি তামাকশিল্পেও এটা দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের কাজের নমুনা যদি অপরিচিত না হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট খাতে এ রকম ঘটছে, তা প্রমাণ করা যেমন কঠিন, তেমনি পৃথিবীতে ডজনখানেক দেশে তা একসঙ্গে ঘটছে, সেটা প্রমাণ করা আরও কঠিন। 'ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' নামে প্রতিষ্ঠানটি তাদের সহযোগী সংগঠন 'সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটি' আমেরিকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে স্টোরিটি প্রকাশ করেছে। এই দুটি সংগঠনকে বিশ্বব্যাপী এ ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার জন্য মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। আমরা তাদের অনুসন্ধানের সাধারণ বিবরণসংবলিত একটি নিবন্ধ এখানে প্রকাশ করেছি। প্রতিবেদনটি সিপিআই কর্তৃক investigations/asbestos/ http://www.publicintegrity এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

এ ধরনের একটি প্রতিবেদন অল্প সময়ের মধ্যে একজন রিপোর্টারের পক্ষে করে ফেলা কঠিন। এখানে প্রয়োজন হয় একদল রিপোর্টার, সম্পাদক এবং গ্রাফিক ডিজাইনের কাজে দক্ষ ব্যক্তির। এই স্টোরি করার জন্য বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। তবে একজন ব্যক্তি রিপোর্টার 'ডেঞ্জার্স ইন দ্য ডাস্ট' ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পায়। সাংবাদিক হিসেবে আমরা গাছ থেকে অরণ্য পর্যন্ত সব ধরনের কাজই করে থাকি। প্রথমে পুরো চিত্রটির দিকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে সুফল পাওয়া যায়। পরে টুকরো টুকরোভাবে কাজ করলেও পুরো চিত্রটি মাথায় থেকে যায়। এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বহুজাতিক স্বাস্থ্য ও শিল্পবিষয়ক দুর্নীতির চিত্র উন্মোচন ঘটাতে একটি রিপোর্টিং টিমের প্রয়োজন ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে। এই রিপোর্টিং টিমকে যে বহুজাতিক হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরাই জরুরি কোনো ইস্যুতে এ রকম কাজ করে ফেলতে পারে। সাংবাদিক জিম মরিস উল্লেখ না করলেও এই স্টোরি 'ওসাকা অ্যাওয়ার্ড ফর এনভায়রনমেন্টাল রিপোর্টিং', 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স ও 'এডিটর্স অ্যাওয়ার্ড'সহ বেশ কিছু পুরস্কার জয় করে নিয়েছে।

সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটি কর্তৃক ২০১০ সালের ২১ জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়।

ব্রাজিলের ওজাসকো একটি শিল্প শহর। সাও পাওলোর পশ্চিমে অবস্থিত এই শহরের খানিকটা অতীত দুপা পড়ে গেছে বিশাল ওয়ালমার্ট সুপারস্টোর আর স্যাম'স ক্লাবের ঝকমকে ভবনের নিচে। আভেনিদা মারিক্যাম্পোস ও আভেনিদা দু অটোনমিস্টা নামে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে এই শপিং মল আর ক্লাবের অবস্থান। এখানেই ছিল এটারনিট অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট কারখানা, যা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৯৩ সালে। ৪৫ বছর ধরে চলা এই কারখানার ভবনটিও ভেঙে ফেলা হয় ১৯৯৫ সালে। এই কারখানায় তিন প্রজন্ম ধরে শ্রমিকেরা কাজ করেছেন। কারখানায় তারা দিনের পর দিন দৈত্যাকৃতির মিশ্রণ যন্ত্রে সিমেন্টের সঙ্গে অ্যাসবেস্টস, সেলুলোজ আর পানি মিশিয়েছে, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করেছে আর আঁশযুক্ত একধরনের সাদা ধুলায় নিমজ্জিত হয়েছে। এই ধুলা থেকেই তাদের শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে। তাদের কেউ কেউ অবসর নিতে বাধ্য হয়েছে এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে শুরু করে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে। তাদের মধ্যে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয় মেসোথেলিওমা নামক একধরনের বিরল ক্যানসার রোগে। এই রোগের জীবাণু মানুষের বুকের ভেতরের দেয়াল ক্ষয় করে এবং প্রাণ দ্রুত বধ করে। আলদো ভিনসেনতিন ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ৬৬ বছর বয়সে মারা যান। শরীরে এই রোগ আবিষ্কৃত হওয়ার তিন মাসের মাথায় তার মৃত্যু ঘটে। তার বিধবা স্ত্রী জিসেলা গোমেস ভিনসেনতিন আমাকে বলেন, "ওই কারখানার কর্তৃপক্ষ বিপদ সম্পর্কে অবগত ছিল। কিন্তু তারা আমার স্বামীর নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। ধারণা করছি, এখনো বহু মানুষের মৃত্যু ঘটবে।"

এই অ্যাসবেস্টস শিল্পের মেরুদণ্ড হচ্ছে বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট এবং বিজ্ঞানীরা। লাখ লাখ ডলারের এই বাণিজ্য আজও বেঁচে আছে; কারণ, ব্রাজিলের ওজাসকো অথবা একই রকমের বিয়োগান্ত ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় অন্ধকার এক সময়ের ইতিহাস হিসেবে। বলা হয়, তখন এই মারাত্মক ধূলিকণার দূষণের মাত্রা অনেক বেশি ছিল, নানা ধরনের অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবহার এবং কারখানায় বিষাক্ত আঁশ থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও তখন অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এখনো সেই বিপদ না কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেক্সিকো সিটি থেকে ভারতের আহমেদাবাদ পর্যন্ত সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিবরণ আমরা পাচ্ছি। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ অথবা অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাসবেস্টস-সংক্রান্ত রোগ বৃদ্ধি অথবা পৃথিবীর ৫২টি দেশে এই শিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা অথবা বিধিনিষেধ আরোপের পরেও বিভিন্ন সমীক্ষা এবং জরিপে বলা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে অ্যাসবেস্টস থেকে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ১০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটবে। এই পরিসংখ্যানের অর্থ হচ্ছে, এই শিল্প ভালোভাবেই পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে অ্যাসবেস্টস নিষিদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাজ্যে এই শিল্প বৈধতা না হারালেও ক্ষতিপূরণ এবং বিভিন্ন মামলায় তাদের গুনতে হয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকায় মোটরযান এবং বিমানের ব্রেক, গ্যাসকিট এবং আরও কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। তারপরেও উন্নয়নশীল বিশ্বে সস্তায় গৃহনির্মাণসামগ্রী হিসেবে এই অ্যাসবেস্টস দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ২০০৯ সালে পৃথিবীজুড়ে দুই মিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি অ্যাসবেস্টস খনন করা হয়েছে। রাশিয়া, চীন ও ব্রাজিল ওই সব দেশের তালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছে। এই অ্যাসবেস্টস মূলত সিমেন্টে পরিণত করা হয়েছে ঢেউখেলানো ছাদ এবং পানির পাইপ তৈরির জন্য। খনন করা অ্যাসবেস্টসের অর্ধেক রপ্তানি করা হয়েছে ভারত ও মেক্সিকোর মতো উন্নয়নশীল দেশে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করে বলেছেন, অ্যাসবেস্টসের মতো উপাদান এতটা উন্মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে গেলে পশ্চিমা দেশগুলোর মতোই বিপদ ঘটতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মেসোথেলিওমার মতো বিরল ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার এবং অ্যাসবেস্টসিস রোগ মহামারিতে পরিণত হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, পৃথিবীতে ১২৫ মিলিয়ন মানুষ তাদের কর্মস্থলে অ্যাসবেস্টসের মোকাবিলা করে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) জানাচ্ছে, প্রতিবছর পৃথিবীতে অ্যাসবেস্টস থেকে উদ্ভূত রোগের কারণে ১ লাখ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ড. জেমস লি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে স্কুল অব পাবলিক হেলথের সেন্টার ফর অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে অ্যাসবেস্টস সম্পর্কিত ক্যানসার রোগে ৫ থেকে ১০ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। লি বলেন, "আমার হিসাবে মৃতের সংখ্যা কমিয়ে ধরা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সময়ের মধ্যে অ্যাসবেস্টস আরও বিস্তার লাভ করলে রোগটি মহামারির আকার নিতে পারে"। ড. লির পরিসংখ্যানে অ্যাসবেস্টস থেকে উদ্ভূত ক্যানসার ছাড়াও ফুসফুসের অন্য রোগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দিল্লি থেকে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অ্যাসবেস্টস থেকে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে এক মিলিয়নে।

এই শিল্পের দ্রুত বিকাশের পেছনে রয়েছে বাণিজ্যিক প্রচারণা। ডজনখানেক ব্যবসায়িক সংগঠন এবং ইনস্টিটিউটের ছত্রছায়া বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিকে সমর্থন দিয়ে চলেছে। এই সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে ব্রাজিলের খনি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এসএএমএ থেকে শুরু করে ভারতে অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট শিট উৎপাদক বিশাখার মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাদের এই প্রচারণা দৃশ্যমান নয় এবং পুরো বিষয়টি সমন্বয় করে মন্ট্রিয়লের সরকারি সমর্থন পাওয়া একটি প্রতিষ্ঠান। আর এই প্রচারণা পৌঁছে যায় দিল্লি, মেক্সিকো হয়ে রাশিয়ার উরাল পাহাড় পর্যন্ত।

'ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' সংগঠনটির এক বিশ্লেষণে জানা গেছে, এই বাণিজ্যিক গ্রুপগুলো আশির দশকের মাঝামাঝি শুধু তিনটি দেশেই সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে অ্যাসবেস্টস বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে। ওই তিনটি দেশ হচ্ছে কানাডা, ভারত ও ব্রাজিল। সমালোচকদের মতে, তাদের এই কৌশল তামাকশিল্প থেকে ধার করা। তাদের কৌশলের মধ্যে রয়েছে সংশয় তৈরি করে রাখা, মামলা মোকাবিলা করা এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে বিলম্বিত করা। 'ইউরোপিয়ান এজেন্সি ফর সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাট ওয়ার্ক' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং আইএলওর একজন সাবেক কর্মকর্তা জুকা টাকালা বলেন, "বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। অ্যাসবেস্টস কখনোই নিরাপদ পন্থায় ব্যবহার করা যায় না। এ থেকে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে।"

এসব অভিযোগের জবাবে এই শিল্পের অর্থায়নে একদল গবেষক তাদের বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করে। তাদের মূল দাবি হচ্ছে, অ্যাসবেস্টস নিরাপদ পন্থায় ব্যবহার করা সম্ভব। তারা বলতে চাইছেন, এখন বাজারে বিক্রি হওয়া ক্রাইসোটাইল অথবা সাদা অ্যাসবেস্টস নীল অথবা খয়েরি অ্যাসবেস্টসের চেয়ে কম ঝামেলাপূর্ণ। নীল ও খয়েরি অ্যাসবেস্টস উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে। ড. জে. করবেট ম্যাকডোনাল্ড মন্ট্রিয়লের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারিবিদ্যা বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ক্রাইসোটাইল অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে থেকে কাজ করা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছেন। তাকে এই কাজে সহায়তা দিয়ে আসছিল 'কিউবি অ্যাসবেস্টস মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন'। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের বক্তব্য হচ্ছে, অ্যাসবেস্টস ছাড়া গৃহ নির্মাণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ থেকে যে স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বলা হচ্ছে, তা সামান্য।

স্বাস্থ্য এবং শ্রমবিষয়ক কর্মকর্তারা এ ধরনের বক্তব্যে বিব্রত বোধ করেন। তারা বলেন, "অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে গেলে ঝুঁকি থাকবেই।" পেশাগত ও পরিবেশগত বিষয় নিয়ে কাজ করে 'কলিজিয়াম রামাজিনি' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। তাদের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাসবেস্টস থেকে ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু খুবই যন্ত্রণাদায়ক। অথচ এই মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়।

আমেরিকার পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব পাবলিক হেলথ অর্গানাইজেশন, দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন অকুপেশনাল হেলথ এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন মিলে গোটা বিশ্বে অ্যাসবেস্টসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে। ২০০৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার' ২৭ জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করে। প্যানেলের প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্রমবর্ধমানভাবে রোগ বিস্তারের যেসব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফুসফুসে ক্যানসার এবং মেসোথেলোমিয়ার কারণ হচ্ছে সব ধরনের অ্যাসবেস্টস। প্যানেল আরও জানায়, সম্প্রতি নতুন গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, মেয়েদের জরায়ু এবং ল্যারিংসে ক্যানসারের কারণও অ্যাসবেস্টস।

কিন্তু অ্যাসবেস্টস শিল্প নিঃশব্দে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত নয়। এই শিল্পের পক্ষে যে প্রচার রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক তদবির এবং বিজ্ঞাপন। কারণ, এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার। মার্চ মাসে কলম্বিয়ায় ক্রাইসোটাইল অ্যাসবেস্টস নিয়ে বাণিজ্য করে এমন একটি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর প্রধান বিশ্বব্যাংকের প্রধান রবার্ট জোয়েলিক পাঠানো এক চিঠিতে কঠোর অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসার আহ্বান জানান। তারা দাবি করেন, অ্যাসবেস্টস থেকে মৃত্যু ১ লাখ– এই সংখ্যা সঠিক নয়। এগুলো পুরোনো তথ্য। গেল বছর বিশ্বব্যাংক অ্যাসবেস্টসের বিকল্প ব্যবহারের জন্য তাদের ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানায়। আইসিআইজের মাধ্যমে কলম্বিয়া থেকে পাওয়া নথিপত্রে দেখা যায়, তারা ইকুয়েডরে বিকল্প পন্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ আইনে পরিবর্তন ঘটানো এবং অ্যাসবেস্টস নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনকে প্রশমিত করতে চেয়েছিল। ২০০৮ সালে তাদের নির্বাহী বোর্ডের সভার বিবরণে দেখা যায়, তারা বিশ্বে ক্রাইসোটাইল অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করার সুপারিশ করেছে। তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইএলওর পরিচালকদের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে।

জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখে ভারতে অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট উৎপাদক সমিতির আইনজীবী প্রতিষেধক ওষুধ বিশেষজ্ঞ ডা. টি. কে. যোশীকে তিরস্কার করে চিঠি পাঠায়। সেখানে বলা হয় ড. যোশী ক্রাইসোটাইলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন এবং অকারণে শ্রমিকদের ভয় দেখাচ্ছেন। সেই আইনজীবী বলেন, "হয় যোশীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে অথবা আইনগত ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।" কয়েক সপ্তাহ আগে এই উৎপাদক সমিতির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায়। ভারতের প্রথম সারির এই দৈনিকে তাদের বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ছিল, "অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট নিয়ে সব গল্পগাথা উড়িয়ে দিন"। সেই বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়, পশ্চিমা দেশগুলোতে ক্যানসারের আঘাতটা আসে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে। তখন অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট উৎপাদনে তাপ নিরোধ ব্যবস্থার অমনোযোগী ব্যবহার থেকেই শ্রমিকেরা ক্ষতিকর উপাদানের সামনে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন আর এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই। বিজ্ঞাপনে আরও দাবি করা হয়, অ্যাসবেস্টস দীর্ঘস্থায়ী, টেকসই এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী। এই পণ্য পরিবেশবান্ধবও।

অস্থির ইতিহাস

আগুন ও তাপ প্রতিরোধক, সাশ্রয়ী এবং টেকসই তন্তুযুক্ত বস্তু অ্যাসবেস্টস একদা গৃহনির্মাণসামগ্রী হিসেবে সুপরিচিত। শতাব্দী ধরে উন্নত বিশ্বের দেশ আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অ্যাসবেস্টস থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের পণ্যের জন্য অ্যাসবেস্টসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে পাইপ, ঘরের ছাদের তাপ নিরোধক ব্যবস্থা, ব্রেক শু, ব্রেক প্যাড, ইট, ঘরের চাল ও মেঝে।

বিপুলসংখ্যক মোটরযান মিস্ত্রি ব্রেকের লাইনিং তৈরির সময় ব্যাপকভাবে ক্রাইসোটাইল বা সাদা অ্যাসবেস্টসের ধূলিকণার মধ্যে অসংরক্ষিত রাখার জন্য গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, অ্যাসবেস্টসের বিষাক্ত তন্তু থেকে মেসোথেলিওমা ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন।

ইউরোপে অ্যাসবেস্টস থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হওয়ার অশনিবার্তা প্রথম আসে ১৯ শতকে। ১৯১৮ সালে আমেরিকা ও কানাডার বিমা কোম্পানিগুলো অ্যাসবেস্টস কারখানার শ্রমিকদের বিমা সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানায় ব্যাপক ফুসফুসের অসুখের কারণে। ১৯৩০ সালে আইএলও থেকে জারি করা এক সতর্কবার্তায় অ্যাসবেস্টস খনন থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটিকেই ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানানো হয়। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন প্যাথলজিস্ট নিশ্চিত করেন যে, অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শের সঙ্গে মেসোথেলিওমার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। একটি অনুমান থেকে জানা যায়, বিংশ শতাব্দীতে ১০০ মিলিয়ন আমেরিকান নাগরিক পেশাগতভাবে অ্যাসবেস্টসের ক্ষতিকর উপাদানের সংস্পর্শে ছিল।

১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে অ্যাসবেস্টস দিয়ে তাপ নিরোধক তৈরির একটি কারখানার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয়। তখনই এই অ্যাসবেস্টসের মধ্যে ফুসফুস বিনষ্টকারী উপাদানের উপস্থিতির কথা সামনে আসে এবং ১৯৮১ সাল নাগাদ প্রায় ২০০ কোম্পানি এবং তাদের বিমা করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরের বছর আমেরিকায় অ্যাসবেস্টস পণ্য উৎপাদনকারী সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান জন ম্যানভিল করপোরেশন ও আরও দুটি কোম্পানি তাদের বিরুদ্ধে মামলার তোড় ঠেকাতে দেউলিয়া প্রতিরক্ষা আইনে আদালতে মামলা করে। ১৯৬০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ৭ লাখ ৩০ হাজার ব্যক্তি অ্যাসবেস্টস শিল্পের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করে। এসব মামলায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৭০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সালে আরএএনডি করপোরেশনের করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই অর্থের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলার দাবিদারেরা পেয়েছেন।

অ্যাসবেস্টসের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সাল থেকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ জমে উঠছিল, ফলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুরু করে। তবে ক্রাইসোটাইল উপাদানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দেয় ইউরোপীয় কমিশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত। তারা এক ফরমান জারি করে জানায়, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সাদা অ্যাসবেস্টসের তৈরি যেকোনো পণ্য বেআইনি বলে বিবেচিত হবে। এই সিদ্ধান্ত চিলি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মিসরসহ বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করে। বেশির ভাগ দেশই অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। কোথাও কোথাও ব্রেক ও গ্যাসকেট তৈরির ক্ষেত্রে অ্যাসবেস্টস ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়।

উন্নত বিশ্বের দেশসহ মোট ৫২টি দেশ এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে। সেখানে কম ক্ষতিকর এবং দামি বিকল্প পণ্য যেমন পলিপ্রপাইলিন ফাইবার সিমেন্ট, ছাদের জন্য অ্যালুমিনিয়াম টাইলস এবং ইস্পাতের আবরণ দেওয়া কংক্রিটের পাইপ প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

কিন্তু তারপরেও বিশ্বের কোনো কোনো অংশে ক্রাইসোটাইল উত্তোলন এবং এর ব্যাপক ব্যবহার চলতে থাকে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ সালে গোটা বিশ্বে অ্যাসবেস্টসের কাঁচা তন্তু রপ্তানি হয়েছে যার মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার। রাশিয়া হচ্ছে এই উপাদানের সবচেয়ে বড় উৎপাদক এবং চীন বৃহৎ ক্রেতা। তবে যে কানাডা নিজেদের সীমানায় অ্যাসবেস্টস ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, তারাই আবার এই পণ্য রপ্তানি করছে। ১৯৬০ সালের দিকে কানাডার কুইবেকের খনিশিল্প ঝুঁকির মুখে পড়ে। কারণ, তখন বিভিন্ন সমীক্ষায় খনিজের সঙ্গে ক্যানসার রোগকে জড়িয়ে ফেলা হয়। বিগত সিকি শতাব্দী ধরে দেশটির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যৌথভাবে মন্ট্রিয়লে 'ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউট' নামে একটি অলাভজনক সংগঠনে ৩৫ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই সংগঠনটি নির্মাণকাজে ও পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে অ্যাসবেস্টসের "নিয়ন্ত্রিত" ব্যবহারকে উৎসাহিত করে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছু নয়। আইসিআইজের পক্ষ থেকে ছয়টি দেশে অনুসন্ধান চালানো হয়। তারা তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন, সেখানে নেওয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর অ্যাসবেস্টস ধূলিকণার সংস্পর্শে রয়েছে। ভারত, চীন ও মেক্সিকোতে পেশাগত রোগ ছড়িয়ে পড়ার পেছনে এই অবস্থা দায়ী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অ্যাসবেস্টস বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন ব্যারি ক্যাসেলম্যান। ওয়াশিংটনে বসবাসরত এই পরিবেশবিষয়ক উপদেষ্টা মনে করেন, "যারা অ্যাসবেস্টসের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পক্ষে কথা

বলেন, তারা হয় মিথ্যুক নয় বোকা। অ্যাসবেস্টস যদি সুইডেনে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অনুমতি না পায়, তাহলে সুইজারল্যান্ডেও অনুমতি না পাওয়া উচিত।"

ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউট

কানাডা সরকারের সমর্থনপুষ্ট ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউটকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এই ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ক্লেমেন্ট গডবাউট অবশ্য দাবি করেন, তার প্রতিষ্ঠানের মূল বক্তব্য ভুল তর্জমা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা কখনোই বলিনি ক্রাইসোটাইল বিপজ্জনক নয়; আমাদের কথা হচ্ছে, ক্রাইসোটাইল ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এটা এমন কোনো বস্তু নয়, যা আপনি প্রতিদিন সকালে কফির সঙ্গে পান করেন।"

গডবাউট পরিষ্কারভাবে বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠান আসলে তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিকভাবে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে না। ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউট কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে নাক না গলানোর নীতিতে বিশ্বাসী। গডবাউটের ভাষায়, "প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক শক্তিও তাদের নেই।" তিনি মনে করেন, সম্প্রতি ভারতের বড় বড় অ্যাসবেস্টস কারখানায় ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের দিকটি উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, "যেখানে আইন অমান্য করা হয়, সেখানে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই চিত্র শতভাগ সঠিক নয়। কেউ যদি আমেরিকার মহাসড়কে ২০০ মাইল গতিতে গাড়ি চালিয়ে মনে করেন, অন্যরাও তা-ই করছে, এমনটা ভাবা ভুল হবে।"

গডবাউটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে তাদের ইনস্টিটিউট অ্যাসবেস্টস শিল্প থেকে ১ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউটের প্রধানের দায়িত্ব পালনের আগে তাদের অবদান রাখার বিষয়ে তিনি অবগত নন। কানাডায় তথ্য অধিকার আইনে অটোয়ার গবেষক কেন রুবিন এ-সংক্রান্ত নথিপত্র জোগাড় করেছেন। তার হাতে থাকা তথ্য জানাচ্ছে, ১৯৮৪ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউট অ্যাসবেস্টস শিল্প খাত থেকে ১৮ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, ইনস্টিটিউট এই শিল্প খাত থেকে সম্ভবত ২০ মিলিয়ন ডলার লাভ করেছে।

এই ইনস্টিটিউট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১২টির বেশি সহযোগী সংগঠনকে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। পরিবর্তে এই সংগঠনগুলো তাদের নিজেদের দেশে বিজ্ঞান এবং নীতি নির্ধারণ বিষয়ে অবদান রাখার চেষ্টা করে। মেক্সিকোর পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০০৭ সালে তারা প্রতিবেশী আমেরিকার চেয়ে ১০ গুণ বেশি অ্যাসবেস্টস ব্যবহার করেছে। মেক্সিকোর লুইস সেহুদো আলভা সেখানকার 'ইনস্টিটিউটো মেক্সিকানো দে ফাইব্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াস (আইএমএফআই)'-এর দায়িত্বে রয়েছেন ৪০ বছর ধরে। তিনি জানান, ক্রাইসোলাইট ইনস্টিটিউট এবং রাশিয়া ও ব্রাজিলের সমধর্মী সংগঠনগুলোর সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তারা মেক্সিকোর ভেতরে ও বাইরে ক্রাইসোটাইলের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, "আমি যদি জানতাম, আমাদের এই শিল্প মানুষের মৃত্যু ডেকে আনছে এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করছে, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে এখানে বসে কথা বলতাম না। আমার আসার কারণ হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে অ্যাসবেস্টস শিল্পের নিন্দুকেরা সক্রিয় আছেন।" তিনি জানান, ১৯৯০ সালে আইএমএফআই এবং আমেরিকা ও কানাডায় তাদের অনুরূপ সংগঠনগুলো যেসব কারখানায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, সেখানে অ্যাসবেস্টস বিক্রি বন্ধ করে দেয় এবং এ কারণে বেশ কিছু কারখানা বন্ধও হয়ে যায়। সেহুদো বলেন, "আমরা নিয়মকানুন কার্যকর করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্য ও শ্রমবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে কাজ করছি। কারখানাগুলো নিয়ম মেনে চলছে কি না, তা দেখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শনেও যাচ্ছি।"

ডা. গুয়াদালুপে আগুইলার মাদ্রিদ মেক্সিকোর সামাজিক নিরাপত্তা ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক এবং গবেষক হিসেবে কাজ করেন। দেশটির ফেডারেল সেক্রেটারিয়েট অব হেলথের অধীনে এই ইনস্টিটিউট জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নজরদারি করে। আগুইলার মনে করেন, আইএমএফআই কখনোই নিরাপত্তা বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় না। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, মেক্সিকোতে ক্রাইসোলাইটের বাজার সংরক্ষণ করা। তারা খুব সুকৌশলে শ্রম এবং স্বাস্থ্য সচিবালয়ে প্রবেশ করে এখন কাজের জায়গা এবং পরিবেশগত নিয়মনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। তিনি বলেন, "যখন শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অ্যাসবেস্টস নিষিদ্ধ হয়ে গেল, এরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলো। তখন সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তারা পা রাখল উন্নয়নশীল দেশে। তারপর যখন দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু দেশ অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিল, তখন উৎপাদক হিসেবে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল মেক্সিকো।"

মেক্সিকোর শহরতলি এলাকা ইজতাপালাপা। সেখানে একটি রাস্তায় দেখা গেল, খাবারের গাড়ির পাশে শিশুরা ভিড় করে আছে। পাশেই অ্যাসবেস্টস ব্রেক তৈরির কারখানা। স্থানীয়রা অভিযোগ জানালেন, এই কারখানার নিঃসরণের বিষয়ে তারা অভিযোগ জানালেও নিয়ন্ত্রকেরা তা বন্ধের কোনো উদ্যোগই নেননি।

মেক্সিকো সত্তরের দশকে কানাডা থেকে ক্রাইসোটাইল আমদানি বাড়িয়ে দেয় ব্যাপকভাবে। পাশাপাশি দেশটিতে প্রচলিত দুর্বল শ্রমিক-সুরক্ষা আইন বিপজ্জনক অবস্থার আরও বিস্তার ঘটাতে সহায়তা করে। আগুইলার জানান, মেক্সিকো শহরের আশপাশে প্রায় ৭০টি কারখানায় অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট তৈরি হয়। এসব কারখানার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট স্থাপনা, যেখানে তৈরি হচ্ছে অ্যাসবেস্টস ব্রেক, বয়লার এবং আরও নানান পণ্য। তার মতে, মেক্সিকোতে কোনো ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ১০ হাজার শ্রমিক অ্যাসবেস্টস সম্পর্কিত শিল্পে কাজ করে। আর তাতে আগামীতে মেক্সিকোতে মেসোথেলিওমা রোগটি মহামারির আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ডা. আগুইলার। তার করা গবেষণা বলছে, এই ধরনের রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং আগামী ৩০-৪০ বছর সময়ে বিভিন্ন অসুখের সঙ্গে মেসোথেলিওমা এবং ফুসফুসে ক্যানসার রোগ আরও জটিল হয়ে দেখা দেবে। তিনি বলেন, "প্রতিবছর ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটছে এই রোগে। কানাডার ক্রাইসোলাইট রপ্তানি পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে।"

ব্রাজিলের গোইয়াস অঞ্চলে দেশটির একমাত্র অ্যাসবেস্টস খনির অবস্থান। আর সেখানেই ব্রাজিলের ক্রাইসোলাইট ইনস্টিটিউট অবস্থিত। ব্রাজিলের একজন কৌঁসুলি এই ইনস্টিটিউট অবলুপ্ত করার জন্য আদালতে আর্জি জানান। প্রতিষ্ঠানটি জনস্বার্থে কাজ করে বলে নিজেরাই দাবি করে এবং তারা করের আওতামুক্ত। সেই কৌঁসুলি অভিযোগ করেন, এই ইনস্টিটিউট ভঙ্গুর ছদ্মাবরণে ব্রাজিলের অ্যাসবেস্টস শিল্পের পক্ষে কাজ করছে এবং অ্যাসবেস্টস শিল্পের কাছ থেকেই তাদের ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই সংগঠন অ্যাসবেস্টস শিল্পকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্রাজিলের সরকারি পরিসংখ্যানের ফলাফল নিয়েও কারচুপি করেছে। তাদের এই অবৈধ কার্যকলাপের জন্য যে সামাজিক ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রাজিলের মুদ্রায় ১ মিলিয়ন রিয়াল ক্ষতিপূরণ দাবি করেন সেই কৌঁসুলি। তিনি তার আর্জিতে প্রতিষ্ঠানটি খোলা রাখার অপরাধে প্রতিদিন ৫,০০০ রিয়াল করে জরিমানাও দাবি করেন। আইসিআইজের কাছে দেওয়া ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করেছেন, পরিবেশের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠান ২০০৬ সাল পর্যন্ত অ্যাসবেস্টস কোম্পানির কাছ থেকে ৮ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছে।

এই ইনস্টিটিউট বন্ধ করার জন্য ব্রাজিলের একজন আইনজীবীর উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টা বেশ অস্বাভাবিক। কারণ, ক্রাইসোলাইটের পক্ষাবলম্বনকারী বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে সরকারগুলোর সব সময়ই সুসম্পর্ক থাকে। আর এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তারা জনস্বাস্থ্যের পক্ষের কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়। রাশিয়া ২০০৮ সালে এক মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্রাইসোলাইট উৎপাদন করেছে। একটি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই শিল্পকে সহায়তা করার আহ্বান জানানোর পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাদের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন। উরালাসবেস্ট ক্রাইসোলাইট উৎপাদনে রাশিয়ার বৃহৎ কোম্পানিগুলোর একটি। সেখানকার শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি আন্দ্রেই খোলজাকভ ২০০৯ সালে দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "এমন একটি সময়ে রুশ ক্রাইসোলাইট উৎপাদকদের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস এলো, যখন আমরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপের মধ্যে রয়েছি।"

অ্যাসবেস্টস শিল্প ভারতে খুবই শক্তিশালী। পৃথিবীতে অ্যাসবেস্টস ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ভারতের নাম দ্বিতীয় স্থানে। ভারতের শুধু গুজরাট রাজ্যে ৪০০ অ্যাসবেস্টস কারখানা আছে। এগুলোর বেশির ভাগই রাজ্যটির আহমেদাবাদ শহরে। গ্রামীণ, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণকাজের জন্যই ভারতে বছরে অ্যাসবেস্টস উৎপাদন ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকারকর্মী মধুমিতা দত্ত এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট প্রডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃবৃন্দ সব সময়ই কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। মধুমিতা দত্ত তামিলনাড়ু রাজ্যে বসবাস করেন। সেখানেও অ্যাসবেস্টস ব্যবহার করে ঘরের ছাদ তৈরির একটি কারখানা রয়েছে এবং সেখানেও একই অবস্থা বিরাজমান। তিনি আইসিআইজে-এর কাছে পাঠানো এক ই-মেইল বার্তায় লিখেছেন, "পরিস্থিতিটা বেশ হতাশাজনক। এই শিল্প যত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে, রাজনৈতিক মহলে তাদের প্রভাব তত বাড়ছে। সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের হস্তক্ষেপ (সরকারি সমীক্ষায় অর্থ সরবরাহ করা) আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের প্রচার-প্রচারণাও হয়ে উঠছে আগ্রাসী।" একটি সরকারি সূত্র আইসিআইজেকে জানিয়েছে, ১৯৮৫ সালে উৎপাদক সমিতি কারখানাগুলোর কাছ থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। অ্যাসবেস্টস বিরোধী জনমত যত সংগঠিত হচ্ছে, প্রতিবছর তাদের প্রাপ্তির ঝুলি তত বড় হচ্ছে। এদের মাধ্যমে পত্রিকায় 'অ্যাডভারটোরিয়ালস' অর্থাৎ একধরনের বিজ্ঞাপনধর্মী লেখা ছাপিয়ে অ্যাসবেস্টসে তৈরি পণ্যের

নিরাপত্তা এবং মূল্য বিষয়ে ভ্রান্ত খবর ছড়ানো হচ্ছে। এই সমিতির একজন সদস্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের বার্ষিক বাজেট ৮ মিলিয়ন থেকে ১৩ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

এসিপিএমএ তাদের ওয়েবসাইটে "ক্রাইসোলাইট ব্যবহৃত পণ্য শ্রমিক, পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ" এমন বক্তব্য প্রচার করলেও চলতি বছরের শুরুর দিকে কর্তৃপক্ষ আহমেদাবাদে ৪৮ বছরের প্রাচীন 'গুজরাট কম্পোজিট লিমিটেড'-এর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অমান্য করার দায়ে ফৌজদারি আইনে চারটি মামলা করে। গত দশকে এই কোম্পানির ৭৫ জন শ্রমিক ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

গবেষকেরা অনুমান করছেন, অদূর ভবিষ্যতে চীন অ্যাসবেস্টস সম্পর্কিত রোগের বিস্ফোরণ ঘটাবে পৃথিবীতে। সম্প্রতি ফিনল্যান্ডে পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা একটি ইনস্টিটিউট একটি সূত্র আবিষ্কার করেছে। তারা বলছে, একজন ব্যক্তি ১৭০ টন অ্যাসবেস্টস উৎপাদন এবং ব্যবহারের পর মেসোথেলিওমায় আক্রান্ত হন। তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এভাবে এক বছরে ৩৭ হাজার মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য উন্নত দেশের মতো এই রোগের অভিজ্ঞতা চীন লাভ করেনি। কারণ, সত্তরের দশকে তাদের দেশে অ্যাসবেস্টস পণ্য ব্যবহারের হার কম ছিল। কিন্তু চীনের অবস্থা বদলে গেছে। তারা এখন এই খনিজের সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী। ইউরোপের 'এজেন্সি ফর সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাট ওয়ার্ক'-এর পরিচালক টাকালা অনুমান করছেন, ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিবছর চীনে অ্যাসবেস্টস সম্পর্কিত পণ্য ব্যবহার করার কারণে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। চীনে বর্তমানে ১ হাজার অ্যাসবেস্টস খনি রয়েছে। এসব খনিতে শ্রমিকের সংখ্যা ১ মিলিয়ন এবং বছরে দেশটিতে ক্রাইসোটাইলের চাহিদা রয়েছে ৬ লাখ মেট্রিক টন।

ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে এই খনির শ্রমিকেরা বস্তায় ভরে অ্যাসবেস্টস ভাঙতে নিয়ে যায় মিল ইউনিটে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন, ফুসফুস বিনষ্টকারী বিষাক্ত এই তন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে শ্রমিকদের সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

কানাডার বিতর্কিত ভূমিকা

কানাডার মতো আর কোনো দেশ এত প্রবলভাবে ক্রাইসোটাইলের স্বার্থ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ১৯৮৯ সালে আমেরিকার 'এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি' যখন অ্যাসবেস্টস ব্যবহার বন্ধে রুল জারি করে, তখন কানাডা একটি শিল্প-সংক্রান্ত মামলার মাধ্যমে রুলটি উল্টে দেয়। এক দশক পর ফ্রান্স যখন অ্যাসবেস্টসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কানাডা পুনর্বার ব্রাজিলের সঙ্গে জোট বেঁধে একটি অসফল বিতর্ক তৈরি করে। সর্বশেষ ২০০৮ সালে জাতিসংঘ যখন ক্রাইসোটাইলকে রটারডাম কনভেনশনের ৩ নম্বর তফসিলের অধীনে নথিবদ্ধ করার সুপারিশ করে, তখনো কানাডা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই কনভেনশন এমন একটি চুক্তি, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু রপ্তানিকারকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেসব পণ্যের ঝুঁকি এবং কোনো নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করার জন্য। কিন্তু কানাডা, ভারত এবং আরও কয়েকটি দেশ মিলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস করতে দেয়নি। ২০০৪ সাল পর্যন্ত মোট চারবার এই প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত ২০১১ সালের আগে আর এই সুযোগ আসবে না। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিলা লোগান বলেন, "আমরা জানতাম, এ রকম প্রস্তাব সহজে অনুমোদিত হবে না। তফসিল ৩ আসলে প্রায় কালোতালিকার মতো বিষয়। তারপরেও এমন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু আছে, যা বহু দেশ আমদানি অব্যাহত রাখবে। আশঙ্কার জায়গাটা হচ্ছে, তখন রপ্তানিকারক দেশগুলো সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলবে, কনভেনশনের আওতাভুক্ত কোনো কিছুই আমরা রপ্তানি করছি না। যদিও কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, ক্রাইসোটাইল ক্যানসারের জন্য নীল অথবা খয়েরি অ্যাসবেস্টসের চাইতে কম আশঙ্কাজনক। নীল ও খয়েরি অ্যাসবেস্টস অ্যাম্ফিবোলস গোত্রভুক্ত। কিন্তু শিলা মনে করেন, "এক্স-রে গামা-রের চেয়ে কম ক্ষতিকর হতেই পারে। কিন্তু আমি দুটির কোনোটারই মুখোমুখি হতে চাই না। এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তা।"

আজকের পৃথিবীতে কানাডা পঞ্চম বৃহৎ অ্যাসবেস্টস উৎপাদক এবং চতুর্থ বৃহৎ রপ্তানিকারক দেশ। ২০০৮ সালে দেশটি ৯৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অ্যাসবেস্টস তন্তু রপ্তানি করেছে। এই পরিমাণ অ্যাসবেস্টস পাওয়া গেছে কুইবেকে অবস্থিত দুটি খনি থেকে। ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউট বলছে, এখানে ৭০০টি প্রত্যক্ষ এবং ২,০০০ অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। যদিও কর্মসংস্থানের এই সুযোগ বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হবে না, কিন্তু তারপরেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া সমালোচনার মুখেও এই শিল্প টিকে রয়েছে। কানাডার এই ক্রাইসোটাইল রপ্তানি নিয়ে সেখানকার ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের কাছে দেশটির প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং চিকিৎসকেরা অসংখ্য প্রতিবাদলিপি পাঠান। কিন্তু কুইবেকের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয় আইসিআইজের কাছে পাঠানো বক্তব্যে জানায়, "ক্রাইসোটাইলকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই এর রপ্তানি বন্ধ করার কোনো কারণ নেই। ভালো মানের অবকাঠামো তৈরির জন্য উন্নয়নশীল

দেশগুলোতে ক্রাইসোটাইলের চাহিদা রয়েছে। আমাদের এই চাহিদা ছিল। তা ছাড়া ক্রাইসোটাইলের বিকল্প কোনো পণ্য যে নিরাপদ, তা এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।”

ক্রাইসোটাইল ইনস্টিটিউটকে অর্থায়ন করার জন্য ২০০৪ সালে মন্ত্রণালয় একটি অ্যাসবেস্টস গবেষণা গ্রুপকে ৭ লাখ ৪৮ হাজার কানাডিয়ান ডলার দেয়। একজন সরকারি মুখপাত্র জানান, এখন একেবারে নিষ্ক্রিয় এই গ্রুপ পুরোনো দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রণালয়ে তাদের কার্যালয় খুলে বসেছে।

ক্রিস্টিয়ান পারাদিস কানাডার রক্ষণশীল সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী। তিনিও এই শিল্পের একজন বড় সমর্থক। কুইবেকের থেটফোর্ড খনি এলাকায় এই পারাদিস একদা অ্যাসবেস্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। আইসিআইজের কাছে পাঠানো বক্তব্যে পারাদিস বলেন, “১৯৭৯ সাল থেকে কানাডা ক্রাইসোটাইলের নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে সমর্থন করে আসছে এবং এখনো সরকার সেই অবস্থানেই আছে। ক্রাইসোটাইল নিষিদ্ধ করাটা প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ নয়। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, কানাডায় উৎপাদিত এবং রপ্তানি করা ক্রাইসোটাইল তন্তু নিরাপদে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যায়।”

২০০৯ সালে কানাডা ১ লাখ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন ক্রাইসোটাইল বিদেশে রপ্তানি করেছে। এর অর্ধেক রপ্তানি হয়েছে ভারতে। বাকিটা গেছে থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে। কিন্তু তাদের দেশে গল্পটা ভিন্ন। ২০০৬ সালে কানাডায় ব্যবহৃত ক্রাইসোটাইলের পরিমাণ মাত্র ৬ হাজার টন। কানাডা কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কুইবেকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং ইনোভেশন অ্যান্ড এক্সপোর্ট ট্রেড মিলে জেফ্রি খনিটির টালমাটাল অবস্থা কাটাতে ৫৮ মিলিয়ন কানাডীয় ডলার ঋণ দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। সেই খনির মালিকপক্ষ ঋণ পেলে বছরে ২০ লাখ টন ক্রাইসোটাইল এশিয়ায় রপ্তানি করার আশাবাদ ব্যক্ত করে।

অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমির আতারান এই বিষয়ে তার দেশের অবস্থানের জন্য লজ্জা প্রকাশ করে বলেন, “এটা তো এখন পরিষ্কার, প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার এবং তার সরকার বর্তমানে এই খাতে তাদের কর্মপদ্ধতি যে মানুষের মৃত্যু ডেকে আনছে, তা মেনে নিয়েছেন। তাদের কাছে বিষয়টা সহনীয়। তারা এটাও জানেন যে নিয়ন্ত্রণের অভাবেই এমনটা ঘটছে।”

বিজ্ঞানীদের ভূমিকা

ডেভিড বার্নস্টেইন একজন বিষক্রিয়াবিদ (টক্সিকোলজিস্ট)। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে তিনি ক্রাইসোটাইল নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন খনিমালিকের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়ে। চলতি বছরের মার্চ মাসে তিনি আমেরিকার ইউটা রাজ্যের সল্টলেক সিটিতে সোসাইটি অব টক্সিকোলজির বার্ষিক সভায় তার নতুন গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি জানান, একটি ইঁদুর যদি ক্রাইসোটাইল অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে দিনে ছয় ঘণ্টা করে টানা পাঁচ দিন থাকে, তাহলেও ইঁদুরের দেহে খারাপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ক্রাইসোটাইলের তন্তু প্রাণীর শরীরে বিশেষ করে ফুসফুস থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এতে প্রাণিদেহে ক্যানসারের লক্ষণ পাওয়া যায় না। সংস্পর্শে থাকার মাত্রা ৫০ ভাগ বেশি হলেও সে রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের মাধ্যমে দেখলে এই তন্তুগুলোর বিভিন্ন আকৃতি স্পষ্ট হয়। ক্রাইসোটাইল তন্তুগুলো খুবই পাতলা, গোল করে রাখা চাদরের মতো দেখায়। অ্যামোসাইট বা অন্য অ্যামফিবোলস দেখতে শক্ত রডের মতো।

এখনো অপ্রকাশিত এই গবেষণাপত্রের জন্য অর্থায়ন করেছে আটলান্টা রাজ্যের জর্জিয়া-প্যাসিফিক করপোরেশন। এই কোম্পানি একদা ঘরের দেয়াল জোড়া লাগানোর জন্য বিশেষ ধরনের আঠালো বস্তু তৈরি করত, যাতে ৫ শতাংশ ক্রাইসোটাইল মিশ্রিত থাকত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জিয়া-প্যাসিফিক কর্পের বিরুদ্ধে মেসোথেলিওমায় আক্রান্ত কিছু মানুষ মামলা করেন। তাদের অভিযোগ ছিল, কোম্পানিটি তাদেরকে ক্রাইসোটাইলের সংস্পর্শে এনেছে। জর্জিয়া-প্যাসিফিকের বিষক্রিয়াবিদ স্টুয়ার্ট হোমের সঙ্গে যৌথভাবে করা বার্নস্টেইনের সাম্প্রতিক গবেষণা হয়তো কোম্পানিটির জন্য স্বস্তিকর সংবাদ বয়ে আনবে।

অ্যাসবেস্টস বাণিজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব বিজ্ঞানী কাজ করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বার্নস্টেইন। এ ধরনের বিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে ক্রাইসোটাইলের পক্ষে বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশ করা এবং এই বস্তু যে নিরাপদ, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া। এই কোম্পানিগুলো গবেষণাপত্র তৈরি করার জন্য লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে চলেছে এবং গবেষণাপত্রের ফলাফল নিয়ে ভারত থেকে কানাডা পর্যন্ত আলোচনা করছে তাদেরই নিয়োগ করা একদল তদবিরকারী। বার্নস্টেইনের কাজ এখন পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে ৪৬০ বার। জিম্বাবুয়ের ফাইন্যান্সিয়াল গেজেট, হংকং থেকে প্রকাশিত সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট ছাড়াও আরও বহু প্রকাশনায় তার বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। তার

জীবনবৃত্তান্ত ঘাঁটলে মনে হবে ক্রাইসোটাইলের স্বার্থ রক্ষায় পৃথিবীর পথে তিনি একক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর ১৯টি দেশে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, চীন, কলম্বিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এখানে উল্লেখ্য, তার এই দীর্ঘ ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে এই কোম্পানি। আইসিআইজের সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বার্নস্টেইন এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বার্নস্টেইনের অ্যাসবেস্টস-বিষয়ক সব কাজই এই কোম্পানি অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানসংক্রান্ত বৈঠকগুলোতেও বার্নস্টেইনই তাদের অন্যতম মুখপাত্র হয়ে লড়াই করেন। বার্নস্টেইন জানেন না সমীক্ষাগুলোতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অর্থের সিংহভাগই ব্যয় হয় সুইজারল্যান্ডের বাসেলের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ওপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। আদালতের নথি থেকে জানা যায়, ইউনিয়ন কার্বাইড নামে একটি কোম্পানি ২০০৩ ও ২০০৫ সালে বার্নস্টেইনকে তার কাজের জন্য ৪ লাখ ৬২৩ ডলার দিয়েছে।

সল্টলেক সিটিতে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের আগের দিন হোটেলের লবিতে বসে আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বার্নস্টেইন স্পষ্টভাবে জানান, জর্জিয়া-প্যাসিফিক কোনোভাবেই তার ক্রাইসোটাইল-বিষয়ক গবেষণাপত্রকে প্রভাবিত করেনি এবং অন্য কোনো করপোরেট প্রতিষ্ঠান তার পেছনে অর্থ ঢালেনি। তিনি বলেন, "আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। তাই যেকোনো গ্রুপের হয়েই তা করতে পারি।" বার্নস্টেইন ক্রাইসোটাইলকে একটি অনিয়ন্ত্রিত বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, "এটি বিজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়নি। আমি বিশ্বাস করি না এই সাদা, ভঙ্গুর তন্তু মেসোথেলিওমা রোগের কারণ। এই উপাদান যদি খুব বেশি মাত্রায় কারও সংস্পর্শে আসে, তাহলে ফুসফুসে ক্যানসার হতে পারে।"

বার্নস্টেইনের ইঁদুর নিয়ে গবেষণা বিষয়ে তার সহকর্মী গবেষকদের সমালোচনা আছে। আমেরিকার দক্ষ গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত 'এজেন্সি ফর টক্সিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড ডিজিজ রেজিস্ট্রি'-এর একটি প্যানেল তাদের গবেষণা শেষে জানাচ্ছে, ইঁদুর মানুষের চেয়ে ১০ গুণ বেশি দ্রুত অ্যাসবেস্টসের সূক্ষ্ম কণা ফুসফুস থেকে দূর করতে সক্ষম। তারা বলছেন, বার্নস্টেইনের ইঁদুরদের মানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময় অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে রাখা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা মাস অথবা বছর ধরে এই অ্যাসবেস্টস তন্তু শ্বাসের সঙ্গে ভেতরে টেনে নিচ্ছেন। ফিলাডেলফিয়ার 'স্কুল অব পাবলিক হেলথ'-এর ডা. আর্থার ফ্রাঙ্ক মনে করেন, "কেউ যদি এই উপাদানের সংস্পর্শে খুব বেশি না আসে, তারপরেও এক দিনের জন্য সংস্পর্শে এলেই মানুষ অথবা কোনো প্রাণীর মেসোথেলিওমায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাপত্রগুলো তাই বলে। কোনো মানুষ বা প্রাণী যদি এক মাস এই ক্ষতিকর বস্তুর সংস্পর্শে থাকে, তাহলে ঝুঁকি দ্বিগুণ হয়ে যায়।"

জে. করবেট ম্যাকডোনাল্ডের বয়স ৯২ বছর। ক্রাইসোটাইলের ওপর তিনি ৩০টির বেশি গবেষণা-প্রবন্ধ লিখেছেন। চিকিৎসাবিষয়ক জার্নালে তার লেখা কম করে হলেও ১,৫০০ বার উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি জানান, ১৯৬৪ সালে কানাডার সরকার তাকে অ্যাসবেস্টস খনি নিয়ে কাজ করতে বলে। বদলে তিনি কুইবেক অ্যাসবেস্টস মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অর্থায়নের জন্য আবেদন করেন। তারা রাজিও হয়ে যায়। এই কাজের ক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে নিউইয়র্কের মাউন্ট সাইনাই স্কুল অব মেডিসিনের ডা. আরভিং সেলিকফের একটি গবেষণাপত্র। সেখানে বলা হয়েছে, তাপনিরোধক পণ্য তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে তুলনামূলকভাবে কম আসে এবং তারাই মেসোথেলিওমা নামক ক্যানসারে বেশি মারা যাচ্ছে।

তামাকশিল্পের শিক্ষা

খনিশিল্পের সমিতিগুলোর ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের বিবরণী থেকে জানা যায়, তারা তখনই ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছিল। অ্যাসবেস্টসজনিত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের আইনজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া এই বিবরণী থেকে আরও জানা যায়, তারা তামাকশিল্পকে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছিল। বৈঠকের শেষে তারা একমত হন যে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাকাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নির্ভর করা যাবে না। এসব কাজ যাতে সরকারের হাতে গিয়ে না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। গবেষণার কাজের জন্য নিজস্ব উদ্যোগের ওপর সেই বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে তারা তামাকশিল্পের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, "তারা এ ধরনের কাজ নিজেরাই করছে। আর তাতে এই শিল্পের অবস্থান এখন অনেক সুদৃঢ়।"

সেই বৈঠকের ৪৫ বছর পরে এসে ম্যাকডোনাল্ড অ্যাসবেস্টসের পক্ষাবলম্বনই করছেন। তার মতে, কুইবেকে শ্রমিকদের মধ্যে মেসোথেলিওমা ছড়িয়ে পড়ার জন্য ক্রাইসোটাইল দায়ী নয়। ক্রাইসোটাইলে সংক্রমণের জীবাণুর উপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু

ক্রাইসোটাইল এ জন্য দায়ী নয়। তার অনুমান, বিষাক্ত উপাদানটি হচ্ছে ট্রেমোলাইট; একধরনের অ্যাম্ফিবোল। এ ধরনের প্রচার চালানোর পরও তিনি জোর গলায় বলেন, তাদের কোনো কাজ অ্যাসবেস্টস শিল্পের মাধ্যমে প্রভাবিত নয়, বরং তারা এ ধরনের গবেষণার ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামায় কম।

আমেরিকার রোডি আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ডেভিড এগিলম্যান ক্রাইসোটাইলকেই রোগ ছড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "কোনো কোনো গবেষক এবং আইনজীবী বিতর্ক তৈরির জন্য মেসোথেলিওমা ক্যানসারের কারণ হিসেবে মাঙ্কি ভাইরাসের জীবাণু সংক্রমিত পোলিও টিকাকে দায়ী করেন। তারা তামাকশিল্পের মালিকদের মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পাল্টে দিয়ে সাধারণ জনগণের মনোযোগ ঝুঁকির দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ওার ক্ষেত্রে সফল বলে মনে হয়েছে।"

বার্নস্টেইন এবং ম্যাকডোনাল্ডের তত্ত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণার চাপের মুখে থাকা একটি শিল্পকে সহায়তা করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে অ্যাম্ফিবোল নামক জীবাণু খনিশ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ছিল। দেশটিতে ২০০৮ সালে এই জীবাণু বহনকারী নীল ক্রসেডুলাইটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাদা অ্যাসবেস্টস কি তাহলে খয়েরি অথবা নীল অ্যাসবেস্টসের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর? এমন প্রশ্নের উত্তরে গবেষকেরা বলেন, অবশ্যই কম ক্ষতিকর। তবে এটি মোটেই নিরাপদ নয়।

যেসব গবেষক ক্রাইসোটাইল শিল্পকে রক্ষা করতে চান তাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। তাদের ঝোঁক থাকে মেসোথেলিওমার দিকে। কারণ, আদালতে এই রোগের বিষয়ে বেশি মামলা হয়। ধরে নেওয়া হয় অ্যাসবেস্টস থেকে যেসব রোগ ছড়ায়, সেগুলোর মধ্যে এটিই অন্যতম। কিন্তু ফুসফুসে ক্যানসারের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায় এখানে। 'ইউএস অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর মান পর্যালোচনা বিভাগের সাবেক পরিচালক পিটার ইনফ্যানটের মতে, ক্রাইসোটাইল ফুসফুসে ক্যানসারের জন্য একটি মারাত্মক উপাদান এবং এটি আরও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কতক্ষণ সময় এই তন্তু ফুসফুসে থাকে, সে বিষয়ের ওপর সবাই বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ভুলে যায়, এই তন্তু শরীরের কোষে আক্রমণ করেই আবার উধাও হতে পারে। আর তাতেই তা ডিএনএ ধ্বংস করে ক্যানসার রোগের জন্ম দিতে পারে।

ক্যাসেলম্যান দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসবেস্টসের বিকল্প অনুসন্ধান করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য তিনি সেলুলোজ তন্তু ব্যবহার করে ঘরের ছাদ, পাইপ ইত্যাদি তৈরির বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা উৎপাদন করতে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি ব্যয় হবে। তার ভাষায়, "উৎপাদিত বিকল্প পণ্যগুলো ক্রাইসোটাইলের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু ক্রাইসোটাইলের মতো এদেরকে কাটলে, ছিদ্র করলে বা ধ্বংস করলে এসবের ধূলিকণা থেকে ক্যানসারের ক্ষতিকর জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে না।"

আশ্বস্ত করার মতো বিভিন্ন সমীক্ষা প্রকাশ বা মিলিয়ন ডলারের বিপণন পরিকল্পনা থাকার পরেও পৃথিবীজুড়ে অ্যাসবেস্টস শিল্প ঝোড়ো বাতাসের মুখোমুখি পড়েছে। বিভিন্ন দেশে অ্যাসবেস্টসের ওপর নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বাড়ছে। চীন, ব্রাজিল ও ভারতের মতো আর যেসব দেশে উচ্চ হারে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়, সেখানে স্বাস্থ্য এবং শ্রম খাতে সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে, যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া দেশ কানাডা অ্যাসবেস্টস রপ্তানি করায় আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

বিজ্ঞানী বার্নস্টেইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাদা অ্যাসবেস্টস নিরাপদ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, এই বক্তব্যে অটল আছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন অথবা বিভিন্ন দেশের সরকার একমত না হলেও তাতে তার কিছু যায় আসে না। বার্নস্টেইনের কথা হচ্ছে, "বিজ্ঞান একদিন প্রকৃত সত্য প্রকাশ করবে।"

পরিশিষ্ট

জিম মরিস

‘ডেঞ্জার ইন দ্য ডাস্ট’ প্রকল্পটির সূচনা হয় স্বাস্থ্য খাতে আমার দীর্ঘদিনের দুই খবরের উৎসের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম, “এমন কোনো স্টোরি কি আছে, যা সম্পর্কে মানুষ জানে না?” তারা দুজনই আমাকে বলেছিলেন অ্যাসবেস্টস বিপণন ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে। তাদের মতে, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ হয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশ চীন এবং ভারতে অ্যাসবেস্টস বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ।

আমি প্রথমে কাজ শুরু করি তথ্যের মনুষ্য সূত্রদের নিয়ে। তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি অথবা টেলিফোনে কথা বলি। তারপর আমি বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করি। হাতে পাওয়া তথ্য গোছানোর জন্য আমি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিনি। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য আমি ব্রাজিলে যাই এবং সেখানকার ফেডারেল সরকারের একজন শ্রম পরিদর্শককে অনুসরণ করতে শুরু করি। তিনি সিকি শতাব্দী ধরে তিনি সেখানে অ্যাসবেস্টসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

আমেরিকায় তথ্যের স্বাধীনতাবিষয়ক আইন রয়েছে। কিন্তু এই স্টোরিতে তার খুব বেশি ব্যবহার হয়নি। আমার স্টোরিতে অন্য দেশগুলোর বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমরা আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন নথি, জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণগুলো এই স্টোরিতে কাজে লাগাই। এগুলো জটিল এবং বিতর্কিত ইস্যুতে সরকারি রেকর্ড হিসেবে কাজ করেছে।

আমরা কানাডা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও ভারতে বিভিন্ন তদবিরের নথিপত্র হাতে পাই। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ছিল অসম্পূর্ণ। আমরা চীন ও মেক্সিকো থেকে এ ধরনের কোনো নথি উদ্ধার করতে পারিনি। তাই অ্যাসবেস্টস শিল্প খাত তাদের পণ্যের প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ আমাদের কাছে ছিল আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন ডলার। আশির দশকে ব্যয় করা এই অর্থের অঙ্ক আমাদের হিসাবে অনেক কম।

দীর্ঘ ৯ মাস আমার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তথ্যের জন্য। আমি এই স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিনি। এই স্টোরির সবচেয়ে দুরূহ পর্বটি ছিল টুকরো টুকরো স্টোরিকে সমন্বয় করে লেখা। প্রদায়কদের স্টোরিগুলো সম্পাদনা করাও আমার জন্য কখনো কঠিন হয়েছে। কারণ, তাদের মাতৃভাষা ইংরেজি ছিল না।

বিবিসি আমাদের সহযোগী হওয়ার পর থেকেই স্টোরিটি বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে। ২০১০ সালের জুলাই মাসে বিবিসি ওয়ার্ল্ড টিভি ডকুমেন্টারি বিভাগে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। বিবিসি রেডিওর ওয়ার্ল্ড সার্ভিস বিভাগেও এক ডজনের বেশি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। ‘ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস’ সংগঠনটি তাদের অনলাইনে সাত পর্বের একটি ধারাবাহিক স্টোরি প্রচার করে। ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ে স্টোরি প্রকাশিত হয়। ১৫০টি দেশের প্রায় ৪০০-এর বেশি সংবাদমাধ্যম, ব্লগ এবং ওয়েবসাইটে প্রায় ২০টি ভাষায় লাখ লাখ মানুষের কাছে স্টোরিটি পৌঁছে যায় চোখের পলকে।

স্টোরির প্রতিক্রিয়া আমার কল্পনার বাইরে ছিল। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য খাতের সক্রিয় কর্মীরা এই স্টোরিকে ব্রাজিল, ভারত ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক অ্যাসবেস্টস ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য ব্যবহার করে। এই স্টোরি সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া ফেলে কানাডার রপ্তানির ওপর। তারা ভারতে অ্যাসবেস্টসের বড় রপ্তানিকারক। দেশটির লিবারাল পার্টির জনপ্রতিনিধি মাইকেল ইগনাটিফ এই রপ্তানি বন্ধের জন্য আহ্বান জানান। তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি সচেতনতা বার্তাও প্রচার করেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় কানাডীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ৭ হাজার চিঠি যায় রপ্তানি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে। কানাডার গণমাধ্যম অ্যাসবেস্টস শিল্পের জন্য এই প্রতিক্রিয়াকে জনসংযোগ সুনামি বলে আখ্যা দেয়। কানাডার সচেতন মহল কুইবেকের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে প্রদেশটির একমাত্র অ্যাসবেস্টস খনিটি পুনরায় সক্রিয় করার জন্য ব্যাংকঋণ অনুমোদন না করার জন্য।

৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থের গতিপথ অনুসন্ধানঃ প্রতারণা ও অফশোর ফান্ড

১.

বিশাল জালিয়াতিতে রাষ্ট্রীয় সহায়তার অভিযোগ

অ্যালেন স্টানফোর্ডকে ফ্লোরিডার নিয়ন্ত্রকেরা– রাজ্যের শীর্ষ ব্যাংকিং আইনজীবীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও– অনেক ক্ষমতা দিয়েছিলেন ব্যাংকার, যার বিরুদ্ধে এসেছে বিনিয়োগকারীদের ৭ বিলিয়ন ডলার জালিয়াতির অভিযোগ।

লুসি কোমিসার, মাইকেল সালাহ
এবং রব ব্যারি

ভূমিকা

বার্নি ম্যাডফের কথা সবাই শুনেছেন। আমেরিকান কর্তৃপক্ষের অগোচরে তিনি কীভাবে হাজারো মানুষের জীবন নষ্ট করেছেন এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার চুরি করেছেন, সেগুলো সবাই জানেন। নিচের গল্পটি কিছু দিক দিয়ে আরও নাটকীয়; কারণ, এটি বর্ণনা করে একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক জালিয়াতির কথা, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছে এবং সহায়তা করেছে। বিষয়টি সামনে আনা লুসি কোমিসার সেসব অল্প কয়েকজন সাংবাদিকের একজন, যারা অফশোর ব্যাংকিংয়ের বিষয়গুলো বোঝেন এবং নিয়মিত সেদিকে নজর রাখেন। কেন খুব বেশি সাংবাদিক এই ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করেন না, তার কারণ, যেমনটি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন: "ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে লেখা রকেট সায়েন্স না; কিন্তু অর্থ পাচারের বিষয়টি হলো রকেট সায়েন্স।" কোমিসার মায়ামি হেরাল্ডে বিষয়টির একটি প্রাথমিক খসড়া উপস্থাপন করেছিলেন। তারপর পত্রিকাটির অন্য সাংবাদিকেরা সেখানে স্থানীয় পর্যায়ের সূত্র ও তথ্য যোগ করেন। খেয়াল করুন, কীভাবে তারা এটিকে ভীষণ রকম মানবিক করে তুলেছিলেন। আপনি যেন গল্পটি অনুভব করতে পারেন, সে জন্য তারা সেখানে বিপুল পরিমাণ আবেগ, স্থান ও অবস্থাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জড়ো করেছিলেন। প্রতিবেদনটির লেখকেরাও এই উত্তেজনার বাইরে ছিলেন না। প্রতিবেদনের প্রথম অংশটি জোরে জোরে পড়লে আপনি তাদের বিস্ময় শুনতে পাবেন। বিস্তৃত পরিসরের কিছু চরিত্র গল্পটিকে সামনে নিয়ে যায়। উদ্ধৃতির মধ্যে থাকা তাদের কিছু জবানবন্দি কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে হাস্যকরও হয়ে ওঠে। (যেমন: "বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার পর আমি কি ভিন্ন কিছু করতে চাইতাম? তারা যা করেছে, সেগুলো করতে বাধা দিতাম? হ্যাঁ, অবশ্যই।") নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফাঁকফোকরের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সংকটের সম্পর্ক আছে, তা নিয়ে আপনার যদি সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে এই গল্প আপনাকে নিশ্চয়তা দেবে।

দ্য মায়ামি হেরাল্ড থেকে
৫ জুলাই ২০০৯

বড় একটি জালিয়াতির ঘটনায় ব্যাংকিং সাম্রাজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেশ কয়েক বছর আগে, অ্যালেন স্টানফোর্ড ফ্লোরিডায় এসেছিলেন সাহসী একটি পরিকল্পনা নিয়ে: তিনি তার ব্যবসায়িক উদ্যোগে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের জন্য– গোপনে লাতিন আমেরিকানদের প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালে মায়ামির একটি অফিস থেকে, তিনি ক্রেতাদের কাছে ইনভেস্টমেন্ট বিক্রি এবং তাদের টাকা অ্যান্টিগায় পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু কাজটি করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত এক মিত্রের সহায়তা: একটি পয়সার কথাও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে না জানিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাঠানোর জন্য তাকে অনুমতি দিতে হতো স্টেট অব ফ্লোরিডাকে।

তিনি এটি পেয়েও যান।

ব্যাংকিং খাতে রাজ্যের প্রধান আইনজীবীর আপত্তি সত্ত্বেও– যার মধ্যে স্টানফোর্ডের অর্থ পাচার নিয়ে উদ্বেগও ছিল– নিয়ন্ত্রকেরা এমন বিপুল ক্ষমতার অনুমতি দেন, যা কোনো ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানিকে আগে দেওয়া হয়নি।

জালিয়াতির জন্য নিয়ন্ত্রকদের তদারকি ছাড়াই নতুন কোম্পানিটিকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়।

পরবর্তী দশকে, মায়ামি অফিস হয়ে ওঠে স্টানফোর্ডের বিতর্কিত ইনভেস্টমেন্ট বিক্রির সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গা। যেটি এখন আছে স্টানফোর্ড ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জালিয়াতি মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে।

“আইনি কোনো উপায়ে সেই অফিস খোলার পথ ছিল না,” বলেছেন রাজ্যের প্রধান ব্যাংকিং পরামর্শক রিচার্ড ডোনেলান, যিনি এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন।

ডোনেলান যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্টানফোর্ডের পরিকল্পনা রাজ্যের আইনের পরিপন্থী, এবং বিষয়টির সঙ্গে ক্যারিবিয়ানে অর্থ পাচারসংক্রান্ত উদ্বেগও আছে, এবং “স্টানফোর্ডের ব্যাংক, আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না”।

সুবিধা নেওয়া

দ্য মায়ামি হেরাল্ডের সংগ্রহ করা নথিপত্র থেকে জানা যায়, ফ্লোরিডার একটি ক্ষমতাবান আইনি সংগঠনের সহায়তায়, এ ধরনের প্রথম কোম্পানি খোলার অনুমতি পান স্টানফোর্ড: একটি বিদেশি ট্রাস্ট অফিস, যেটি নিয়ন্ত্রকদের এড়িয়ে যেতে পারে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ফ্লোরিডার ব্যাংকিং পরিচালক আর্ট সিমন এখন স্বীকার করেন যে, তিনি ভুল করেছিলেন।

“বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার পর, আমি কি ভিন্ন কিছু করতে চাইতাম? তারা যা করেছে, সেগুলো করতে বাধা দিতাম? হ্যাঁ, অবশ্যই।”

রাজ্য ও আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, ফ্লোরিডা রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত স্টানফোর্ডকে তার ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার সুযোগ দিয়েছে। তিনি অর্থের বিনিময়ে ক্রেতাদের আমানতের সার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট বা সিডি) দিয়েছেন। এ জন্য তাকে এগুলো কেনাকাটার কোনো রিপোর্ট রাখতে হয়নি।

নথিপত্র থেকে দেখা যায়, প্রথম ছয় বছরে স্টানফোর্ড ফিডুশিয়ারি ইনভেস্টর সার্ভিসেস নামে পরিচিত এই অফিস ক্রেতাদের কাছ থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলার উত্তোলন করেছে।

এখন, গত মাসে স্টানফোর্ডের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনার পর, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের জন্য মায়ামি অফিস গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে যারা এই বিশাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতনের পর এর সম্পদের খোঁজখবর করছেন, বলছেন আইনি বিশেষজ্ঞরা।

উচ্চ মুনাফার প্রলোভনে যারা আমানতের সার্টিফিকেট (সিডি) কিনেছিলেন, স্টানফোর্ড তাদের কাছ থেকে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

রেকর্ড থেকে দেখা যায়, এর মধ্যে কয়েক মিলিয়ন গেছে স্টানফোর্ডের বিলাসী জীবনযাপনের পেছনে। ব্যক্তিগত বিমান, দামি গাড়ি ও বাড়ি, যেগুলোর মধ্যে গেবলস এস্টেটে ১০.৫ মিলিয়ন ডলারের একটি বাড়িও ছিল, যেটি তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন।

যে বিনিয়োগকারীরা আমানতের সার্টিফিকেট কেনার জন্য মায়ামি সেন্টারের ২১ তলার বিলাসবহুল অফিসে ভিড় জমিয়েছিলেন, তারা এখন অর্থ ফিরে পাওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। বলছেন যে, তাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খোয়া গেছে।

“এত বিপুল পরিমাণ অর্থ খোয়া যাওয়াটা একেবারেই ন্যায্য নয়,” বলেছেন মার্গি মোরিনাগা। তার ৮৪ বছর বয়সী বাবা হারিয়েছেন ৪ লাখ ডলার।

সাবেক এমন ক্রেতাদের কেউ কেউ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আদালতে চিঠি পাঠাচ্ছেন; অন্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে সংগঠিত হচ্ছেন অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য।

রাজ্যের নথিপত্র অনুযায়ী, প্রথম ছয় বছরে মায়ামি অফিসে অন্তত ২,১০০ গ্রাহক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল।

দেশজুড়ে অন্যান্য স্টানফোর্ড কোম্পানির মতো, মায়ামি অফিসকেও তারা কী পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে এটি রিপোর্ট করতে হতো না। এভাবে তারা অর্থ পাচারবিরোধী আইন এড়িয়ে যেত।

বস্তুত, অফিসের কর্মীরা বিভিন্ন চুক্তি ও আমানত সার্টিফিকেট বিক্রিসংক্রান্তমূল কাগজপত্র অ্যান্টিগায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর রেকর্ডগুলো নষ্ট করে ফেলতেন।

সুরক্ষার কমতি

বছরের পর বছর ধরে মার্বেল মেঝে, প্রাচ্যের কার্পেট এবং দামি শিল্পকর্ম দিয়ে সাজানো উঁচু ভবনের অফিসগুলো বিনিয়োগকারীদের প্রাইভেসি দিয়েছে, কিন্তু সেখানে সুরক্ষা ছিল খুব কম।

কর্মকর্তাদের কোনো রেকর্ড রাখার বাধ্যবাধকতা না থাকায়, এসব অফিস থেকে অর্থ কোথায় গিয়েছে, তা শনাক্তের জন্য অনুসন্ধানকারীদের ভরসা করতে হয়েছে বিনিয়োগকারী ও অ্যান্টিগার ব্যাংকের ওপর, বলেছেন গ্রাহকদের আইনজীবীরা।

ফ্লোরিডার আর্থিক নিয়ন্ত্রক অফিসের কর্মকর্তারা এখন এক দশক আগের সেই সিদ্ধান্তগুলো পুনর্বিবেচনা করছেন। কিন্তু তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রাজ্যের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরিচালক লিন্ডা চ্যারিটি বলেছেন, "আমি আপনাকে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, কেউই নির্দিষ্টভাবে এসব অফিসকে নিয়ন্ত্রণ করেনি।"

চুক্তি অনুমোদন দেওয়া ফ্লোরিডার ব্যাংকিং পরিচালক সিমন বলেছেন, তার উচিত ছিল অফিসটিকে অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া।

"আমাদের আরও কড়া শর্তাবলি আরোপ করা উচিত ছিল, কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথায় গুরুতর কিছু প্রশ্ন এসেছিল," বলেছেন সিমন। রাজ্যের সাবেক এই জনপ্রতিনিধি ফ্লোরিডার আধুনিক ব্যাংকিং আইনকানুনের খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করেছিলেন।

তিনি বলেছেন, অফিসটির শুধু বৈদেশিক ট্রাস্ট সেবায় আগ্রহী মানুষদের তথ্য প্রদান করার কথা ছিল। আমানতের সার্টিফিকেট দেওয়া এবং অর্থ গ্রহণ করা নয়।

কিন্তু স্টানফোর্ড ও রাজ্য পর্যায়ের নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, সেখানে স্পষ্ট ভাষায় আর্থিক লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৬৩ বছর বয়সী সিমন রাজ্য সরকার থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মায়ামি হেরাল্ড থেকে ই-মেইলে একটি কপি পাওয়ার আগে তিনি চুক্তির ভাষাটি স্মরণ করতে পারছিলেন না।

কিন্তু মায়ামি হেরাল্ডের জন্য নথিপত্রগুলো পর্যালোচনা করা কয়েকজন আইনজীবী বলেছেন, এই চুক্তির দায়দায়িত্ব অনেকাংশেই বর্তায় সিমনের ওপর। "এই ঘটনায়, তিনিই চুক্তি প্রয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এখানে যে ধরনের পর্যালোচনা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, সেটি রাজ্যের পক্ষ থেকে করা হয়নি," বলেছেন ফোর্ট লোউরাডেল-এর সিকিউরিটিজ অ্যাটর্নি জেফরি সোন।

মায়ামির ব্যাংকিংবিষয়ক আইনজীবী হোসে সিরভেন বলেছেন, রাজ্য পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ হয়তো অফিসটিকে অনুমোদন দিতে পারত, কিন্তু তিনি অফিসের কর্মীদের অর্থ লেনদেনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

রাজ্যের প্রধান ব্যাংকিং পরামর্শক রিচার্ড ডোনেলান বলেছেন, তিনি মনেই করেননি যে স্টানফোর্ডের আদৌ একটি স্যাটেলাইট অফিস খোলার অধিকার ছিল।

"এটি কোনো আমেরিকান আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। আমি এই মতামত জানিয়েছিলাম। এখানে কোনো নিয়মনীতি ছিল না। ব্যাপারটি এমন ছিল যেন তারা একটি অফিস খুলেছে যেটি জুতা বা আইসক্রিম বিক্রি করে।"

উদ্বেগ বেড়েছে

ফ্লোরিডার ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের অ্যাটর্নি ডোনেলান (৫৮) বলেছেন, তার অন্য ধরনের উদ্বেগও ছিল। "ক্যারিবিয়ানে অর্থ সঞ্চালনের মতো যেসব ভূমিকা জনাব স্টানফোর্ড পালন করেছেন, তাতে সেখানে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইস্যু ছিল।"

সাত বছর আগে, আইল্যান্ড অব মন্টসেরাতে একটি ব্যাংকের মালিকানা থাকাকালীন কিছু সমস্যার মুখে পড়েছিলেন স্টানফোর্ড। যুক্তরাজ্যের একটি অর্থ পাচার অনুসন্ধানের সময় তিনি স্বেচ্ছায় নিজের লাইসেন্স পরিত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে দর-কষাকষির সময়, স্টানফোর্ডের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, স্টানফোর্ড যে ধরনের কোম্পানি গড়তে চেয়েছিলেন, তা নিষিদ্ধ করার মতো কোনো কিছু ফ্লোরিডার আইনে ছিল না।

তারা এটিও বলেছিলেন, নতুন কোম্পানিটি রাজ্যের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যেখানে কোম্পানিটিকে এমন অধিকারও দেওয়া হয়, এটি গ্রাহকদের জন্য অর্থ লেনদেন করতে পারবে, কিন্তু এটি ব্যাংক আকারে পরিচালিত হবে না।

চুক্তিপত্রে এ-ও উল্লেখ ছিল, কর্মীরা ক্রেতাদের আর্থিক পরামর্শ দিতে পারবেন না।

নৈতিকতার প্রসঙ্গ তুলে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি গ্রিনবার্গ ট্ররিগের সাবেক আইনজীবী কার্লোস লুমিয়েট। তিনি এই চুক্তির খসড়া তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত, মায়ামির কোম্পানিটি খোলার অনুমতি দেওয়া হয় একটি অনন্য ক্যাটাগরিতে: বিদেশি ট্রাস্ট কোম্পানির প্রতিনিধি অফিস। ফ্লোরিডায় এটি ছিল এ ধরনের একমাত্র অফিস।

ফ্লোরিডা রাজ্যের বাইরের ট্রাস্ট কোম্পানিকে ফ্লোরিডায় স্যাটেলাইট অফিস খোলার অনুমতি দেয় রাজ্য কর্তৃপক্ষ। এ ক্ষেত্রে তারা তাল মিলিয়ে চলে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর অনুগতদের সঙ্গে। কিন্তু এজাতীয় বিদেশি অফিসের ক্ষেত্রে ফ্লোরিডার আইনে কোনো ধারা নেই।

বৈদেশিক উদ্যোগগুলোর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থানীয় অফিস খোলার চেষ্টা আগেও করেছিলেন স্টানফোর্ড। ফলে রাজ্যের সঙ্গে এ-সংক্রান্ত আলোচনা তার জন্য প্রথম ছিল না।

এর আগে, স্টানফোর্ড গিয়েছিলেন মায়ামির অ্যাটর্নি বোম্যান ব্রাউনের কাছে, যিনি স্টানফোর্ডের প্রতিনিধি হওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাংকিং খাতের আইনজীবী হিসেবে কাজ করা ব্রাউন বলেছেন, স্টানফোর্ডের পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি বিষয় তার সঠিক মনে হয়নি।

"তিনি মায়ামিতে এমন একটি অফিস খুলতে চাচ্ছিলেন, যেটি ক্যারিবিয়ানের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের স্বার্থে কাজ করবে। আইডিয়াটি ছিল যে, সুরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রির লক্ষ্যে গড়া প্ল্যাটফর্মটি লাতিন আমেরিকান গ্রাহকদের আকৃষ্ট করবে," বলেছেন ব্রাউন।

কিন্তু, ব্রাউন বলেছেন, স্টানফোর্ড "কোনো কঠোর ব্যাংকিংসংক্রান্ত নিয়মনীতির মধ্যে যেতে বা সরকারি পর্যবেক্ষকদের সামনে পড়তে আগ্রহী ছিলেন না।"

সে সময়, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের "দুর্নাম ছিল পাইরেট ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে। এবং আমি এটির কোনো অংশ হতে রাজি ছিলাম না," বলেছেন ব্রাউন।

বাড়তে থাকা ব্যবসা

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ট্রাস্ট অফিস খোলার অনুমতি দেয় রাজ্য কর্তৃপক্ষ। তত দিনে স্টানফোর্ড তার সেরা পণ্যটি বের করে ফেলেছেন: আমানতের সনদ বা সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট (সিডি)।

সিডিগুলোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল: এটি অন্যান্য ব্যাংকের চেয়ে তুলনামূলক বেশি অর্থ প্রদান করত। কখনো কখনো দুই পয়েন্টের ব্যবধানে।

মায়ামিতে নোঙর করা বিদেশিদের জন্য বড় আকর্ষণ ছিল মায়ামি অফিস, বলেছেন চার্লস হেজলেট। তিনি একই ভবনে কাজ করতেন স্টানফোর্ডের আরেকটি ফার্মে।

"স্টানফোর্ডের কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যস্ত জায়গা ছিল ট্রাস্ট অফিস," বলেছেন হেজলেট। "আমাদের তুলনায়, তাদের ছিল বড় অফিস। ৩০ থেকে ৪০ জন মানুষ। সবাই সিডি বিক্রি করছে।"

হেজলেট বলেছেন, স্টানফোর্ডের অধীনে কাজ করা স্টকব্রোকারদেরও এই সিডি বিক্রির তাগাদা দেওয়া হতো।

মায়ামি অফিসের কথা দ্রুতই পুরো গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন রোসা মেহিয়া। চার বছর আগে তিনি তার বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন মায়ামি অফিসে।

তাদের ট্রাস্ট প্রতিনিধি, সামারিন্তা পেরেজ একটি পাঁচ বছর মেয়াদি ৩০০,০০০ ডলারের সিডি প্রস্তাব করেছিলেন, যেটি নাকি বেশির ভাগ ব্যাংকের চেয়ে বেশি মুনাফা দেবে।

তার বাবা, ৬৯ বছর বয়সী ডোমিনিকান রিপাবলিকের অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ট্রাস্টের চুক্তিপত্র ও একটি চেকে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই অর্থ যাওয়ার কথা ছিল অ্যান্টিগায় থাকা স্টানফোর্ডের ব্যাংকে, যারা সিডিটি প্রদান করেছিল।

"আমরা ভেবেছিলাম, টাকা সুরক্ষিতই থাকবে," বলেছেন মেহিয়া।

আইনজীবীর প্রশ্নের প্রসঙ্গ টেনে পেরেজ বলেছেন, স্টানফোর্ডের পতনের কারণে তার ক্যারিয়ার ছোট হয়ে গেছে।

মায়ামির অ্যাটর্নি জেফ্রি টিউ বলেছেন, ট্রাস্টের কর্মকর্তারা জানতেন না যে, সিডি বিক্রি থেকে আসা টাকাগুলো স্টানফোর্ড ও অন্যরা সরিয়ে ফেলছেন। "[মায়ামি ট্রাস্ট অফিসে] থাকা মানুষেরা ১০০ মিলিয়ন ডলারের পোর্টফোলিও সামলাচ্ছিলেন। মনে করছিলেন যে তারা তাদের গ্রাহকদের সহায়তা করছেন," বলেছেন টিউ।

তবে হ্যাজলেট মায়ামি অফিসের নির্বাহী পরিচালক, নেলসন রামিরেজের কাছে এসব সিডির বৈধতা নিয়ে উদ্বেগের কথা তুলেছিলেন ২০০২ সালে।

"আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি বলেছিলাম, টাকার অঙ্ক মিলছে না। আমার এসব সিডি নিয়ে আরও তথ্য দরকার," বলেছেন হ্যাজলেট। তিনি ২০০৪ সালে একটি ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত মামলার সময় স্টানফোর্ডের তত্ত্বাবধায়কদের কাছে এই ইস্যু তুলেছিলেন।

তিন বছর পর স্টানফোর্ড ছেড়ে যাওয়া রামিরেজ ফোন ম্যাসেজের কোনো উত্তর দেননি।

শেষ পর্যন্ত, হ্যাজলেটকে অ্যান্টিগার ব্যাংকে বিনিয়োগ, সিডিগুলোর ভিত্তিসংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে এত কম ডেটা ছিল যে "আমি আরও বেশি সংশয়ী হয়ে পড়ি," বলেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষরা এখন বলছে যে, ব্যাংকের বিনিয়োগের মূল্য অনেক বেশি দেখানো হয়েছিল। এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো ছিল বানোয়াট।

মায়ামি ট্রাস্ট অফিস খোলার পর, স্টানফোর্ডের আইনজীবীরা টেক্সাসেও একটি একই রকমের অফিস খোলার উদ্যোগ নেন। ২০০১ সালে টেক্সাস রাজ্য রাজিও হয়। কিন্তু বড় একটি পার্থক্য ছিল: টেক্সাসের অফিসের কোনো অর্থ ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছিল না।

টেক্সাস ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিংয়ের সহকারী পরামর্শক ডেবরাহ লুমিস বলেছেন, "আসলে, তারা সেখানে শুধু পণ্য বাজারজাত করতে পারত।"

কিন্তু মায়ামি অফিস ব্যস্ত ছিল ক্রেতা ও গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনে। এবং এটি দ্রুত বাড়ছিল। ২০০১ সালে ১৮ জন কর্মী থেকে ২০০৫ সালে কর্মীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬ জনে।

“বিশাল সতর্ক চিহ্ন”

রাজ্যের সঙ্গে চুক্তিতে ট্রাস্ট অফিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিল গ্রাহকদের আর্থিক পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে। তবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, স্টানফোর্ডের এসব সিডি বিক্রির বিষয়টিও রাজ্যের পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত ছিল।

“আমি আপনাকে বলতে পারি যে, সিডিগুলো সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসা উচিত,” বলেছেন সিকিউরিটিজ অ্যাটর্নি সোন। স্টানফোর্ডের সিডিগুলো উচ্চ মুনাফাও “বিশাল সতর্ক চিহ্ন” ছিল বলে সতর্ক করেছিলেন সোন। এ নিয়ে রাজ্যের তদন্তকারীদের দেখা উচিত ছিল যে, পণ্যগুলোর বৈধ বিনিয়োগের ভিত্তি আছে কি না।

নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যান্ড্রু স্টোলম্যান বলেছেন, প্রাত্যহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করায় রাজ্য কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

“আপনার নিজেকে এমন অবস্থানে রাখতে হবে যেখানে আপনি অন্তত চেষ্টা করতে পারেন জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত মানুষদের ধরার জন্য,” বলেছেন স্টোলম্যান। তিনি শিকাগোতে আইনি চর্চাও করেন।

নথিপত্র থেকে দেখা যায়, গত ১০ বছরে রাজ্যের পরীক্ষকেরা তিনবার অফিসটি পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু তারা শুধু এটি নিশ্চিত করেছেন যে, ১৯৯৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী সব কিছু করা হচ্ছে কি না।

২০০১ সালে এমন একটি পরিদর্শনের সময়, রাজ্য প্রতিনিধিরা খেয়াল করেছিলেন যে, অফিসের কর্মীরা নিয়মিতভাবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত নথি অ্যান্টিগায় পাঠায় এবং তারপর স্থানীয় কাগজপত্রগুলো নষ্ট করে ফেলে।

ফেব্রুয়ারিতে এসে অফিসটি চূড়ান্তভাবে বন্ধ করা হয়– স্টানফোর্ডের ব্যাংক নেটওয়ার্কসহ যখন ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন স্টানফোর্ড এবং তার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করে।

অফিসের আসবাবপত্র, চেরিউড ডেস্ক, ক্যাবিনেটগুলো এখন বিক্রি হচ্ছে।

মায়ামি অফিসের কাছে সিডি কিনে ৪ লাখ ডলার হারানো এক ব্যক্তির মেয়ে, রোসা মেহিয়া বলেছেন, বিনিয়োগকারীরা ভবনটির ২১ তলার অফিস ও কর্মীদের দেখে মুগ্ধ হতেন। “সবকিছু ছিল দারুণ। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের অর্থ সুরক্ষিতই থাকবে,” বলেছেন মেহিয়া।

পরিশিষ্ট

লুসি কোমিসার, স্বাধীন সাংবাদিক: প্রতিবেদনটির শুরু হয়েছিল এক সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে। সেই সূত্রের সঙ্গে আমি কাজ করেছি অফশোর ব্যাংক ও করপোরেট গোপনীয়তা-সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে কাজের আগেই। তিনি বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন, অ্যালেন স্টানফোর্ড ও ফ্লোরিডা ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটি চুক্তিসংক্রান্ত নথি আছে, যেখানে স্টানফোর্ডকে একটি অফিস খোলার এবং বিদেশে টাকা পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই এটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি প্রতিবেদনই ভিন্ন। কখনো কেউ আমাকে কিছু নথিপত্র দিয়েছে, কখনো নথিপত্র থেকে আমি সংশ্লিষ্ট অন্য মানুষের খোঁজ পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমার প্রথম সৌভাগ্য ছিল টিপটি পাওয়া। দ্বিতীয় সৌভাগ্যটি ছিল ব্যাংকিং খাতে কাজ করা এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া, যিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের আইনজীবী চুক্তিটির বিরোধিতা করেছিলেন। আমি অবশ্য এই ব্যক্তির নাগাল পেয়েছিলাম সম্ভাব্য সব জায়গায় যোগাযোগ করার মাধ্যমে, যারা ১০ বছর আগের ব্যাংকিং বিভাগ সম্পর্কে জানতেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আমি ফ্লোরিডার ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের কাছে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম। পাঠাতে বলেছিলাম এমন যেকোনো নথি, যেখানে অ্যালেন স্টানফোর্ডের ফ্লোরিডায় অফিস খোলা এবং বিদেশে টাকা পাঠানোসংক্রান্ত আলোচনা আছে। ফ্লোরিডার তথ্য অধিকার আইন খুবই ভালো এবং অনুরোধ পাঠানোর কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কিছু নথিপত্র পেয়ে যাই। যেগুলোর মধ্যে ছিল:

১. স্টানফোর্ডের সঙ্গে ব্যাংকিং বিভাগের সমঝোতা স্মারক; ২. একটি অভ্যন্তরীণ নথি, যেখানে এই ইস্যু এবং আইনজীবীর বিরোধিতাসংক্রান্ত আলোচনা ছিল। ব্যাংকিং বিভাগের আইনজীবী বলেছিলেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তিটি অবৈধ; এবং ৩. স্টানফোর্ডের আইনজীবীদের দাখিল করা সমঝোতা স্মারক, যেখানে এই অফিসের বৈধতা প্রসঙ্গে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

আমি সাধারণত যেসব মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাদের একটি তালিকা তৈরি করি। সব নাম রাখি একটি “কনট্যাক্ট” তালিকায় এবং “করণীয়” তালিকা দেখে নির্ধারণ করি যে কাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যোগাযোগ করার মতো ব্যক্তি ও সূত্রদের একটি ডেটাবেস রাখাটাও কাজের হতে পারে। আমি কার্ডস্ক্যান ব্যবহার করি, যেটির পেছনে আমার ১০০ ডলারের মতো খরচ হয় এবং এটি একটি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখানে একটি বিজনেস কার্ড প্রবেশ করালে ডেটাগুলো একটি কনট্যাক্ট পেজে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাজানো যায় (যেমন আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী, অর্থবাণিজ্য, তেল ও গ্যাস ইত্যাদি)। আপনি এখানে কোনো নাম যোগ করে ওয়েবসাইটের প্রবন্ধ থেকেও তথ্য নিয়ে আসতে পারেন। কেউ চাইলে এক্সেল বা অন্যান্য ডেটাবেস প্রোগ্রামও ব্যবহার করতে পারেন।

প্রতিবেদনটি একটি আকার নিতে শুরু করার পর, আমি সব ঘটনার একটি ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করেছি। নতুন তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি পরিবর্তিত হয়েছে। এ বিষয়ক কম্পিউটার ফোল্ডারটিতে অনেক নথিপত্র জমা হয়ে গেলে আমি সেগুলোর জন্য আলাদা ফোল্ডার তৈরি করেছি। সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র আলাদাভাবে সাজিয়ে রেখেছি যেন সেগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এবং সম্পাদক বা ফ্যাক্টচেকারদের কাছে পাঠানো যায়।

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে, আমি চেষ্টা করি সেগুলো ই-মেইল বা ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে নিতে। যেন একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকে। স্পিকার ফোনের মাধ্যমে, আপনি টাইপ করতে করতে বা নোট নিতে নিতেও ভয়েস রেকর্ডার চালাতে পারেন। (আপনার দেশে ফোন রেকর্ডার ব্যবহারসংক্রান্ত আইনকানুন দেখে নিতে ভুলবেন না।)

চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি লেখার ভিত্তি হিসেবে আমি বিভিন্ন ঘটনা, উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার একটি ধারাবাহিক বিবরণ ব্যবহার করি। বা একটি খসড়া তৈরি করি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আলাদা সেকশন তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এগুলো অন্য রকমভাবেও সাজানো থাকতে পারে। এভাবে আমি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর কথা ভুলে যাই না, সেগুলো অনেক আগে জানা হলেও। ধারাবাহিক একটি বিবরণ আমাকে বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফলোআপ করতেও সাহায্য করে।

এই প্রতিবেদন করার জন্য আমার কোনো আর্থিক সহায়তা ছিল না এবং অন্য কাজগুলো করার পাশাপাশি আমাকে এটির কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। কেউই আমাকে এই কাজটি করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেনি। অনেক মিডিয়াই (মূলধারার ও বিকল্প) এই প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চায়নি। বেশির ভাগ মিডিয়া এমনকি এ-সংক্রান্ত আলোচনা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদনটির কোনো জবাবও দেয়নি। আমার মতে এটি ছিল সম্পাদকদের বাজে সিদ্ধান্ত। এখানে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো চাপ ছিল না। মায়ামি হেরাল্ড এটি প্রকাশ করেছে; কারণ, স্টানফোর্ডের অফিসটি ছিল মায়ামিতে, এবং তাদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি ভালো ইতিহাস আছে।

মাইকেল সালাহ, দ্য মায়ামি হেরাল্ড: লুসি এরই মধ্যে প্রধান প্রধান নথি সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন, যেগুলোতে দেখা যায় ১৯৯৮ সালে রাজ্য কর্তৃপক্ষ ও স্টানফোর্ডের আইনজীবীদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে। এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের বড় একটি জালিয়াতি মামলার কারণে স্টানফোর্ডের ব্যাংকিং সাম্রাজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক দশক আগের ঘটনা। এ ছাড়া লুসি যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন ফ্লোরিডা রাজ্য সরকারের এক ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এটিকে পুরোপুরি অবৈধ বলেছিলেন। লুসি আরও কথা বলেছেন রাজ্যের ব্যাংকিং খাতের সাবেক পরিচালকের সঙ্গে, যিনি চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিলেন। এসবের কারণেই মায়ামিতে একটি অনিবন্ধিত ব্যাংক বা আর্থিক সুরক্ষাসংক্রান্ত অফিস খুলতে পেরেছিলেন স্টানফোর্ড।

কিন্তু এই ধরনের একটি প্রতিবেদন মায়ামি হেরাল্ডের প্রথম পাতায় ছাপানোর জন্য, এখানে আমাদের কিছু নিজস্ব রিপোর্টিংও যোগ করতে হতো, যেন রাজ্যের সিদ্ধান্তের পরিণতি ও প্রভাব কী হয়েছে, তা দেখানো যায়। লুসির তথ্যগুলো নিশ্চিত করার জন্য আমরাও একই মানুষদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করেছি। মায়ামির এই অফিস সত্যিই কীভাবে কাজ করে? এই অফিস থেকে সত্যিই কত টাকা স্টানফোর্ডের ক্যারিবিয়ান কর্মযজ্ঞে পাঠানো হয়েছে? সত্যিকারের ভিকটিম ছিলেন কারা? আমাদের আরও দেখাতে হতো যে, স্টানফোর্ডের পুরো ৭ বিলিয়ন ডলারের পনজি স্কিমে এই অফিসের ভূমিকা কী ছিল, এর সত্যিকারের গুরুত্বটা কোথায় ছিল।

প্রথমে, রাজ্যের পক্ষ থেকে বলতে চাওয়া হয়েছিল, এ-সংক্রান্ত বাড়তি কোনো নথিপত্র এখন উন্মুক্ত করা যাবে না; কারণ, এটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত চলছে। আমরা তখন বলেছিলাম, আলাদাভাবে তৈরি হওয়া যেকোনো নথি এবং এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন কোনো নথিই ফ্লোরিডার পাবলিক রেকর্ডস আইনের অধীনে গোপন রাখা যায় না। রাজ্য কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত রিপোর্টগুলো উন্মুক্ত করে। যেটি একটি জালিয়াতি মামলার জটিল সব সংযোগের চিত্র তুলে ধরে।

আমাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জটি ছিল সেসব মানুষের কাছে পৌঁছানো, যারা মায়ামি অফিসের ভুয়া সার্টিফিকেট কিনেছেন। আমরা স্টানফোর্ডের বিনিয়োগকারীদের কিছু ওয়েবসাইট ও ব্লগে গিয়েছি এবং সেখান থেকে ক্ষুব্ধ কিছু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, যারা এসব ভুয়া সিডি কিনেছিলেন। এবং তারা আমাদেরকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, তারা ভেবেছিলেন যে মায়ামি অফিসটি বৈধ ছিল এবং তারা আইনিভাবে বৈধ সুরক্ষাই কিনছেন। তারা এমনকি প্রমাণ হিসেবে তাদের সিডি কেনার নথিও আমাদের ফ্যাক্স করেছেন।

এসব নথিতে কী আছে, তা ভালোভাবে বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে দ্বিধা করবেন না। বিশেষভাবে সেগুলো যদি আর্থিক বা চিকিৎসাসংক্রান্ত নথি হয়ে থাকে। নথিপত্র ছাড়াও সেসব সত্যিকারের মানুষদের খুঁজে বের করুন, যারা বলতে পারবেন যে নথিতে কী বলা হয়েছে। আমরা মায়ামির এক ব্যাংকিংসংক্রান্ত আইনজীবীকে খুঁজে পেয়েছিলাম, যাকে স্টানফোর্ড নিয়োগ দিয়েছিলেন রাজ্যের সঙ্গে চুক্তির বিষয়গুলো প্রস্তুত করতে। কিন্তু তিনি কাজটি করেননি; কারণ, তিনি সন্দেহ করছিলেন যে স্টানফোর্ড এখানে অবৈধ কিছু একটা করার চেষ্টা করছেন। আমরা একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রাজি করিয়েছিলাম কথা বলার জন্য। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, অফিসটির ব্যস্ততম সময়ে সেটির চিত্র কেমন ছিল। বৈচিত্র্যময় সব শিল্পকর্ম, চেরি-উডের আসবাবপত্র, চামড়ায় মোড়ানো সোফা– সবকিছুই একটি বৈধ, উঠতে থাকা ব্রোকারেজের চিহ্ন।

আমরা একটি অপরাধের গল্প বলতে চেয়েছিলাম, কোনো অর্থবাণিজ্য-সংক্রান্ত গল্প নয়। লিখতে বসার আগে আমরা সব ধরনের রিপোর্টিং ও গবেষণা সেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। এটি ছিল খুব জটিল একটি বিষয়। এই ধরনের একটি প্রতিবেদনকে পাঠকের সামনে ভালোভাবে উপস্থাপনের জন্য স্পষ্টভাবে জানতে হতো যে, আমাদের হাতে কী কী জিনিসপত্র আছে। এর মানে, লেখা শুরুর আগে একটি বিস্তারিত আউটলাইন তৈরি করে নেওয়া। সত্যিকারের চ্যালেঞ্জটি ছিল ব্যাংকিং বা সুরক্ষাসংক্রান্ত নিয়মনীতির মতো জটিল বিষয়গুলো সহজে ব্যাখ্যা করা, যেন পাঠক সত্যিই বুঝতে পারে যে আসলেই কী ঘটেছিল এবং রাজ্যের বাজে সিদ্ধান্তের ফলে কত ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

লুসি কোমিসার: আমি প্রতিবেদনটির প্রভাব বাড়ানোর জন্য কিছু করিনি। হেরাল্ড একটি সম্পাদকীয় ও কিছু ফলোআপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এটিই রাজ্যের আইনি ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ নিয়ে যায়। তবে নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতো বড় আমেরিকান মিডিয়াগুলো বিষয়টি নিয়ে কখনোই কোনো রিপোর্ট করেনি। যারা হয়তো বিশ্বাস করত যে, একটি স্টোরি নিজে

থেকে উন্মোচিত না হলে সেটি কোনো স্টোরি হয় না। আমাদের প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি, কোনো সংশোধনী দিতে হয়নি। ফ্লোরিডার এক স্থানীয় ব্লগার প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে কিছু আক্রমণাত্মক লেখা লিখেছিলেন, কিন্তু কেউই সেদিকে নজর দেয়নি।

২০২০ সালে প্রতিবেদনটি জিতেছে বেশ কয়েকটি পুরস্কার: মাঝারি ও ছোট সংবাদপত্রের করা সেরা অর্থবাণিজ্যবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য দ্য জেরাল্ড লোব পুরস্কার; ন্যাশনাল প্রেসক্লাব পুরস্কার; ডেডলাইন-বিহীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সিগমা ডেলটা চি পুরস্কার; ন্যাশনাল হেডলাইনার পুরস্কার এবং সানশাইন স্টেট পুরস্কার।

মাইকেল সালাহ: আমাদের কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে, ফ্লোরিডার আইন প্রণয়নকারীরা ২০০৯ সালে একটি আইন পাস করেছে। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে জন্য সেখানে এ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ফ্লোরিডার সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শন ও নিয়মনীতির মধ্যে থাকতে হবে।

২. অফশোর ক্রাইম, ইনকরপোরেটেড

অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট

রিপোর্টার: মিহাই মুন্তেনু (রোমানিয়া) বেথ ক্যাম্পশোর (যুক্তরাষ্ট্র), স্তানিমির ভ্যালেনভ (বুলগেরিয়া), ভ্লাদ লাভরভ (ইউক্রেইন), টামাস বোডোকি, (হাঙ্গেরি), স্টিভেন ডোকিনোভিচ (সার্বিয়া) এবং কেইটলিন জিনলে (যুক্তরাষ্ট্র)-ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস)

সম্পাদনা : ড্রিউ সুলিভান, রোজমেরি আরমাও
কো-অর্ডিনেটর : পল ক্রিশ্চিয়ান রাদু

ভূমিকা

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কাভার করেন এমন রিপোর্টাররা বিভিন্ন ধরন শনাক্ত করতে শিখে যান। আইন ভঙ্গকারীরা একধরনের কর্মকৌশলের ওপর নির্ভর করেন, যেগুলো নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধের বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু পুরো একটি অপরাধ ব্যবস্থা নিয়ে সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধান খুব বিরল। এর একটি কারণ, এখানে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, মানহানির মামলার মুখে পড়ার হুমকি থাকে। আরেকটি কারণ হলো, এখানে অনেক রিসোর্স, বিশেষভাবে সময়ের প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রের একটি মাইলফলক: জনাথন কৌটনির ভিসিয়াস সার্কেলস: দ্য মাফিয়া ইন দ্য মার্কেটপ্লেস (১৯৭৯), যেটির কেন্দ্রে ছিল এক মাফিয়া বিনিয়োগকারীর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং তাকে উন্মোচন করতে চাওয়া এক পুলিশ কর্মকর্তা। এবং এখানে উন্মোচন করা হয় বিভিন্ন ধরনের কৌশল: চাঁদাবাজির জন্য ইউনিয়নকে ব্যবহার বা সরবরাহকারীদের ধোঁকা দেওয়া। বিশ্বায়নের এই যুগে, কৌটনির সেই সাহসী কাজ এখন পরিণত হয়েছে দলগত উদ্যোগে। এই দলগুলোর বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে: এগুলো আন্তর্জাতিক, তাদের অবস্থান থাকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এবং তারা সংযুক্ত থাকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে, এবং তাদের তহবিল জোগানোর সূত্র কোনো একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। ওসিসিআরপি এ ধরনের একটি দলের মডেল। তাদের কিছু মেধাবী মানুষ আছে সম্পাদনা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং লেখনীর ক্ষেত্রে। প্রকাশনাসংক্রান্ত খাতে সম্পাদনার বিষয়টি বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্টারের তুলনায় ভালো অনুসন্ধানী সম্পাদক কমই আছেন। কিন্তু এই ভূমিকাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বিভিন্ন জাতীয়তা, পেশাগত মানদণ্ড, ভাষা ও দক্ষতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দলের সঙ্গে কাজ করার সময়। এসব দক্ষতার বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা বা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব কম কাজই করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে হাতে গোনা কয়েকটি সংগঠনেরই এটি আছে।

অফশোর কোম্পানি নিয়ে ওসিসিআরপির ধারাবাহিকটি তাদের অন্যতম আলোচিত কাজ, যেটিকে তারা ডাকে "ক্রিমিনাল সার্ভিসেস" ইন্ডাস্ট্রি নামে। কাজটির জন্য তারা ছদ্মবেশী সাংবাদিকতা ও প্রথাগত রিপোর্টিং কৌশল– উভয়ের ওপরই নির্ভর করেছিল। সাধারণত, আমি ছদ্মবেশী রিপোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে, যদিও অনেক পাঠক-দর্শক এটি পছন্দ করেন। এর মাধ্যমে অলসতাকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে; রিপোর্টারকে তার নতুন পরিচয় লুকানো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তে হতে পারে। যার ফলে তিনি হয়তো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মতো কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারবেন না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ভালোভাবে কাজ করে না। যে একমাত্র শ্রেণির মানুষ যেকোনো সময়ে, যে কাউকে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন, তারা হলেন রিপোর্টার। তারা হয়তো উত্তর না-ও পেতে পারেন, কিন্তু তাদের যে প্রশ্ন করার অধিকার আছে, তা সবাই মেনে নেয়। সাধারণত, কিছু না জানার ভান করে আড়ি পাতার চেয়ে কোনো তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করলে সেটি বেশি কার্যকর হয়। ঠিক যেভাবে কোনো ফাইল ক্যাবিনেটে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য উঁকিঝুঁকি দেওয়ার চেয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে নথিপত্রের খোঁজ করলে বেশি তথ্য পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া কোনো রিপোর্টার যদি ছদ্মবেশী অবস্থায় ধরা পড়ে যান, তাহলে তার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ (ছদ্মবেশে কাজ করা এক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিককে সম্প্রতি পায়ে গুলি করা হয়েছিল, যেন তিনি পালাতে না পারেন। এরপর

তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।) কোনো রিপোর্টার যদি তার সত্যিকারের পরিচয় দেন, তাহলে তাকে হয়তো চলে যেতে বলা হতে পারে। এটিই হতে পারে সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি।

ওসিসিআরপির কাজটিতে তিনটি শর্ত ছিল, যেগুলো ছদ্মবেশী রিপোর্টিংকে ন্যায্যতা দিয়েছে: তারা এটি করেছে প্রতিবেদনটি শেষ করার জন্য, কোনো প্রতিবেদন তৈরির ধারণা পাওয়ার জন্য নয়। তারা এই ঝুঁকি না নিলে জনস্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সামনে আনা যেত না। এবং স্টোরিটি শুরু করার পর তারা যদি ছদ্মবেশ না নিত, তাহলে তাদের শারীরিক সুরক্ষার বিষয়টি আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ত।

এই ধরনের প্রকল্পগুলো প্রায়ই আইনশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ, সীমান্তের বাধা পেরিয়ে পুলিশের চেয়ে বেশি সহজে ও দ্রুত কাজ করতে পারেন রিপোর্টাররা। এ ধরনের প্রকল্পের প্রধান হুমকি থাকে মানহানির মামলাসংক্রান্ত বিষয়। যুক্তরাজ্যের আইন মান্যকারী করদাতারা যে বিপুল পরিমাণ চাপের মধ্যে থাকেন, সেসব চাপ এড়ানোর ক্ষেত্রে অপরাধীদের সহায়তা করে অফশোর কোম্পানিগুলো। এমন একটি পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যে যেভাবে এই ধরনের মানহানির মামলার চর্চা হচ্ছে, তাকে শুধু আতঙ্কজনকই বলা যায়। ওসিসিআরপির পুরো সিরিজটি এবং এ-সংক্রান্ত নথিপত্রগুলো পাওয়া যায় এখানে: http://www.reportingproject.net/offshore।

প্রথম পর্ব
অপরাধ যাচ্ছে বিদেশে

ওসিসিআরপি টিম

পূর্ব ইউরোপের অপরাধী ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদেরা কর ফাঁকি দেওয়ার বৈদেশিক জায়গাগুলোকে (অফশোর হেভেন) এত ভালোভাবে ব্যবহার করেন যে এটি এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্র স্থায়ীভাবে বদলে দিয়েছে। অফশোর আইনগুলো অপরাধ দমনের মতো বিষয়গুলোর চেয়ে গোপনীয়তার দিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। এবং এই সুবিধা ব্যবহার করে তারা অফশোর কোম্পানির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে তারা একই সঙ্গে তাদের সম্পত্তিগুলো পুলিশের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারবেন, অর্থ পাচার করতে পারবেন, এবং কর ফাঁকি দিতে পারবেন।

তারা বিদেশে কোম্পানি খোলার গোপন ব্যবসায়িক শিল্পটি শিখে ফেলেছিলেন, যেখানে স্থায়ী বাসিন্দা নন, এমন কোনো ব্যক্তি বিদেশে একটি কোম্পানি নিবন্ধন করেন। এবং প্রক্সি কোম্পানি ও জটিল ব্যবসায়িক কাঠামোর পেছনে লুকিয়ে থাকেন, যেটির বিস্তৃতি পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে যায়।

বলকান অঞ্চলের অপরাধীরা অফশোর কোম্পানিকে সামনে রেখে আড়ালে মাদক পাচার, অর্থ পাচার, অস্ত্র পাচার, শিল্প খাতের একচেটিয়াকরণ, জালিয়াতি এবং রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার মতো কর্মকাণ্ড চালায়। মেক্সিকান মাদক ব্যবসায়ীরা অফশোর কোম্পানি ব্যবহার করে অর্থ পাচারের জন্য। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো ব্যবহার করে যুদ্ধ শুরু করার জন্য, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য আরও কী ধরনের অপরাধী কর্মকাণ্ড চালায়, তা এখনো অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্কের তথ্যানুযায়ী, ধনী ব্যক্তি ও অপরাধীরা তাদের অফশোর অ্যাকাউন্টগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ লুকিয়ে রাখে, তাতে প্রতিবছর কর হারায় ২৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ। অধিকার অনুযায়ী এই অর্থের আসলে যাওয়ার কথা উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে। এ ছাড়া প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার– প্রায়ই যেটি হয় দুর্নীতিবাজ নেতাদের চুরি করা অর্থ– উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে চলে যাচ্ছে অফশোর অ্যাকাউন্টে এবং ধনী ব্যাংকিং সেন্টারগুলোতে।

কাঠ, হীরা বা তেল– যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আমরা দেখেছি যে সেখানে একটি গোপন সংযোগ থাকে। আমরা যতগুলো ধোঁয়াশাপূর্ণ চুক্তি দেখেছি, সেগুলোর সব কটিই অন্তত একটি ব্যাংক বা কোম্পানি ছিল, যেটির অবস্থান গোপনীয় আইনি কাঠামোর কোনো অঞ্চলে," বলেছেন লন্ডনভিত্তিক এনজিও, গ্লোবাল উইটনেসের ক্লেপ্টোক্রেসি দলের প্রধান, অ্যান্থেয়া লউসন।

যারা কর ফাঁকি দেওয়ার বৈদেশিক জায়গাগুলো ব্যবহার করে, তাদের ধরার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও খুব বেশি কিছু করতে পারে না। তারা বলেন, তাদের হাত বাধা থাকে অফশোর হেভেনগুলোর ব্যবসাবান্ধব আইনকানুন দিয়ে, যেগুলো গোপনে কর্মকাণ্ড চালানোর নিশ্চয়তা দেয়। মনে হয় যেন এগুলো তৈরিই করা হয়েছে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য।

ক্রিমিনাল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি

"আমি ইউক্রেনের এমন একটিও বড় ব্যবসার কথা জানি না, যেটির মালিকানাসংক্রান্ত স্বচ্ছতা আছে, এবং যেখানে দেশের বাইরে থাকা কোম্পানিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না," বলেছেন ইয়ারোস্লাভ লোমাকিন। তিনি মস্কোতে চালু করেছিলেন একটি কনসাল্টিং ফার্ম, অনেস্ট অ্যান্ড ব্রাইট। লোমাকিন নিজেও জড়িত আছেন বিদেশে কোম্পানি নিবন্ধন করার এই ব্যবসায়।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় কর প্রশাসনের তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের প্রথমার্ধে বিদেশে থাকা কোম্পানি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্য ৫৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে। এসব বাণিজ্যের ৪ ভাগের ৩ ভাগই হয়েছে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের সঙ্গে, যেটি ইউক্রেনের সব রপ্তানির প্রায় ৫ শতাংশের সমান।

পূর্ব ইউরোপ ও বলকানের অন্য দেশগুলোও ইউক্রেনের মতোই। অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) ছয় রিপোর্টারের একটি দল এসব দেশে শত শত বড় কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলো দেশের বাইরের কোনো জায়গায় নিবন্ধন করা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সেবা দেয়, এমন একটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে প্রতিটি দেশে। নিরস এই ইন্ডাস্ট্রি পরিপূর্ণ হয়ে আছে হিসাবরক্ষক, কোম্পানি গঠনের এজেন্ট এবং আইনজীবীদের দিয়ে, যারা কোনো কোম্পানি বা সম্পদের প্রকৃত মালিকদের লুকিয়ে রাখার জন্য জটিল সব পথ-পদ্ধতি বের করার কাজে সময় ব্যয় করেন।

এই ইন্ডাস্ট্রির সত্যিকারের পণ্য হলো একটি মারাত্মক গোপনীয়তা। বিদেশে কোম্পানি নিবন্ধনের এই খাতে কাজ করা কর্মীরা প্রক্সির ব্যবস্থা করেন, যেটি ব্যবহার করে প্রকৃত মালিকদের লুকিয়ে রাখা যায়। তারা মোটেই ভাবেন না যে, তারা কাদের জন্য কাজ করছেন। এবং সতর্কভাবেই এগুলো জানতে চান না।

আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা এটিকে ডাকেন ক্রিমিনাল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি

"একটি কোম্পানি মূলত একটি বিকল্প পরিচিতি। আপনি যদি এক বা দুই হাজার ডলার দিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করেন, তাহলে এটিকে অন্য কোনো কিছু বা কারও সঙ্গেই সংযুক্ত করা যাবে না," বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসির অফশোর হেভেন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেসন শারম্যান। "অর্থ পাচার, কর ফাঁকি দেওয়া, বড় অঙ্কের ঘুষ নেওয়া বা এমনকি সন্ত্রাসী সংগঠনকে অর্থ জোগানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।"

এই খাতে কাজ করা ভেতরের মানুষেরা নিজেদের কাজের পক্ষে সমর্থন জুগিয়ে বলেন যে, তাদের এই সেবার পেছনে বৈধ ব্যবসায়িক কারণ আছে। এবং অনেক সৎ মানুষের ভেতরে অল্প কয়েকজন অসৎ মানুষ তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

কিন্তু পূর্ব ইউরোপে অফশোর কোম্পানি নিবন্ধন নিয়ে ওসিসিআরপির ছয় মাসের অনুসন্ধানে এমনটি দেখা যায়নি। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে, এই রিপোর্টাররা বিস্তারিত তথ্য পেয়েছেন যে, কীভাবে ধরা না পড়ে কর ফাঁকি দেওয়া যাবে। এ জন্য অবশ্য তাদের বারবার বিভিন্ন পরামর্শ নিতে হয়েছে, বিভিন্ন সভা ও অনলাইন সেবায় অংশ নিতে হয়েছে। এক রিপোর্টারের কাছে এমনকি তার সম্ভাব্য অবৈধ মুনাফার একটি অংশও দাবি করা হয়েছিল।

লভ্যাংশ দাবি করা এই এজেন্ট, লাজলো কিস পরিচালনা করেন এই অঞ্চলের অন্যতম বড় অফশোর নিবন্ধন সেবা। বুখারেস্ট থেকে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম লামার্ক ট্যাক্স প্ল্যানিং কনসাল্ট এসআরএল। ওসিসিআরপির রিপোর্টারের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক সপ্তাহ পরেই কিসকে কর ফাঁকি, অর্থ পাচারসহ অফশোর ব্যবসাসংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রোমানিয়ান পুলিশ।

ওসিসিআরপি অল্প কিছু অসৎ মানুষ নয়, বরং খুঁজে পেয়েছে একটি পুরো ইন্ডাস্ট্রি, যারা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রকে সহায়তা করতে চায় তাদের অবৈধ অর্থকে বৈধ করতে, কর ফাঁকি দিতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে। আঞ্চলিক এই নেটওয়ার্কও আবার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অফশোর এজেন্টদের নেটওয়ার্কের অংশ। যারা আন্তঃসীমান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সেবা দিচ্ছে। যার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরানের মধ্যে অস্ত্র পাচারের মতো বিষয়ও আছে।

ব্যবসায়িক মডেল

অফশোর কোম্পানি নিবন্ধনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক ধরনের সেবা পাওয়া যায়। নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা সব ধরনের কাজ করে থাকে। করসংক্রান্ত কাগজপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি থেকে শুরু করে তারা এমনকি কোনো গ্রাহকের কোম্পানির পরিচালক হিসেবে কাজ করার মতো সেবাও দিয়ে থাকে। তারা প্রায়ই বিদেশে থাকা কোনো কোম্পানি নিবন্ধন ফার্মের সঙ্গে কাজ করে। এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কোনো কোম্পানির পরিচালক হিসেবে কাজ করবে– এমন প্রক্সিরও জোগান দিয়ে থাকে। তারা কোনো গ্রাহককে শেয়ার ছাড়তে সাহায্য করে এবং প্রক্সি খুঁজে দেয় সেসব শেয়ার কেনার জন্য। তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও তৈরি করতে পারে। যদি পুলিশ বা সাংবাদিকেরা খোঁজখবর নিতে আসেন, তাহলে এই অনুসন্ধান এসব প্রক্সির কাছে এসেই শেষ হয়ে যাবে।

তারা অন্যান্য দেশেও কোম্পানি গঠন করতে সাহায্য করে, যেগুলো তাদের গ্রাহকের কোম্পানির অংশ হতে পারে বা একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এভাবে তারা বিভিন্ন কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যেগুলোকে দেখে স্বাধীন বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে সবকিছুর

মালিক একই ব্যক্তি। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ব্যবস্থা সত্যিকারের মালিকানা খুব ভালোভাবে লুকিয়ে রাখে এবং জবাবদিহি ক্ষুণ্ন করে। তারা সাধারণত এসব কাজ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কয়েক ঘণ্টা বা দিনের মধ্যেই অনেক কাজ হয়ে যায়। কোনো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। তাদের কাছে কোনো আইডি চাওয়া হলেও সেগুলো প্রায় কখনোই যাচাই করা হয় না।

বিদেশে নাকি বাড়ির পাশে

করের ব্যবস্থা যত দিন ধরে আছে, কর ফাঁকি দেওয়ার ঘটনাও হয়তো তখন থেকেই আছে। তবে বিদেশে টাকা পাঠিয়ে কর ফাঁকির আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ১৯২০ ও ৩০-এর দশক থেকে, যখন অফশোর কোম্পানি ও ট্রাস্টের জন্য আইন পাস করে বারমুডা ও লিখটেনস্টাইন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপের অনেক দেশই কর বাড়িয়েছিল দেশ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এবং এসব দেশ থেকে অর্থ দ্রুতই সুইজারল্যান্ডের মতো কম করের দেশে চলে যায়, যেখানে যুদ্ধের ফলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কম কর নির্ধারণ করে অর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আকর্ষণের এই সুবিধা অন্যান্য আরও দেশও পরে আবিষ্কার করে ফেলে।

গোপনীয়তার আইনও এ ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। বিশেষভাবে ছোট দেশগুলো বুঝতে পারে যে, এ ধরনের সেবার জন্য কিছু ফি নির্ধারণ করলে সেটি তাদের অর্থনীতিকে চাঙা করে তুলতে পারে।

এখন পছন্দের ট্যাক্স হেভেন হিসেবে ক্যারিবিয়ান বা ভারতীয় সাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জায়গা নিয়ে নিচ্ছে ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু দেশ। ট্যাক্স সিক্রেসি ইনডেক্স অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যার রাজ্যকে এক নম্বর আইন ভঙ্গকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক। ডেলাওয়্যার বছরে ৭০০ মিলিয়ন ডলার আয় করে কোম্পানি নিবন্ধন ফি হিসেবে, যেটি তাদের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

"যুক্তরাষ্ট্রে এখনকার অবস্থা তিন বছর আগের তুলনায় ততটা ভয়াবহ নয়, তারপরও অবস্থা যথেষ্টই খারাপ। এমনকি এটি কেম্যান আইল্যান্ড বা বাহামার মতো রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্রে যে জায়গাগুলো দেখানো হয়, সেগুলোর চেয়েও খারাপ। অন্যান্য দেশ যেন কিছু মানদণ্ড মেনে চলে, তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ ভালোই কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু নিজেদের দেশে সেগুলো একইভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তারা ততটা আগ্রহী নয়," বলেছেন অধ্যাপক শারম্যান।

বিশ্বজুড়ে এখন কতগুলো অফশোর কোম্পানি আছে, তা কেউই জানে না। এবং বিশ্বজুড়ে ৩ ভাগের ১ ভাগ দেশকে ব্যবহার করা হয় এই উদ্দেশ্যে। ইন্টারনেটের সাহায্যে এখন যে কেউই যেকোনো জায়গায় একটি অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে এবং কোম্পানি গঠন করতে পারে।

আইন প্রয়োগের সমস্যা

অপরাধীরা সাধারণত আইনি দমনপীড়নের ভয় করেনেই না, বিদেশের গোপনীয়তা আইনের বাধায়, বিশেষত পূর্ব ইউরোপে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এমন কোনো দক্ষতা থাকে না, যা দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খতিয়ে দেখা যায় যে, কোম্পানিগুলোর প্রকৃত মালিক কারা।

সরকারগুলো অফশোর ইন্ডাস্ট্রির সমালোচনা করে এবং অপরাধীদের সাহায্য করার জন্য দোষারোপ করে। কিন্তু সমস্যাটি সমাধানে খুব অল্পই উদ্যোগ নেয়। অফশোর-সংক্রান্ত আইনকানুন আমূল বদলে ফেলার যেকোনো উদ্যোগকে দমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় ব্যবসায়ী সংগঠন ও সংঘবদ্ধ অপরাধ। কিছু কিছু দেশ শুধু মুখেই এমন কিছু সেবা দেওয়ার কথা বলে, যেগুলো আরও স্বচ্ছতা প্রদান করবে। কিছু দেশ শুধু গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কিছুই ঘটে না।

ব্যবসার সমর্থনে

অফশোর ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এটি মূলত ব্যবহৃত হয় বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। সেশেলসের এক রেজিস্ট্রি এজেন্ট বলেছেন, "উচ্চ কর আরোপ করা এবং খরচ করা অনেক সরকারই সবাইকে এটি বিশ্বাস করতে বলে যে, অফশোর কোম্পানিগুলো শুধু

জালিয়াতি চক্র, সন্ত্রাসী ও প্রতারকেরা ব্যবহার করে। কিন্তু এটি একেবারেই সঠিক নয়। হ্যাঁ, একটি আপেলের বাক্সে কিছু পচা আপেল থাকতেই পারে, কিন্তু অফশোর কোম্পানি হয়ে লেনদেন হওয়া ৯৯ শতাংশ ব্যবসাই পুরোপুরি বৈধ।"

সভাগুলোতে, রেজিস্ট্রি এজেন্টরা বলেছেন যে, চাঁদাবাজি, প্রতারক ব্যবসায়ী এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের থেকে সম্পদ রক্ষা করার জন্য আশ্রয় দরকার তাদের ধনী গ্রাহকদের।

কিছু রেজিস্ট্রি এজেন্ট খোলাখুলিই স্বীকার করেছেন যে, কারা এটি ব্যবহার করছে, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। "আমরা গ্রাহকদের কাছে শুধু যন্ত্র বিক্রি করছি। এবার তারা এটি সঠিকভাবে নাকি অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, সেটি তাদের ব্যাপার। আমরা এগুলো দেখি না। আমরা এগুলো দেখতেও চাই না," বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল কনসাল্টিং গ্রুপ (আইসিজি)-এর ব্যবস্থাপনা সহযোগী ইভানা পিলিপিউক। এই কোম্পানি কর কমানোর জন্য অফশোর অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের পক্ষে কাজ করে।

শারম্যান অংশত একমত হয়েছেন: "এখানে একটি ছোট ব্যবসাকে যতটা সহজভাবে সম্ভব কোম্পানি নিবন্ধনের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যেখানে কাগজপত্রের কাজ খুবই কম থাকে, ঝামেলা কম থাকে এবং অর্থ খরচ কম হয়," বলেছেন এই অধ্যাপক। নিয়মনীতি/নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার আকাঙ্ক্ষাটি তিনি বুঝতে পারেন। তবে তিনি এ-ও বলেছেন যে, "ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি যেভাবে সহজ হয়েছে, একইভাবে অপরাধীদের জন্যও এটি সেভাবেই সহজ হয়েছে।"

কেউই জানে না যে, অফশোর বাণিজ্যের কতটা বৈধ আর কতটা অপরাধমূলক। আবার এর কিছু অংশ নির্ভর করে মানুষ কোনটিকে বৈধ বলে বিবেচনা করে, তার ওপর।

"আমি অফশোর বাণিজ্যের কোনো বৈধ কারণ সম্পর্কে সত্যিই জানি না। কোম্পানিগুলো আপনাকে বলবে যে, কর কমিয়ে আনা একটি বৈধ কারণ এবং এ জন্য এটি আইনসম্মত। কিন্তু আমি মনে করি, কর ফাঁকি দেওয়া কোনোভাবেই বৈধ না," বলেছেন লুসি কোমিসার। তিনি বিশেষভাবে লেখালেখি করেন অর্থনৈতিক অপরাধ, অফশোর ও সংঘবদ্ধ অপরাধ নিয়ে।

কোমিসার এই যুক্তিরও বিরোধিতা করেন, সম্পদ জোর করে কেড়ে নেওয়া থেকে বাঁচাতে ধনী ব্যক্তিদের অর্থ বিদেশে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। "আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অ্যাকাউন্টের তথ্য উন্মুক্ত থাকা মানেই কোনো পরিদর্শন বা তদন্তের মুখে পড়া নয়। তারা আরেকটি উদাহরণ দেয় দমনমূলক দেশগুলোতে বিরোধীদের নিয়ে, যারা চায় না যে সরকার তার অর্থ নিয়ে যাক। কিন্তু একটি দমনমূলক দেশে, যাদের কাছে অর্থ থাকে, তাদেরকেই সরকারের অংশ হিসেবে দেখা যায়।"

অপরাধীরা যেন বিদেশে কর ফাঁকির জায়গাগুলো ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো এটি না করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে।

"একই ব্যবস্থা, পদ্ধতির কারণে কর ফাঁকি দেওয়া যায়, দুর্নীতি করা যায় এবং সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র অর্থ লেনদেন করতে পারে। সবকিছুই একসূত্রে গাঁথা। আমরা এই ফাঁকফোকরগুলো রেখেছি; কারণ, এটি বহুজাতিক ও ধনীদের জন্য সুবিধাজনক। তারা যেন তাদের কর কমানোর জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। এবং এর নিচে আরও অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে," বলেছেন ক্লেপ্টোক্রেসি দলের লউসন।

দ্বিতীয় পর্ব
লাজলো কিস, দ্য অফশোর মাস্টার

মিহাই মুন্তেনু

রোমানিয়ার সরকারি ভবনের কয়েক কদম দূরেই একটি ছোট, সাজানো-গোছানো বোর্ড রুমে লাজলো গিওর্জ কিস একটি কাগজে আঁকিবুঁকি করে নানা সুবিধার কথা বলছেন একজন ছদ্মবেশী রিপোর্টারকে। অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) এই রিপোর্টার কিসকে বলেছিলেন, তিনি তেলসংক্রান্ত একটি বড় চুক্তি থেকে নিজের মালিকানা লুকাতে চান।

একজন হিসাবরক্ষককে আপনি যে রকম প্রত্যাশা করেন, কিসও দেখতে ঠিক তেমনই– মাঝারি উচ্চতা, মাথায় কিছুটা টাক পড়ে গেছে, নিচু, ধীর গলায় কথা বলেন। কিন্তু তিনি যে বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন, সেটি মোটেও নিরস হিসাবরক্ষণ ছিল না। তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে, কীভাবে সেই রিপোর্টার অফশোর কোম্পানি ব্যবহার করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কমিয়ে আনতে পারেন রোমানিয়ার কর ও শুল্ক থেকে।

তিনি সেশলস আইল্যান্ড বোঝানোর জন্য কাগজে একটি বিন্দু আঁকেন। এরপর একটি লাইন টেনে সেটিকে যুক্ত করেন সাইপ্রাস ও নাইজেরিয়ার কিছু কাঠামোর সঙ্গে। এরপর এগুলোকে যুক্ত করেন বুলগেরিয়ায় তার নিজের একটি কোম্পানির সঙ্গে। এবং শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে– যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যার রাজ্য।

"আপনার একটি ত্রিকোণ ব্যবস্থা প্রয়োজন," কিস বলেছিলেন তার শান্ত, শিক্ষকসুলভ ভঙ্গিতে। তিনি কাগজটি সেই রিপোর্টারকে দেখান এবং বলেন, "আমি আপনার জন্য এই ব্যবস্থাটির কথাই প্রস্তাব করছি।" তিনি এটিকে বলেন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর সুবিধা বা ট্যাক্স অপটিমাইজেশন।

তবে রিপোর্টার পরে কাগজটি কর্তৃপক্ষকে দেখানোর পর তারা এটিকে বলেছেন ভিন্ন কিছু: জালিয়াতি।

ব্যবসা তৈরির ব্যবসা

মানুষকে অফশোর কোম্পানি খোলার ব্যবসায় সহায়তা করেন লামার্ক ট্যাক্স প্ল্যানিং কনসাল্ট এসআরএল-এ কাজ করা কিস। তার মতো আরও অনেক হিসাবরক্ষক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ী আছেন পূর্ব ইউরোপে। এমন আরও হাজারো মানুষ কাজ করেন বিশ্বজুড়ে।

এখানে অনেকে আসলে যা করছেন, তা হলো: সংঘবদ্ধ অপরাধ, রাজনীতিবিদ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের অর্থ পাচার, কোম্পানির মালিকানার তথ্য গোপন, কর ফাঁকি এবং একচেটিয়া আইন অমান্যে সহায়তা করা। এই ইন্ডাস্ট্রি সংঘবদ্ধ অপরাধ ও দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের আরও ধনী হয়ে উঠতে এবং সেসব করে পার পেয়ে যেতে সহায়তা করছে।

ওসিসিআরপির রিপোর্টারকে এসব শেখানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করে রোমানিয়ান পুলিশ। কিস সেই অল্প কয়েকজন রেজিস্ট্রি এজেন্টের একজন, যাদের কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওসিসিআরপি দেখেছে যে, এমন আরও অনেক মানুষ থাকার কথা।

ওসিসিআরপির চারজন রিপোর্টার কথা বলেছেন দুই ডজনের বেশি কোম্পানির সঙ্গে, যারা অফশোর কোম্পানি নিবন্ধন করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। এবং সবাইকে একই কথা বলা হয়েছে। সবাই এই রিপোর্টারদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কর ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি লুকানোর ক্ষেত্রে। কেউই জিজ্ঞাসা করেনি যে, রিপোর্টাররা কোথায় থেকে এই অর্থ পেয়েছেন বা কেন তারা মালিকানা বা সম্পদ লুকাতে চান।

বাণিজ্যের উপায়-পদ্ধতি

ফিরে যাই সেই বোর্ডরুমে, যেখানে কিস ওসিসিআরপির রিপোর্টারকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, কর কমানোর একটি প্রধান উপায় হলো পণ্যের মূল্য কমানো। (কাল্পনিক) এই পণ্য, আমাদের ক্ষেত্রে, ১৫০০ টন তেল নাইজেরিয়া থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) আমদানি করার কথা।

কিস ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "এখানে, নাইজেরিয়া থেকে আপনি পণ্য কিনবেন সেশলস বা ডেলাওয়্যারে থাকা কোনো অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে। এই অফশোর কোম্পানিটি এবার এগুলো আমদানির আরেকটি সাব-ইনভয়েস পাঠাবে একটি রোমানিয়ান কোম্পানির কাছে। এই পর্যায় থেকে, আমরা ত্রিমুখী ব্যবস্থা গড়ে তুলব। আমরা দ্রুত পণ্যটিকে সরবরাহ করব সাইপ্রাসের একটি কোম্পানির কাছে। এটি এবার পণ্যটি আবার বিক্রি করবে বুলগেরিয়ার একটি কোম্পানির কাছে। সেখান থেকে এটি আবার ফিরে আসবে রোমানিয়ায়।"

কিস তার এই পরিকল্পনাকে ডাকেন সাব-ইনভয়েসিং" বলে। এটিও এই ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিবার বিক্রির সময় পণ্যের মূল্য পরিবর্তন হবে। কিন্তু এই পরিবর্তনটি করা হবে শুধু করসংক্রান্ত কারণে। কারণ, এখানে জড়িত সব কোম্পানিরই মালিক সেই রিপোর্টার।

যেমন, ডেলাওয়্যারের একটি অফশোর কোম্পানি নাইজেরিয়া থেকে তেল ১০০ ইউরোতে কিনবেন। এটি রোমানিয়ার কোম্পানির কাছে সেটি বিক্রি করবে ১ ইউরোতে। রোমানিয়ার কোম্পানি আবার সাইপ্রাসের একটি কোম্পানির কাছে এটি বিক্রি করবে ১.১ ইউরোতে। রিপোর্টার এবার সাইপ্রাসে কর পরিশোধ করবেন এই কমানো দামের ভিত্তিতে।

কিন্তু এটি অবৈধ, বলেছেন রোমানিয়ান ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ফিসক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এএনএএফ) প্রেসিডেন্ট সোরিন ব্লেনার।

"এ ধরনের যেকোনো কর্মকাণ্ড, যেখানে সাব-ইনভয়েসিং বা অঙ্কের পরিবর্তন করা হয়, সেটিকে হয় কর ফাঁকি বলা হবে, নয়তো অর্থ পাচার," বলেছেন ব্লেনার।

একমত হয়েছেন আরেক বিশেষজ্ঞও। "আপনি যখন একই পণ্য বাজারদরের তুলনায় অনেক কম মূল্যে আবার বিক্রি করবেন, এটির দাম কমিয়ে দেখাবেন, তখন আপনি বেশ কয়েকটি অপরাধ করেন। এটি স্পষ্ট, যে নেটওয়ার্কের কথা আপনি বর্ণনা করছেন, সেটি একটি অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক," বলেছেন রোমানিয়ান ন্যাশনাল কন্ট্রোল অথরিটির সাবেক মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি লোনেল ব্লাঙ্কুলেস্কু।

কিস বলেছেন, সাইপ্রাস ইউরোপের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার জন্য একটি কৌশলগত জায়গা। ২০০৪ সালের মে মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পর থেকে এই দ্বীপরাষ্ট্রটির করহার সবচেয়ে কম। এবং প্রায়ই এটি ব্যবহৃত হয় কর ফাঁকির আদর্শ জায়গা হিসেবে। আমদানির ক্ষেত্রে এখানে শুল্কহার সবচেয়ে কম। মাত্র ১৫ শতাংশ। এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো কর দিতে হয় না। বেশ কয়েক ধরনের আফ্রিকার খনিজ তেলের ক্ষেত্রে এখানে কোনো শুল্ক নেই। কোম্পানির ক্ষেত্রে করপোরেট করের হার মাত্র ১০ শতাংশ।

"এটি স্পষ্ট যে এ ধরনের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতরা ভ্যাট ও অন্যান্য শুল্ক ফি দিতে চায় না। তারপর, পণ্যগুলো বিনা বাধায় নিয়ে যাওয়া হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশে। পণ্যের কম মূল্য দেখানো কোনো প্রশ্ন ছাড়াই পুরোপুরি অবৈধ। এখানে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্রে মূল্যের সংখ্যা বদলে দেওয়া হয়," বলেছেন ব্লেনার।

বুলগেরিয়ান সংযোগ

কিন্তু সাইপ্রাস এই ত্রিমুখী ব্যবস্থার প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশটি বুলগেরিয়া।

পণ্য সাইপ্রাসে আমদানি করার পরপরই সেগুলো দ্রুত বিক্রি করে দেওয়া হয় একটি বুলগেরিয়ান কোম্পানির কাছে। এখানে মূল্য ধরা হয় বাজারদরের মতোই, ২০০ ইউরো। মুনাফাটি থেকে যায় সাইপ্রাসের কোম্পানির অফশোর অ্যাকাউন্টে। বুলগেরিয়ার এই ধাপ পণ্যটির গতিপথ অস্পষ্ট করে তোলে।

“আপনাকে বুলগেরিয়ায় কোনো কোম্পানি খুঁজতে হবে না। সেটি আমাদের আছে,” বলেছেন কিস। “কিন্তু এখানে পণ্যগুলো বাস্তবে লেনদেন করতে হবে। আমাদের এটি কোথাও সংরক্ষণও করতে হবে না। আমরা এক দিনের মধ্যেই এটি বুলগেরিয়া থেকে বের করে আনতে পারব।”

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে কোনো কর না থাকলেও কোম্পানিকে অবশ্যই কিছু নথিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়, যেটি প্রমাণ করবে যে পণ্যগুলো সত্যিই সরবরাহ করা হয়েছে।

রোমানিয়ায় আসার পর, সবকিছু প্রকাশ্যে চলে আসবে এবং এই আফ্রিকান খনিজ তেল সাধারণ বাজারে প্রবেশ করবে। বুলগেরিয়ান কোম্পানি রোমানিয়ান কোম্পানির কাছে এটি বিক্রি করবে এমন একটি মূল্যে, যার মধ্যে কিস-এর ব্যক্তিগত ফিও থাকবে।

“আপনার এখানে খরচ হবে পুরো ব্যবসার মাত্র ১ শতাংশ। সর্বোচ্চ ১ শতাংশ। এটিই হবে আমাদের ফি,” কিস বলেছিলেন সেই রিপোর্টারকে।

মালিকানা লুকানো

এই প্রক্রিয়ার আরেকটি প্রধান উপাদান হলো প্রকৃত মালিকদের তথ্য লুকিয়ে রাখা। অফশোর কোম্পানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কঠোর সমালোচনার পরও, ডেলাওয়্যার এখন অনেক অফশোর সার্ভিস কোম্পানির পছন্দের গন্তব্য। কিস এমনকি এ নিয়ে একটি বইও প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে রোমানিয়ায় কর ফাঁকি দিতে হবে। বইটির নাম: “ইউনাইটেড স্টেটস, ট্যাক্স হেভেন– আঙ্কেল স্যাম উইল ফাইট ইওর ট্যাক্সেস!”

কিস বলেছেন, “আমরা এরই মধ্যে ডেলাওয়্যারে কোম্পানির গঠন করতে বলেছি।” তিনি বলেছেন, ডেলাওয়্যারে তার প্রায় একটি কারখানাই আছে, যেটি কোম্পানি উৎপাদন করে। আসলে, এটি ডেলাওয়্যারভিত্তিক একটি কোম্পানি নিবন্ধনের প্রতিষ্ঠান।

কিস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে না জড়ানো পর্যন্ত কোনো অফশোর কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে না। কোনো কর দিতে হবে না এবং এটি খুব কম হিসাবের মধ্যেও থাকে।

কিস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে কীভাবে মালিকানার তথ্য সহজেই গোপন করা যায়। প্রক্সি, বা এমন মানুষ, যারা অর্থের বিনিময়ে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেবেন কোম্পানির মালিক হিসেবে, স্বাক্ষর করবেন কোম্পানি নিবন্ধনের নথিতে। আইনজীবী, নিবন্ধন এজেন্ট বা রাস্তার কোনো ব্যক্তিও এটি করতে পারে। প্রকৃত মালিকেরা লুকিয়ে থাকতে পারেন এই আইনি নথির পেছনে, যেখানে লেখা থাকে যে, প্রক্সি এই সম্পদ রক্ষা করছে আরেকজনের হয়ে। কখনো কখনো প্রকৃত মালিকদের কাছে প্রক্সিদের তারিখ না লেখা পদত্যাগপত্র থাকে, যেটি তারা যেকোনো সময় ব্যবহার করতে পারে। এই নথিপত্রগুলো সাধারণত গোপন রাখা হয়।

অর্থ পাচার

রিপোর্টার কিসকে বলেছিলেন, তিনি সম্প্রতি বড় আকারের কিছু অর্থ পেয়েছেন এবং সেটি লুকানো দরকার। কিস কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অফশোর কৌশল হাজির করেছেন।

কিস এবার ভারতীয় সাগরের ছোট্ট সেশলস দ্বীপে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নতুন কোম্পানির জন্য আগে থেকেই নিবন্ধিত একটি সাধারণ নাম বেছে নেওয়া হয়: এম ইন্টেলিজেন্স লিমিটেড (সেশলস)। এই কোম্পানির পুঁজি জোগানো হবে সেই রিপোর্টারের রহস্যময় অর্থ দিয়ে। এবার কোম্পানিটি এর শেয়ার বিক্রি করবে বিনিয়োগকারীদের কাছে। এভাবেই তারাই হয়ে উঠবে এটির মালিক।

অফশোর কৌশলের আরেকটি টুল ব্যবহার করে কিস পরামর্শ দেন যে কোম্পানিটি যেন বেয়ারার শেয়ারও ব্যবহার করে। বেয়ারার শেয়ার হলো এমন এক ধরনের শেয়ার, যেটির মালিক যে কেউ হতে পারবেন। যার কাছে সেই সময় এটির দখল থাকবে, তিনিই হবেন সেটির মালিক। মালিকানার কোনো নথিও রাখা হয় না। বেশ কয়েকটি প্রক্সির মাধ্যমে গ্রুপ আকারে এই প্রাথমিক শেয়ারগুলো কেনা হবে এবং সেগুলো হস্তান্তর করা হবে রিপোর্টারের কাছে। একবার এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলেই এগুলো শনাক্তের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

এই সেশলস কোম্পানি– বেয়ারার শেয়ারের মাধ্যমে যেটির মালিক এখন সেই রিপোর্টার– হয়ে উঠবে একটি "বিনিয়োগকারী" কোম্পানির অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার। এবারও কিস আগে থেকেই এমন একটি কোম্পানি তৈরি করে রেখেছেন। ডেলাওয়্যারের একটি কোম্পানি, নাম এম ইনভেস্টমেন্ট এলএলসি। সেশলস কোম্পানি থেকে আসা অর্থ দিয়ে ডেলাওয়্যারের এই কোম্পানির তহবিল জোগানো হবে। এটিই এরপর অন্যান্য বৈধ বিনিয়োগ করবে। এভাবে অর্থটি অবৈধ থেকে বৈধ করে তোলা হবে।

চারটি অফশোর কোম্পানির জন্য কিস দাবি করেছিলেন ১২,০০০ ইউরো এবং পুরো কর্মকাণ্ডের ১ শতাংশ লভ্যাংশ। এটির জন্য চালান ইস্যু করা হয়েছিল বুখারেস্টের লামার্ক ট্যাক্স প্ল্যানিং কনসাল্ট এসআরএল থেকে। এখানেই কিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেই রিপোর্টার। কিসের এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে অফশোর কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক আছে, যেটি মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে মহাদেশজুড়ে।

তৃতীয় পর্ব
রিপোর্টার খুলছেন অফশোর কোম্পানি

মিহাই মুন্তেনু

একটি অফশোর কোম্পানি খোলার প্রক্রিয়া কতটা সহজ, তা দেখতে চেয়েছিলেন অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) রিপোর্টাররা।

তারা এমন দুর্গম জায়গায় কোম্পানি খোলার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে ভালো প্রাইভেসি-সংক্রান্ত আইন আছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই কাল্পনিক কোম্পানির প্রক্সি থাকতে হবে অংশীদার এবং কোম্পানির পরিচালক, উভয় ক্ষেত্রে।

তারা সেশলস ভিত্তিক অফশোর কোম্পানি নিবন্ধনের প্রতিষ্ঠান, ফিডেলিটি করপোরেট সার্ভিসের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। ফিডেলিটি এই ধরনের সেবা প্রদানের বিজ্ঞাপন দেয় তাদের ওয়েবসাইটে। যেমন এটি "নমিনি" পরিচালক বা প্রক্সির সেবা প্রদান করে। তাদের সাইটে বলা আছে, "একটি তৃতীয়পক্ষীয় কোম্পানি ম্যানেজার (নমিনি) কার্যকরীভাবে অফশোর কোম্পানিটির সঙ্গে প্রকৃত মালিকের সম্পর্কের তথ্য আড়াল করবে। অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে এটি বলেছে, "কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ আড়াল করার জন্য, একজন কোম্পানি মালিক নমিনি শেয়ারহোল্ডারের সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।"

ফিডেলিটি তাদের ওয়েবসাইটে গর্ব করে ঘোষণা করেছে, "১৯৯৮ সাল থেকে আমরা বিশ্বজুড়ে পেশাজীবী ও ব্যক্তিগত গ্রাহকদের সেবা দিয়েছি হাজারো অফশোর কোম্পানি গড়ার মাধ্যমে।" ফিডেলিটির এই সেবা বিস্তৃত হয়েছে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও বেলিজে। লাটভিয়ার রাজধানী রিগাতেও তাদের অফিস আছে।

সেশলসে ফিডেলিটি যা করে, তা অবৈধ নয়। যদিও তাদের সেবা ব্যবহার করে কর ফাঁকি দেওয়াটা অনেক দেশেই অবৈধ হতে পারে।

ওসিসিআরপি ফিডেলিটির কর্মীদের মেইল করার পর তারা সবকিছুতে সহায়তা করেছে। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি এবং কখনোই আলোচনা করেনি যে, এসব কর্মকাণ্ড অবৈধ হতে পারে কি না। তারা শুধু বলেছে, কর ফাঁকির অভিযোগ এড়াতে তাদের গ্রাহকেরা অন্য কোন কোন জায়গায় আরও বেশি অর্থ খরচ করতে পারেন। তাদের এই সেবার মূল্য: ১,৬৫৭ ডলার।

অফশোর একটি কোম্পানি খোলার অর্ডারটি ওসিসিআরপির রিপোর্টাররা করেছিলেন অনলাইনে। ফিডেলিটির ওয়েবসাইটে কিছু ফরম পূর্ণ করার পর তারা একটি ই-মেইল বার্তা পেয়েছিলেন ফিডেলিটি করপোরেট সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্টেলা কন্সট্যান্সের কাছ থেকে। সেখানে পরবর্তী ধাপগুলোর কথা বর্ণনা করা ছিল: রিপোর্টারদের পাঠাতে হবে কোম্পানি মালিকের পাসপোর্ট, একটি রসিদ, যেখানে মালিকের বর্তমান ঠিকানার উল্লেখ থাকবে। সবকিছু স্বাক্ষর ও স্ক্যান করে ই-মেইলে পাঠানো হয় সেশলসে। এটি স্পষ্ট নয় যে, ফিডেলিটি কীভাবে এসব পাঠানো তথ্যের সত্যতা যাচাই করবে।

আমাদের পরিচয়ের গোপনীয়তা কীভাবে রক্ষা করা হবে– এমন উদ্বেগের জবাবে স্টেলা বলেছেন, "আইন [সেশলস ইন্টারন্যাশনাল করপোরেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাক্ট] অনুযায়ী, আমাদের গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার দায়বদ্ধতা আছে। এই তথ্যগুলো থাকবে শুধুই আমাদের অভ্যন্তরীণ ফাইলে। কোনো উন্মুক্ত নথিতে নয়। সেশেলসের সব নিবন্ধিত এজেন্টের জন্যই একই নিয়মনীতি প্রযোজ্য।"

অফশোর কোম্পানি খোলার সব খরচ ফিডেলিটি বহন করবে। অংশীদার ও প্রক্সি ডিরেক্টরও তারা সরবরাহ করবে। অর্ডারটি দেওয়ার পর, সব কাগজপত্র ইউরোপে পাঠানো হবে দ্রুতগতির কুরিয়ারের মাধ্যমে এবং তিন সপ্তাহের ভেতরেই অফশোর কোম্পানিটির কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে।

প্রক্সি ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, তা ই-মেইলে ব্যাখ্যা করেছেন ফিডেলিটির আরেক কর্মী, সিন্থিয়া চেহাব। সত্যিকারের মালিক অফশোর কোম্পানিটির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন দুটি নথির মাধ্যমে: "জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি" (খরচ: ২২৫ ডলার) বা "স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি" (২৫০ ডলার)। প্রথম নথির মাধ্যমে কোম্পানিটির ওপর সত্যিকারের মালিকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সীমাহীন সময়ের জন্য। যদিও, ফিডেলিটির আইনজীবীরা এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন, বলেছেন চেহাব। তিনি ই-মেইলে রিপোর্টারদের সতর্ক করে

লিখেছিলেন, "এটি একটি নতুন পরিবেশ, জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (যেটি গত বছর ইস্যু করা হয়েছিল) গ্রাহকের জন্য চরম বিপজ্জনক হতে পারে। মনে রাখুন, জেনারেল (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) গ্রাহকের জন্য অভ্যন্তরীণ করের দায়বদ্ধতা তৈরি করতে পারে এবং এটি একটি সরাসরি লিখিত প্রমাণ যে, কোনো ব্যক্তি বিদেশে একটি কোম্পানি পরিচালনা করেন এবং এ জন্য তাকে এই অফশোর কোম্পানির মুনাফার জন্য নিজ দেশে করের মুখে পড়তে হবে।"

এর পরিবর্তে, চেহাব একটু বেশি ব্যয়বহুল "স্পেশাল কাস্টমাইজড পাওয়ার অব অ্যাটর্নি" সেবা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি রিপোর্টারদের কাছে কোম্পানির আরও ব্যয়বহুল ডিরেক্টর প্রক্সি সেবাও বিক্রি করেছেন। কারণ, "আপনার পেশাদার ডিরেক্টরশিপ সেবা প্রয়োজন, যেন কেউ জানতে না পারে যে আপনি সরাসরি একটি অফশোর কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন।"

ফিডেলিটির ওয়েবসাইটে এমন একজন প্রক্সি পরিচালকের খরচ ধরা হয়েছে বছরে ১০০০ ডলার। এজেন্ট রিপোর্টারদের এ-ও জানিয়েছেন, তারা চাইলে করপোরেট ডিরেক্টরশিপ সেবাও ব্যবহার করতে পারেন। যেখানে ২৫০ ডলারের বিনিময়ে আপনার কোম্পানির ডিরেক্টর নির্বাচন করা যাবে আরেকটি অফশোর সেশেলস করপোরেশনকে।

পরিশিষ্ট

ড্রিউ সুলিভান, সম্পাদক : প্রতিবেদনটির বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন রিপোর্টিং দল কাজ করেছে। আমরা মিহাইকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সব সহকর্মীর কাছ থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে লেখার কাজ শুরু করতে। কখনো কখনো একজন ব্যক্তির মাথাতে পুরো জিনিস রাখার কৌশলটি ভালো কাজ দেয়। এ ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে, কিন্তু পুরো বিষয়টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

এ ধরনের প্রতিবেদনগুলো বেশ গুরুতর হওয়ায়, আমরা সব সময় দুই স্তরে সম্পাদনা করি। প্রতি পর্যায়েই, পল রাদু ও মিহাই, অথবা পল ও আমি প্রতিবেদনটির কাঠামো নিয়ে আলোচনা করি এবং একটি ঐকমত্যে পৌঁছাই। প্রথম পর্যায়ের সম্পাদনা করেছিলেন পল। মূল প্রতিবেদনটি বেশ বড় ছিল, ফলে পল সেটিকে ছোট কিছু অংশে ভেঙে নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন ও কপি এডিটিং করেছেন। এরপর এটি আমার কাছে এসেছে তথ্য যাচাই ও চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য। আমাদের রিপোর্টারদের প্রধান ভাষা ইংরেজি না হওয়ায়, কিছু জিনিস নতুন করে লিখতে ও সাজাতে হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টিং সঠিক থাকলে সেখানে সব উপাদানই ছিল। এ ক্ষেত্রে, প্রতিবেদনটির রিপোর্টিং ছিল খুবই ভালো। প্রকল্পটির শেষ পর্যায়ে, আমি অন্য রিপোর্টারদের কাছ থেকে আরও কিছু প্রতিবেদন জোগাড় করেছি এই ধারাবাহিকে যোগ করার জন্য এবং সেগুলোতে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট যুক্ত করেছি। এগুলো আলাদাভাবেই একেকটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ছিল। এই পুরো প্রক্রিয়াতে কিছুটা সময় লেগেছে– প্রায় এক মাস।

মিহাই মুন্তেনু, প্রধান রিপোর্টার : আগের অনুসন্ধানগুলো থেকে অফশোর ইন্ডাস্ট্রির ইস্যুগুলো সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা ছিল। আমরা এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান অফশোর এজেন্সি সম্পর্কেও জানতাম। কিন্তু আমরা জানতাম না যে, ঠিক কীভাবে একটি আন্তঃসীমান্ত অফশোর নেটওয়ার্ক কাজ করে। এবং আমরা ভাবিনি যে, আমরা এত এত সংযোগ খুঁজে পাব।

আমরা মূলত প্রতিবেদনটি লিখতে শুরু করার আগে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রধান ধাপ: আমি ডেটাবেস থেকে তথ্য নিয়েছি।

অফশোর কোম্পানি গঠনের জায়গাগুলোতে, অনলাইনে কোম্পানি ডেটাবেসে খুবই অল্প তথ্য থাকে। তারা শুধু একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি বা নিবন্ধন এজেন্টকে শনাক্ত করে। ফলে আমরা এসব অফশোর ডেটাবেসের তথ্য মিলিয়ে দেখেছি বলকান দেশগুলোর সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা খুঁজে পেয়েছি যে কারা অফশোর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কারা সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এসব তথ্য থেকে, অনলাইন ডেটাবেসের অস্পষ্টতাগুলো বেরিয়ে আসে। বসনিয়ার তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আমরা আদালতে চলমান তিনটি ফৌজদারি মামলার প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ করেছিলাম।

দ্বিতীয় ধাপ: মনুষ্য সূত্র শনাক্তের চেষ্টা করা। তাদেরকে শুধু শনাক্ত করাই যথেষ্ট ছিল না; তাদেরকে কথাও বলতে হতো।

তৃতীয় ধাপ ছিল, আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, তা প্রমাণের উপায় খুঁজে বের করা। এখানে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী, আমি ভেতর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি ছদ্মবেশী রিপোর্টার হিসেবে। এ জন্য আমি এক ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়েছিলাম, যিনি আমাকে ছদ্মবেশে এই অফশোর ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে সহায়তা করেছিলেন। এটি ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। তবে বিশ্বাস জাগানোর জন্য আমি এই খাত নিয়ে পড়াশোনাও করেছিলাম।

চতুর্থ ধাপ: পুরো দৃশ্যটি সামনে চলে আসার পরই কেবল আমি আমার ভাষ্যকে কাঠামোবদ্ধ করতে পেরেছি। প্রতিবেদনটি কাঠামোবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি আমাকে সহায়তা করেছে: একটি সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণ এবং বর্ণনাধর্মী নানা উপাদান। আমি দুটি প্রাসঙ্গিক গ্রাফিকসও তৈরি করেছিলাম। আমার মতে, একটি প্রতিবেদন পড়ার সময় সেটি একই সঙ্গে দেখাও উচিত।

আমার জানামতে, প্রতিবেদনটির নির্ভুলতা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। কেউই কোনো জায়গার জন্য ব্যাখ্যা দাবি করেনি এবং আমাকে কেউ মামলার হুমকিও দেয়নি। আমাদের প্রতিবেদনটি অনেক বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়েছে, যেটি আমার জন্য খুব উপভোগ্য ছিল। তবে এর বেশি ধন্যবাদ জ্ঞাপনও অপ্রয়োজনীয়; কারণ, আমরা শুধু বাস্তব তথ্যকেই সামনে এনেছি। একটি প্রতিবেদন নিয়ে কাজ শুরুর সময় শুধু সেখানকার অন্যায্য পরিস্থিতির চিত্র উন্মোচন করতে চাই। অন্যরা সেটি বদলানো নিয়ে কাজ করবে। আমার মতে, অফশোর ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমাদের প্রতিবেদনগুলো এই অঞ্চলের সংঘবদ্ধ অপরাধীদের সূক্ষ্ম কৌশলকে বাধার মুখে ফেলেছে। এটি নিয়ে আমি অংশত সন্তুষ্ট।

৭

সপ্তম অধ্যায়

পাচারকারী এবং নিপীড়কের দল

১.

লাটভিয়ান বধূ

জেমি স্মিথ ও
আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনা

ভূমিকা

ইউরোপে মানব পাচারকারী চক্রের ভোল পাল্টে যেতে শুরু করে ১৯৮০ সালের শুরুতে। ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাচারকারী, পরিবহনকারী এবং দালালদের কাজের পদ্ধতিও পাল্টাতে শুরু করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সাধারণভাবে ধরে নেয়, পাচার হওয়া বেশির ভাগ নারী বাড়তি অর্থ এবং জীবনে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের টানেই এ ধরনের ফাঁদে পা দেয় এবং দাসত্ব বেছে নেয়। তাদের এ ধরনের ভাবনার ফাঁকে পাচারকারীরাও তাদের কৌশলের একটি কাঠামো তৈরি করে ফেলে। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্রমবর্ধমান আত্মপ্রসাদে ভোগার মাত্রাও ভাবনার বাইরে চলে যায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার নারীদের পশ্চিমা দেশগুলোতে ভালো চাকরির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা হয়। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখে, সেখানে তাদের যৌনপল্লি অথবা কোনো নৈশক্লাবে যৌন ব্যবসায় নামতে হবে। প্রতিবাদ করলে তাদের কপালে জোটে মারধর। তাদের কাউকে কাউকে তখন অন্য দালালের কাছে আবারও বিক্রি করে দেওয়া হয়। সাংবাদিকেরা এই পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বেলজিয়ামের পত্রিকা ক্রিস দু স্টুপ এবং সাপ্তাহিক ন্যাক-এ পাচারের ওপর প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি এ ধরনের চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু এই পাচারকারী চক্র কখনোই ধ্বংস হয় না, এর কোনো শেষ নেই।

পাচারকারীরা সব সময় নতুন শিকার ধরার জন্য স্থান ও কাজের ধরন পাল্টায়। এ ধরনের স্টোরি যখনই করা হয়, তখনই হয়তো কেউ একজন এদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এখানে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক থেকে কিছু অংশ নিয়ে দুটি স্টোরি পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ইউরোপিয়ান ফান্ড ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম'-এর কাছ থেকে কাজ করার জন্য অনুদানও পাওয়া গেছে। স্মিথ ও ইয়োলকিনা অভিবাসী এবং স্থানীয়দের মধ্যে বিয়ে দেওয়াসংক্রান্ত একটি চক্রের 'শ্বেতাঙ্গ বিয়ের' যে কল্পকাহিনি চালু আছে, তা অনুসন্ধান করেছেন। তারা দাপ্তরিক নথিপত্র এবং এনজিও সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তারা নারী পাচারের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে একটি সাংবাদিক দলকে সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশেও পাঠিয়েছেন। যদিও পাচার হওয়া সব নারী ঘটনার শিকার না হলেও সাংবাদিকেরা তাদের প্রকৃত চিত্র এবং অবস্থা তুলে ধরেছেন অনেক সময় নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পাচার হয়ে আসা নারীরা খুবই সরল হয় এবং বড় ধরনের বিপদের মধ্যে পড়ে। আমি মনে করি, গণমাধ্যমগুলো যদি এই অনুসন্ধান থেকে সর্বোচ্চ ফল পেতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের উচিত এখনই স্টোরিটি ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা এবং সমস্যার সমাধান প্রস্তাব করা। কেউ বিতর্ক করতে পারেন, এটা তো গণমাধ্যমের ভূমিকা নয়। আবার কেউ বলতে পারেন, গণমাধ্যম যদি তাদের লড়াইয়ে এ ধরনের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে এই ভূমিকা খারাপ নয়, বরং অনেক ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। গণমাধ্যমের সমাধানের পথ তৈরি করা এবং তা নিয়ে তদবির করার কাজটি পরে এনজিও সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যায়। তারাও কখনো গণমাধ্যমের সংকট এবং তাদের বিকাশের কারণ খুঁজতে অনুসন্ধানী স্টোরি তৈরিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

আইরিশ টাইমস, অক্টোবর-২০১০

প্রথম পর্ব

আয়ারল্যান্ডে মিথ্যা বিয়ের নামে প্রতারণা

জেমি স্মিথ

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন বিমানবন্দরে অবতরণের পর আনার প্রায় এক বছর সময় কেটে গেছে। লাটভিয়া থেকে আগত ১৮ বছর বয়সী আনা স্কুলছাত্রী। আয়ারল্যান্ডে সে আসে দুই সপ্তাহের জন্য। লাটভিয়ায় স্কুলের ছুটিতে আনা আয়ারল্যান্ডে বেড়াতে আসেনি। তার ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করেছিল ২৪ বছর বয়সী পাকিস্তানি যুবক মোহাম্মদ। আনার এক বন্ধু এই ট্রিপের ব্যবস্থা করে দিয়ে বলেছিল, এখানে এসে সেই পাকিস্তানি যুবককে বিয়ে করলে আনাকে অর্থ দেওয়া হবে।

আনার ভাষ্য হচ্ছে, তার সেই বান্ধবী আগেও আয়ারল্যান্ডে এসেছে এবং এখানে তার ভালো কিছু বন্ধু আছে। সে আমাকে বলেছে, "পাকিস্তানি যুবকটি আমি যা চাই, তা-ই কিনে দেবে। আর আমি না চাইলে তাকে বিয়ে করতে হবে না। তবে কয়েক সপ্তাহ আমাকে ওই যুবকের সঙ্গে কাটাতে হবে।" কথা বলতে বলতে আনা একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। এই ট্রিপ তার কাছে এখন বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

আনা লাটভিয়া থেকে আগত সেই তরুণীদের একজন, যাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এরা বেশির ভাগই সরল এবং দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বাইরে থেকে এসে প্রতারণামূলক বিয়ের ফাঁদে আটকা পড়ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবাধ চলাচলের বিষয়ে একটি আইনি নির্দেশনার সুবিধা নিয়েছে প্রতারক চক্র। সেই আইনে বলা আছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের নাগরিকের সঙ্গে কোনো ইউনিয়নবহির্ভূত নাগরিকের বিয়ে হলে তিনি সে দেশে বসবাসের অধিকার পাবেন। (যদিও আয়ারল্যান্ডের কোনো নাগরিককে বিয়ে করলে সেখানে বসবাসের অধিকার পাওয়া যায় না।) এই নির্দেশনা আইনে পরিণত হয় ২০০৬ সালে। আর তারপরেই বহু মানুষ এই আইনে আয়ারল্যান্ডের নাগরিকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে সেখানে বসবাসের জন্য আবেদন করতে শুরু করে। ২০০৬ সালে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২০৭ জন। ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ১২৯ জনে। এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ২০১০ সালের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ১৮৬টি আবেদনপত্র জমা পড়ে।

এই বিয়েগুলোর বেশির ভাগ আইনসিদ্ধ হলেও দেশটির আইনমন্ত্রী ডেরমট আহার্ন জানান, "এ ধরনের বেশির ভাগ বিয়েতে পাত্রপাত্রীর জাতিগত পরিচয় এবং তাদের সম্মিলন আমাদের কাছে বেশ অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এতে করে একটা ধারণা জন্মায় যে, বিয়েগুলো মিথ্যা।" জানুয়ারি মাসে স্পেনে ইইউর এক বৈঠকে এহার্ন তার সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "ইইউর অভিবাসন আইন অপব্যবহারের বিষয়ে আমাদের কাছে প্রচুর প্রমাণ আসছে। আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, পাকিস্তান এবং বাল্টিক রাজ্যগুলোর বাসিন্দাদের মধ্যকার প্রেম কমছে না।"

বিচার বিভাগের কাছ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, আগস্ট মাসে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদের পক্ষ থেকে ২৬৬টি বিবাহবিষয়ক আবেদন জমা পড়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির মানুষের পক্ষ থেকে করা আবেদনের এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা। পাকিস্তানিদের কাছ থেকে পাওয়া বিবাহের আবেদনের মধ্যে ১১৫টির পাত্রী হচ্ছেন লাটভিয়ার নারী। এর বাইরে ভারতীয়, বাংলাদেশি ও নাইজেরিয়ার নাগরিকেরাও এ ধরনের বিবাহের জন্য আবেদন করেছেন। তাদের পাত্রীদের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের নারীর সংখ্যা বেশি।

এই অবস্থা এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে দেশটির একজন জ্যেষ্ঠ বিবাহ নিবন্ধক আগস্ট মাসে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, আয়ারল্যান্ডে এ ধরনের বিয়ের ১৫ শতাংশই ভুয়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ডেনিস প্রায়র দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় স্বাস্থ্যসেবা নিবন্ধন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। এ ধরনের বিয়েতে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানিয়েছেন, বর এবং বধূকেও কথা বলার জন্য দোভাষীর সহায়তা নিতে হয়েছে। কারণ, তারা একে অপরের ভাষাও বোঝেন না।

আমার সঙ্গে আনার দেখা হয় একটি ক্যাফেতে। আনা লাটভিয়ার রিগা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে একটি জায়গায় বসবাস করতেন। লাটভিয়ার সাংবাদিক আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনা তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ইয়োলকিনা তার নিজের দেশে আয়ারল্যান্ড ও

লাটভিয়ার মধ্যে এই ভুয়া বিয়ের ব্যবসা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তিনি প্রতারণার শিকার বহু নারীর ধর্ষিত হওয়ার কাহিনিও লিখেছেন। ইয়োলকিনা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ইন্টারনেটে একজন লাটভীয় নারীর পরিচয়ে "কাগুজে বিয়ে চাই" এই শিরোনামে অ্যাকাউন্টও খুলেছেন। এই অনুসন্ধানের জন্য আইরিশ টাইমস পত্রিকা তার সঙ্গে যৌথভাবে কাজে নেমেছে এবং তাদের কাছে থাকা বিভিন্ন নারীর নাম-পরিচয় তাকে সরবরাহ করেছে।

আনা ছিলেন এই নারীদেরই একজন। তিনি অবশ্য বলেন, মুহাম্মদকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। তিনি কেনাকাটা করা এবং একটু সুন্দর সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। তিনি একটি অচেনা দেশ ভ্রমণ এবং একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে বসবাসের ঝুঁকি সম্পর্কে আগে কিছুই আঁচ করতে পারেননি। আনা বলেন, "আমার কাছে খুব বেশি অর্থ ছিল না। আমার মায়ের কাছেও ছিল না। আমার পরিবার মাসে ২৫০ লাটস অর্থাৎ ৩০০ ইউরোর ওপর ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমি গত বছরের অক্টোবর মাসে আয়ারল্যান্ডে নামার পর দুজন পাকিস্তানি আমাকে বিমানবন্দর থেকে সম্ভাব্য স্বামীর কাছে নিয়ে যায়। ওই বাড়িতে তার ভাইও সপরিবারে বসবাস করত। আমার সেই হবু বরকে ভালো মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। তবে সে কম কথা বলত।"

আনা বলে, "মোহাম্মদ আমাকে বলেছিল, একটি ক্যাফেতে আমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমার পিপিএস অর্থাৎ পার্সোনাল পাবলিক সার্ভিস নম্বর লাগবে। সে আমাকে বলে, বিয়ের নিবন্ধন করানোর জন্য আমার জন্মসনদের প্রয়োজন হবে। নিবন্ধনের জন্য মোহাম্মদ আমাকে গলওয়েতে নিয়ে যেতে চাইলে আমি মিথ্যা করে বলি, আমার সঙ্গে জন্মসনদটি নেই। তারপরেই আমি তাকে জানাই, আমি বিয়ে করতে আগ্রহী নই। আর তাতেই সে রেগে গিয়ে বলে, বিয়ে করলেই আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারব। কারণ, বিয়ের ব্যবস্থা যে করেছে, তাকে ২ হাজার ইউরো দিতে হয়েছে। সেই ইউরো তাকে ফেরত দিতে হবে। পরবর্তী দুই দিন মোহাম্মদ আমাকে বাড়ির একটি ঘরে আটকে রাখে। আমার বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না।"

আনার তখন মনে হয়েছিল, লোকগুলো তাকে ধর্ষণও করতে পারে। কিন্তু ভয়টা প্রকাশ পেতে না দিয়ে আনা মনে মনে পালানোর পরিকল্পনা করতে থাকে। সেই বাড়িতে মোহাম্মদের কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যান আনা। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাবলিনে অবস্থানরত একজন লাটভিয়ান সাংবাদিককে নিজের অবস্থা জানিয়ে এবং সেই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে একটা মেইল পাঠিয়ে দেয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের পুলিশ ওই বাড়িতে পৌঁছে যায়। লাটভিয়ান দূতাবাস আনার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে দেশে ফেরত পাঠায়।

এ ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পা দেওয়া লাটভিয়ার অন্য নারীরা আনার মতো ভাগ্যবান ছিল না। প্রতারক চক্রের লোকজন তাদের আটকে রাখে এবং তারা ধর্ষণের শিকার হয়। গার্ডা ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ব্যুরো এসব ঘটনার তদন্ত করছে।

গত বছর লাটভিয়ার ১৯ বছরের এক তরুণী এবং ৪০ বছর বয়সী দুই নারীকে একদল ভারতীয় ব্যক্তি ডাবলিনের বাইরে একটি বাড়িতে আটক করে রাখে। তারাও প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। একটি আইরিশ এনজিও সংস্থার কর্মী পরে তাদের উদ্ধার করে। বন্দি নারীদের সবাইকে এমন একটি ঘরে রাখা হয়েছিল যেখানে ঠান্ডায় কোনো ধরনের তাপ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। তাদের খাবারও দেওয়া হতো এক বেলা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই নারী এনজিও কর্মী তাদের ভীত এবং অভুক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। অপরাধীরা সেই নারীদের খোঁজে তার ওপরেও হামলা করতে পারে– এই ভয়ে তিনি স্টোরিতে নিজের নাম প্রকাশে রাজি হননি। তিনি জানান, একজন লাটভিয়ান পুরুষ এবং নারী তাদের কথা দিয়েছিল, ইইউর বাইরের একটি দেশের নাগরিককে বিয়ে করলে তাদের অর্থ ও চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তারা পালানোর সময় রাস্তায় একটি গাড়ি আটকে ডাবলিনে চলে আসেন। পথে তারা ডাকাতের কবলেও পড়েন। তাদের ওপর নির্যাতন পর্ব তখনো শেষ হয়নি। বয়স্ক দুই নারীকে চক্রের লোকজন ই-মেইলে হুমকি পাঠাতে শুরু করে। তারা লাটভিয়ায় তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

লাটভিয়া পুলিশের মানব পাচার প্রতিরোধ ইউনিটের প্রধান আর্তুর ভাইসলা জানান, আয়ারল্যান্ডের এই প্রতারক চক্রের বিষয়ে তারা ২০০৬ সাল থেকে তথ্য পেতে শুরু করেছেন। তারা আয়ারল্যান্ডে পাকিস্তানি, ভারতীয় ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাগরিকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রতারকদের বিষয়ে গারডার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, তদন্তে নেমে তারা লাটভিয়াতে শিকার সংগ্রহের কাজে সক্রিয় দুটি দলের খোঁজ পান এবং তাদের আটক করার চেষ্টা চালান। কাজ অথবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে আসা নারীদের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে ভাইসলার ইউনিট।

এই নারীদের মধ্যে অনেকেই মোটা টাকার লোভে পড়ে স্বেচ্ছায় ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু এর পরিণামে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানতে পারে না। ভাইসলা জানান, অর্থ ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আয়ারল্যান্ডে যেসব নারীকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং জোর

করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের পেছনে সক্রিয় চক্রের সদস্যদের ধরতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার মতে, কিছু নারী অর্থের লোভে পড়ে সজ্ঞানেই এ রকম ফাঁদে পা দেন। কিন্তু তারা তাদের এই বোকামির ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয়ে কিছুই অনুমান করতে পারেন না। তিনি বলেন, "২০০৬ সালে পাচার চক্র নারীদের ২০ হাজার ইউরো দেওয়ার প্রস্তাব দিত। এত বড় অঙ্কের অর্থ একজন লাটভিয়ান নারী এক বছরেও আয় করতে পারেন না। কিন্তু ২০০৯ সালে এসে এই অর্থের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে কমে ২ হাজার ইউরোতে দাঁড়ায়।"

লাটভিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট নারীদের আয়ারল্যান্ডে এসে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করার জন্য একরকম বাধ্য করে। গত দুই বছরে লাটভিয়ায় বেকারত্ব বেড়েছে ২২ শতাংশ এবং জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য ঝুঁকিতে চলে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই হার সর্বোচ্চ।

লাটভিয়ায় স্থানীয় সাংবাদিক আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনার মাধ্যমে লিয়েনির সঙ্গে আইরিশ টাইমসের যোগাযোগ হয়। লিয়েনি বলেন, "আমি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় একজন মানুষ। লাটভিয়ার এজেন্ট আমাকে বলেন, তারা ৩ হাজার ইউরো দেবে।" লিয়েনি আয়ারল্যান্ডে আসেন এক পাকিস্তানি ছাত্র জুবারের সঙ্গে মিলিত হতে। তিন সন্তানের জননী লিয়েনি বলেন, "আমি সেই ছাত্রের বাড়িতে দেড় মাস ছিলাম। সে আমাকে থাকার জন্য আলাদা ঘর দিয়েছিল এবং পাওনা অর্থও মিটিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন ইচ্ছা আসা-যাওয়া করতে পারতাম। তারা আমাকে ডাবলিন থেকে বেশ দূরে বিবাহ নিবন্ধকের অফিসে নিয়ে যায়। আমার সঙ্গে জন্মসনদ, পাসপোর্ট এবং পিপিএস নম্বর ছিল। সেখানে আমাকে দু-একটি সহজ প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। তারা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, আমি আগে বিয়ে করেছি কি না। বিষয়টা খুব সহজ ছিল।"

সিভিল নিবন্ধন আইন অনুযায়ী সব বিবাহের অনুষ্ঠানের অন্তত তিন মাস আগে একজন নিবন্ধককে অবগত করতে হয়। এ কারণে লিয়েনিকে ডাবলিনের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য কয়েক সপ্তাহ পরে লিয়েনি জুবারকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাড়ি ফিরে যান। তবে তিনি জানান, এমন অনেক নারীকে তিনি চেনেন, যারা বিয়ে করে আয়ারল্যান্ডে বসবাস করছে।

আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনা এই নারী পাচার এবং মিথ্যা বিয়ে নিয়ে একটি বই লিখছেন। তিনি উপাদান সংগ্রহের জন্য এ ধরনের চক্রের ভেতরেও প্রবেশ করেছেন। ইয়োলকিনার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, নারীদের ধরার জন্য এরা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। তিনি বলেন, "কখনো তারা আয়ারল্যান্ডে কাজ করছে এমন নারীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। তারা সেই নারীর সঙ্গে একটি সত্যি ভালোবাসার গল্প তৈরি করে। এই সম্পর্কে অর্থের কোনো লেনদেন থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারের কারণে বিয়ে হওয়ার পর লাটভীয় নারীটির মনে হয়, তার স্বামী তার জন্য আসলেই ভিসা জোগাড় করার চেষ্টা করছে। তারা যদি সরাসরি লাটভিয়া থেকে তাদের শিকার সংগ্রহ করে, তাহলে ধরা পড়া নারীটিকে বিয়ের আগের বাধ্যতামূলক তিন মাস সময় আয়ারল্যান্ডে থাকতে হয় অথবা সে আবার লাটভিয়ায় ফিরে গিয়ে বিয়ের তারিখের কিছুদিন আগে আবার ফিরে আসে।" ইয়োলকিনা জানান, লাটভিয়ার গণমাধ্যমে অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ফ্রাইপে ডট কম'-এ চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে এই নারীদের প্রলুব্ধ করা হয়।

বই লেখার জন্য গবেষণার কাজ করার সময় ইয়োলকিনা সাধারণ লাটভীয় নারীর ছদ্ম পরিচয়ে ইন্টারনেটে বিদেশে চাকরির খোঁজ করেন। ২০ জন ব্যক্তি নেটে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মোট ১৮টি এয়ারলাইনসের টিকিটের জন্য অর্থ দেয়, তাকে লাটভিয়া থেকে আয়ারল্যান্ডে গিয়ে মিথ্যে বিয়েতে অংশ নেওয়ার জন্য। অতি সম্প্রতি ইন্টারনেটে আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত একজন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই ব্যক্তি নিজেকে 'ভিকি সিং' নামে পরিচয় দেয়। ভিকি সিং অনলাইন চ্যাটে কাগুজে বিয়েতে রাজি হলে তাকে কয়েক হাজার ইউরো পাঠানোর প্রস্তাব দেয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনা করতে আসা পাকিস্তানি, ভারতীয় ও বাংলাদেশি ছাত্ররা এ ধরনের মিথ্যা বিয়ের প্রতারণার সঙ্গে জড়িত হয়। তাদের অস্থায়ী ভিসা থাকার কারণে শ্রম ঘণ্টার ওপর কড়াকড়ি থাকে এবং ইইউভুক্ত দেশগুলোতেও তারা ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করতে পারে না। আফ্রিকার যেসব নাগরিক এ ধরনের প্রতারণামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা বেশির ভাগই রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। কেউ কেউ রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। গারডা ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ব্যুরোর জন ও ড্রিসকোল বলেন, "প্রকৃতপক্ষে ইইউ চুক্তির অধিকারগুলোই অভিবাসন অধিকারের স্বর্ণদুয়ার হিসেবে কাজ করে।" ড্রিসকোল মিথ্যা বিয়ের ক্রমবর্ধমান এই দুর্নীতি প্রতিরোধে পরিচালিত 'অপারেশন চ্যারিটি' নামে একটি কার্যক্রমের সমন্বয় করছেন। তিনি জানান, তাদের ব্যুরো গত নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে নিবন্ধকের কার্যালয়ে দেওয়া ৫৭টি সরকারি বিয়ের নোটিশের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে এবং তদন্তের মাধ্যমে মিথ্যা বিয়ের অবৈধ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ১৬ জনকে আটক করেছে। তিনি আরও জানান, ব্যুরো আরও কয়েকটি ধর্ষণ এবং মানব পাচারের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে। তবে এগুলো এখনো আদালতে ওঠেনি।

কোনো বিয়ের জন্য তিন মাসের নোটিশকালীন যে কারও অধিকার আছে আপত্তি জানানোর। এ ধরনের আপত্তি নোটিশ পেলে নিবন্ধককে বিষয়টা নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার নয় যে, একজন নিবন্ধকের একটি বিয়ে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় আইনি ক্ষমতা আছে কি না! উল্টো বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ে বন্ধ করার অভিযোগে নিবন্ধকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিতে পারেন।

আয়ারল্যান্ডে অর্থ লাভ অথবা সেখানকার অভিবাসন আইনের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য 'সুবিধার্থে বিবাহ' বেআইনি নয়। পাশাপাশি বৈধ নাগরিক নয় বলে কেউ বিয়ে করতে পারবে না এমন নিষেধাজ্ঞাও সেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর এসব কারণেই বিয়ে নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কঠিন হয়ে উঠেছে। লাটভিয়া থেকে ইংরেজি ভাষার একজন দোভাষী গত দুই বছরে অন্তত ১০টি বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "এগুলো যে বেশির ভাগই মিথ্যা বিয়ে, তা খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়। বিয়েতে পাত্রপাত্রী জিনসের প্যান্ট ও টি-শার্ট পরে আসে। এসব তো বিয়ের পোশাক নয়। তাদের সঙ্গে কোনো বন্ধুবান্ধবও উপস্থিত থাকে না। বর সঙ্গে করে দুজন সাক্ষী নিয়ে আসে। আমি কখনো কোনো নিবন্ধককে দেখিনি এ ধরনের বিয়ে বন্ধ করতে।" নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেই দোভাষী এসব তথ্য জানান। এই দোভাষী ব্যক্তিটি ড্রোহেডা, টিপারেরি এবং ডোনেগাল কাউন্টিতে বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ করেছেন। ডাবলিনে এ রকম একটি বিয়ের ব্যবস্থা করতে প্রায় পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। কিন্তু রাজধানীর বাইরে তিন মাসের নোটিশে কাজটা হয়ে যায়।

ইইউর একজন নাগরিকের জন্য স্থায়ী ঠিকানা এবং চাকরি হচ্ছে সঙ্গীকে পালন করার নিশ্চয়তা। বিচার বিভাগের কাছে ইইউর নাগরিক নন এমন ব্যক্তিকে বসবাসের অধিকার দেওয়ার জন্য এ দুটি বিষয়ে নিশ্চয়তার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রতারক চক্র লাটভিয়া থেকে আসা নারীদের ফাঁদে ফেলার জন্য নকল কোম্পানির কাগজপত্র তৈরি করে রাখে। ডাবলিনে একজন পাকিস্তানির মালিকানাধীন একটি ভুয়া কোম্পানি থেকে ৫০ জন নারীকে চাকরির নিয়োগপত্র সরবরাহ করা হয় মিথ্যা বিয়ের স্বামীদের বসবাসের আবেদনে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু গারডার পক্ষ থেকে সেই চাকরিস্থলে ফোন করে দেখা যায়, ওই নামে কেউ কাজ করেন না।

সাভেৎলানা বিসেনিস আয়ারল্যান্ডে লাটভিয়ার দূতাবাসে কাউন্সিলর অ্যাসিস্ট্যান্স বিভাগে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার কাছ থেকে জানা যায়, ডাবলিনের দূতাবাসে বিপুলসংখ্যক লাটভীয় নারীর আগমন ঘটত তাদের জন্মসনদ তোলার জন্য। মিথ্যা বিয়ের নিবন্ধনে এই সনদের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন, "বেশির ভাগ সময়ে তাদের সঙ্গে পাকিস্তান, ভারত অথবা বাংলাদেশি পুরুষদের দেখা যেত। আমরা সেই নারীদের অন্য একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে আলাদাভাবে কথা বলতাম এ ধরনের বিয়ের নেতিবাচক দিক নিয়ে। আমরা তাদের জানাতাম, এ ধরনের বিয়ের পরে বিবাহবিচ্ছেদ করাটা বেশ কঠিন। আমাদের কথায় কাজ হতো। প্রতি ১০ জন আগত নারীর মধ্যে অন্তত দুজন মিথ্যা বিয়ের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতেন।"

বিসেনিস এ বিষয়ে আয়ারল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের শিথিলতার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "লাটভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আয়ারল্যান্ডের সরকারকে বারবার বলা হয়েছে এ ধরনের প্রতারণা আটকাতে সহজ কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সব বিদেশি নাগরিকের কাছে বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দূতাবাসের পক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র দাখিল করা। এতে করে আয়ারল্যান্ডে সব লাটভীয় নারীর বাধ্যতামূলকভাবে ডাবলিনের দূতাবাসে হাজির হতে হবে এবং আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব।"

তিনি বলেন, "লাটভিয়া এবং অন্য ইইউভুক্ত দেশগুলোর ডাবলিনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে নানান পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করার পরেও আয়ারল্যান্ডের কাছ থেকে খুব সামান্যই সাড়া মিলেছে।"

দ্বিতীয় পর্ব

মিথ্যা বিয়ের নামে প্রতারণা বন্ধ করতে আয়ারল্যান্ডকে পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ দিয়ে ভালোবাসা কেনা যায় না, কিন্তু আপনি আয়ারল্যান্ডে অর্থের বিনিময়ে লাটভীয় নারী এবং পাকিস্তানি পুরুষের বিয়ের কাগজপত্র কিনতে পারবেন।

আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনা

মাত্র কয়েক হাজার ইউরোর প্রলোভন লাটভিয়ার দারিদ্র্যপীড়িত তরুণীদের টেনে আনছে আয়ারল্যান্ডে। এই দেশ এখন এ ধরনের তরুণীদের সঙ্গে পাকিস্তানি অথবা ভারতীয় পুরুষদের কাগুজে বিয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। লাটভিয়া থেকে আগত নারীদের আকাঙ্ক্ষা থাকে ইইউভুক্ত কোনো একটি দেশের নাগরিকত্ব।

এই প্রতারণা কাণ্ডের জন্য আয়ারল্যান্ড উর্বর ভূমি হয়ে উঠল কেন? যথাযথ আইনের অভাবই কি একমাত্র কারণ? আয়ারল্যান্ড ভারত অথবা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আগত ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারা পুরুষদের পছন্দের জায়গা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে লাটভিয়া দরিদ্রতম। আয়ারল্যান্ডে আগত দেশটির নারীদের বেশির ভাগই নিঃস্ব।

এই সমস্যার মতো এর সমাধানও জটিল। নারী ও পুরুষ উভয়কেই এই পথে ঠেলে দেয় দারিদ্র্য। তাই তাদের কাছে মিথ্যা বিয়েটা হয়ে দাঁড়ায় দারিদ্র্যের নরক থেকে মুক্তির পথ। কিন্তু লাটভীয় নারীদের স্বপ্ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ হয় না। খুব কম ক্ষেত্রে এই বর-বধূ একসঙ্গে বসবাস করে। তাদের মিথ্যা বিয়েটাও খুব কমই সত্যি হয়ে ওঠে। প্রতারণার ফাঁদেও মধ্যে প্রবেশ করে একজন নারীর 'কবুল' বলা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা থাকে না। কাজটা হয়ে যাওয়ার পর প্রতিশ্রুত অর্থও তারা পায় না। উল্টো কখনো শিকার হয় ধর্ষণের।

এ ধরনের ঘটনায় এশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষটি একবার বিয়ের আইনি কাগজপত্র হাতে পেয়ে যাওয়ার পর অবাধ চলাচলবিষয়ক নির্দেশনা পায়। ফলে ইউরোপের যেকোনো জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে যায় এবং পাঁচ বছরের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার একটি বড় অশুভ দিক হচ্ছে, এই প্রতারক চক্রের দালালেরা একটি বড় সংঘবদ্ধ অপরাধী সিন্ডিকেটের অংশ হয়ে যায়। সেই সিন্ডিকেট মিথ্যা বিয়ের মাধ্যমে কখনো কখনো ইসলামিক উগ্রবাদীদের আয়ারল্যান্ডে এবং পরে ইউরোপে প্রবেশে সহায়তা করে।

এই বিষয়ের ওপর বই লেখার জন্য আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ভেতরে ঢুকে পড়ি। তারা আয়ারল্যান্ডে মিথ্যা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। আমি পাকিস্তানি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বেশ কিছু নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যারা আমাকে মিথ্যা বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আমার মনে হয়েছে, এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আয়ারল্যান্ড এবং ইইউভুক্ত দেশগুলোতে আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন। আয়ারল্যান্ডে মিথ্যা বিয়েতে আইনগত বাধা নেই। কেউ অর্থ লাভের জন্য কাজটা করলে তাকেও আইন বাধা দেয় না। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আয়ারল্যান্ডে নতুন প্রস্তাবিত আইনে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে কিন্তু মিথ্যা বিয়ে ঘটে যাওয়ার আগে-পরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এই দেশগুলোতে মিথ্যা বিয়ে সন্দেহ করলে একজন সরকারি বিবাহ নিবন্ধক বিয়ে স্থগিত বা বাতিল করে দিতে পারেন। তারা যদি দেখেন, বিয়ের পাত্র-পাত্রী একে অপরকে বুঝতে পারছে না অথবা তাদের কারও একজনের বসবাসের অনুমতির কাগজপত্রে গোলমালের গন্ধ আছে, তাহলে তারা বিয়ে বন্ধ করতে পারেন। জার্মানিতে সন্দেহ হলে একজন নিবন্ধক ইমিগ্রেশন বিভাগকে তদন্তের জন্য ডাকতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মকর্তারা বর-বধূকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের দুজনের উত্তর মিলিয়ে দেখে। বিয়ের পরেও সন্দেহ হলে তারা তদন্ত করতে পারে। তখন তারা দুজনকে পৃথকভাবে প্রশ্ন করে, কে বিছানার কোন দিকে ঘুমায়, কে চিনি দিয়ে অথবা চিনি ছাড়া কফি খায়। তদন্তের খাতিরে ইমিগ্রেশন তাদের কাছে বিয়ের ছবি, পানি, বিদ্যুৎ বা গ্যাসের বিলের যৌথ নামের বিলের কপি দেখতে চায়।

বেলজিয়ামে কোনো বিদেশি দম্পতি এ ধরনের বেআইনি কাজে জড়িত হলে তাদের বসবাসের অনুমতি বাতিল হয়ে যায় এবং তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের অর্থদণ্ডও দিতে হয়। সেখানে এ ধরনের অপরাধে ১০ বছরের কারাবাসের আইন আছে।

আয়ারল্যান্ডে পুলিশ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ, ভুয়া কাগজ দেখিয়ে সে দেশে বসবাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরোক্ষভাবে এই সমস্যার সমাধান করে। প্রতারক চক্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে তখনই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব যখন তারা লাটভিয়া থেকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে মেয়েদের আয়ারল্যান্ডে নিয়ে আসে এবং তাদের জোর করে বিয়ে দেয়।

এই একই চিত্র ইউকে, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, সুইডেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে দেখা যাচ্ছে। সেসব দেশে ইইউভুক্ত নয় এমন দেশের পাত্ররা পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া এবং চেক রিপাবলিক থেকে তাদের শিকার ধরছে। ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা এই সমস্যার সমাধানে তাহলে ইইউ কী ভূমিকা পালন করছে? উত্তর হচ্ছে, খুব বেশি কিছু নয়। আইনি বাধ্যবাধকতা নেই এমন দুটি নথি তারা প্রকাশ করেছে, যেখানে মিথ্যা বিয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তারা অপরাধের লক্ষণগুলো তালিকাভুক্ত করেছে এবং সদস্য দেশগুলোকে তাদের নিজেদের পন্থায় এ ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় কাজ করতে দিয়েছে। কিন্তু অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া থাকায় পাত্র-পাত্রীদের বিষয়ে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না। এরাও এই নির্দেশনার সুযোগ নিচ্ছে।

এখানে দুটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, নির্দেশনা রদ করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নির্দেশনার পাশাপাশি ইইউভুক্ত দেশগুলোতে বাধ্যতামূলক নতুন আইন প্রবর্তন করা। এখানে আমেরিকার আইনটি দেখা যেতে পারে। সেখানে বিয়ের দুই বছর সময়কাল পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা পাঁচ বছর মেয়াদি বসবাসের ছাড়পত্র দেয়।

আবেদনপত্র অনুমোদিত হওয়ার আগে দম্পতির কাছে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কেও প্রকৃত প্রমাণপত্র দেখতে চাওয়া যেতে পারে। কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হলে বিষয়টি তদন্ত করা যেতে পারে। নির্দেশনা সংশোধন না হলে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে বিয়ের নিবন্ধকদের ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে কোনো বিয়ের বিষয়ে সন্দেহ হলে তারা আরও অনুসন্ধানের জন্য বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারে। নিবন্ধকদের কাছে এই ধরনের অপরাধের লক্ষণসমূহের তালিকা পাঠাতে হবে, যাতে তারা তালিকার ওপর নির্ভর করে কাজ করতে পারে।

এ ধরনের মিথ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান আসলে বিয়ে এবং অভিবাসন আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। এই বেআইনি বিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে লাটভিয়ার জীবনযাপনের মানকে খর্ব করবে। তাই ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য আইন পরিবর্তন করতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বাড়াতে হবে।

পরিশিষ্ট

জেমি স্মিথ

এই অনুসন্ধানের কাজটা শুরু করি ২০১০ সালের জুলাই মাসে। ব্রাসেলস থেকে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু ফোনে জানায়, লাটভিয়ার একজন সাংবাদিক ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে লাটভীয় নারী ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের পুরুষদের মধ্যে বিয়ে নিয়ে একটি অনুসন্ধানী স্টোরি করতে আগ্রহী। লাটভিয়ার সেই সাংবাদিক সেখানকার একটি সংবাদপত্রে কাজ করার সময় মিথ্যা বিয়ের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন নারীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে পারে। আমি ব্রাসেলসে মিথ্যা বিয়ে নিয়ে একটি স্টোরির কাজ করায় বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিলাম।

আমি লাটভিয়ার সাংবাদিক আলেকসান্দ্রা ইয়োলকিনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি তখন মিথ্যা বিয়ের প্রতারক চক্র নিয়ে একটা বই লেখার কাজ করছিলেন। আমরা একে অপরকে নিজ নিজ দেশের তথ্য, বিভিন্ন মনুষ্য সূত্রের যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে সহায়তা করব বলে একমত হই।

যৌথভাবে কাজ করায় আমরা দুই দেশের পরিস্থিতি ভালোভাবে জানতে পারি এবং বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র আমাদের হাতে চলে আসে। প্রামাণিক তথ্যের জন্য আমি আয়ারল্যান্ডের বিচার বিভাগের কাছে ইইউভুক্ত নয় এমন দেশের নাগরিকদের বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনার একটি পরিসংখ্যান চেয়ে আবেদন করি। সেই আবেদনে সেই দম্পতিদের জাতীয়তার পরিচয় আলাদাভাবে জানতে চাই।

তারা আমাকে যে পরিসংখ্যান পাঠায়, তাতে দেখা যায় ইইউর নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এ ধরনের আবেদনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, লাটভীয় নারীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে অনেক বেশি সংখ্যায় পাকিস্তানি পুরুষ বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে। আমরা বুঝতে পারি, ইইউর নতুন নির্দেশনার সুযোগে প্রচুরসংখ্যক মিথ্যা বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমাদের অনুসন্ধানের পরবর্তী ধাপ ছিল, কীভাবে এই বিয়েগুলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কীভাবে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ইয়োলকিনা এক সপ্তাহের জন্য আয়ারল্যান্ডে এসে তদন্তকারী পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং জ্যেষ্ঠ বিবাহ নিবন্ধকের সাক্ষাৎকার নেন। আমি এগুলোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। সাক্ষাৎকারে ছাপার জন্য অননুমোদিত প্রচুর তথ্য আমরা পেয়ে যাই। আয়ারল্যান্ডে আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইয়োলকিনা মিথ্যা বিয়ের বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পান। তাকে চাকরি এবং ২ হাজার ইউরো দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এই ঘটনাগুলো আমাদের জানায়, কীভাবে মিথ্যা বিয়েগুলো ঘটানো হয়।

অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্বে আমি লাটভিয়া চলে যাই। সেখানে আমি দুজন নারীর সাক্ষাৎকার নিই, যারা মিথ্যা বিয়ের সূত্রে আয়ারল্যান্ড ভ্রমণ করেছে। সেখানে আমরা দারিদ্র্যপীড়িত সেই গ্রামগুলোতে যাই, যেখান থেকে বেশির ভাগ নারী সুখের আশায় প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা দেয়। সেখানে কিছু কিছু এনজিও সংস্থা প্রতারিত, ধর্ষিত নারীদের স্থানীয়ভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। আমি এনজিও সংস্থাগুলোর দপ্তরে যাই এবং তাদের সঙ্গে কথা বলি। আমরা লাটভিয়ায় পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলি। তারা আয়ারল্যান্ড কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

দেশে ফিরে আমি একজন দোভাষীর খোঁজ করতে থাকি। সেই ব্যক্তি এ ধরনের ১০টি মিথ্যা বিয়েতে দোভাষীর কাজ করেছিল। আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত একজন লাটভীয় সাংবাদিক এক তরুণীকে এ ধরনের স্বামীর কবল থেকে পালাতে সহায়তা করেছিলেন। আমরা সেই তরুণীর সাক্ষাৎকারও নিই।

আমি অবশ্য আইন ও বিচারমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার চাইলে তার দপ্তর থেকে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আয়ারল্যান্ড কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লাটভিয়া থেকে সরকারিভাবে অভিযোগ আসাতেই আমি মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার পাইনি বলে বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপরেও আমরা খুবই ভালো একটি স্টোরি তৈরি করেছিলাম, যা আয়ারল্যান্ডের পত্রিকায় ছাপা হয়। এ বছর টেলিভিশনেও এ বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রচারিত হবে।

২.
আতঙ্কের রাজ্যঃ
ইউরোপের বুকে নতুন দাস ব্যবসা

পূর্ব ইউরোপ থেকে দরিদ্র মানুষদের লোভ দেখিয়ে চেক রিপাবলিকে নিয়ে গিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমদাসে পরিণত করা হচ্ছে। কিছু কিছু সন্ত্রাসী এখন বিচারাধীন থাকলেও এই অসাধু বাণিজ্য শেষ হচ্ছে না।

হল্যান্ড ও ইউক্রেন থেকে আদ্রিয়ান মোগোস চেক রিপাবলিক ও রোমানিয়া থেকে পেত্রু জোলতান ও দরু কবুজ, মালদোভার ট্রান্সনিস্ট্রিয়া ও ইউক্রেন থেকে ভিতালি ক্যালুগেরিয়ানু এবং ইউক্রেন থেকে ভ্লাদ লাভরভ।

ভূমিকা

এখানে পুরস্কারজয়ী যে স্টোরি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা অ্যাড্রিয়ান মোগোস ও তার সহকর্মীদের তৈরি করা। এদের মধ্যে ভ্লাদ লাভরভ নিজেও আলাদাভাবে পুরস্কার পেয়েছেন সাংবাদিকতায়। তারা এখানে মানব পাচারের বিস্ময়জাগানো নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। এই স্টোরির মূল কেন্দ্রে রয়েছে খাদ্য; যৌনতাসম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়। এই স্টোরি পাঠককে নিয়ে গেছে ফসলের মাঠ থেকে রেস্তোরাঁ এবং বড় বড় বিপণিতে, যেখানে শ্রমদাসদের উৎপাদিত খাবার রান্না হয়ে পরিবেশন ও বিক্রি হয়। স্টোরিতে বলা হয়েছে, এই পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষ জানেই না এই সরবরাহ প্রক্রিয়ার অন্তিমে কী ঘটছে। আর তাতেই তৈরি হচ্ছে আতঙ্কজনক সব কাহিনি। যারা এই আতঙ্কজনক কাহিনির শিকার, তাদের অবস্থার বিবরণ এখানে জানাচ্ছে, সেখানে বিপন্ন পরিস্থিতির কোনো সীমারেখা নেই। স্টোরিটি লেখার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্রোধ ফুটে উঠেছে কিন্তু বিবরণে কোথাও পরিস্থিতির শিকার মানুষগুলো আড়ালে পড়ে যায়নি। এই স্টোরিতে বেশ কয়েকটি দেশের সাংবাদিকেরা জড়িত হয়েছেন। স্টোরির কাজে সহায়তা দিয়েছে 'ইউরোপিয়ান ফান্ড ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম' এবং ডেনমার্কের সংগঠন 'স্কুপ'। কয়েকজন দক্ষ সাংবাদিক এবং বিশ্লেষক এখানে একত্র হয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, তাদের গবেষণা থেকে কতটা ভালো ফল বের করে আনা সম্ভব।

প্রথম প্রকাশ বলকান ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং নেটওয়ার্ক (বিআইআরএন) এবং
বুখারেস্ট জার্নালুল ন্যাটিওনাল, ডিসেম্বর, ২০০৯

বার্লিন অথবা অ্যামস্টারডামের কোনো দামি রেস্তোরাঁর নৈশভোজের টেবিলে চেক রিপাবলিকের কোনো সবজিখেত থেকে সরাসরি তুলে আনা সজীব অ্যাসপারাগাস যখন খদ্দেরদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে, তখন তাদের কোনো ধারণাই নেই আধুনিক যুগের শ্রমদাসদের কী কঠিন কোমরভাঙা শ্রমের ইতিহাস এর পেছনে আছে। কেউ ধারণাই করতে পারবে না কোনো দরিদ্র দেশ থেকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা নারী-পুরুষদের সেখানে অস্ত্রের মুখে জোর করে কাজ করানো হচ্ছে। মজুরি আর খাবার চাইলে তাদের কপালে জুটছে প্রহার আর হুমকি। সেখান থেকে তাদের পালানোরও কোনো পথ নেই।

রোমানিয়া, চেক রিপাবলিক, মলদোভা, ট্রান্সনিস্ট্রিয়া (মলদোভা থেকে সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন), ইউক্রেন ও নেদারল্যান্ডসে তিন মাস ধরে আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে ইউক্রেনের নৃশংস অপরাধী চক্রের ভয়ংকর কর্মকাণ্ড উদ্‌ঘাটন করেছি। বছরের পর বছর এই চক্র শত শত নারী-পুরুষকে ধরে এনে এসব দেশে দাস হিসেবে জোর করে কাজ করিয়েছে। গত শরৎকালে এই চক্র অবশ্য ভেঙে গেছে।

রোমানিয়া থেকে ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ৪০ জনকে বোহিমার স্পারজেল কুলটুর, বিএসকে নামে ডাচ মালিকানাধীন চেক রিপাবলিকের একটি কোম্পানি কাজের জন্য নিয়ে আসে। তাদের শিকার এই মানুষগুলোর কাউকেই মজুরি দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি যথাযথ খাবারও। তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সবাই বলেছেন, সেখান থেকে পালাতে পেরে তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন।

চেক এবং রোমানিয়ার পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে, ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিএসকে নামের কোম্পানির খামারে কমপক্ষে ৩০০ রোমানিয়ার নাগরিককে আটকে রেখে জোর করে কাজ করানো হয়। সম্প্রতি নতুন তদন্তে আবিষ্কৃত হয়েছে, বুলগেরিয়া, মলদোভা এবং ইউক্রেনের বাসিন্দারাও সেখানে বিনা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

চেক পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে প্রথম অবহিত হয় ২০০৭ সালে। তারপরও বিএসকের খামারে অভিযান চালাতে তাদের দুই বছর সময় লেগে যায়। সেই অভিযানে সেখানে বন্দি শ্রমিকেরা মুক্তি লাভ করেন এবং সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রটি ধ্বংস হয়। প্রতারিত সেই মানুষগুলোকে মোটা বেতন, খাবার আর বাসস্থানের লোভ দেখিয়ে নিয়োগ দিয়েছিল সেই চক্রের নেতাদের দালালেরা। সেই প্রতারিত মানুষদের বেশির ভাগই ভাসিল বেনসাকে শনাক্ত করেন চক্রের নেতা হিসেবে। বেনসা বিয়ার লগিং নামে একটি চেক নিয়োগ কোম্পানির মালিক। তার অধীনে থাকা বিভিন্ন গ্যাংয়ের সদস্যরাই এই মানুষদের শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে। পুলিশ বেনসাকে আটক করতে সমর্থ হয়। আমরা তার পক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি রাজি হননি।

বেনসার এই কোম্পানি বিএসকের শ্রমিক সরবরাহের কাজ করছিল। বিএসকের প্রধান নির্বাহী উইল তেউইন আমাদের বলেন, বেনসা গ্রেপ্তার হওয়ার আগে শ্রমিকদের এই অবস্থা সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না। তিনি বলেন, "বিএসকে এবং রুমানীয় শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি কোনো চুক্তি ছিল না। বেনসার কোম্পানির সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছিল।"

বিএসকে স্পেন ও ইতালি থেকে অ্যাসপারাগাস এবং অন্যান্য সবজি ব্রিটেন, জাপান এবং অন্য কয়েকটি দেশে সরবরাহ করে। তাদের পণ্য জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসের বড় বড় চেইনস্টোরে বিক্রি হয়। চেক রিপাবলিকের টেসকো নামের বিপণিবিতানগুলোতেও তাদের পণ্য সরবরাহ করা হয়।

মজুরি নেই, আছে নির্যাতন

কোরিনা রাহভিনুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় রোমানিয়ার দক্ষিণ রাহোভা অঞ্চলে গ্রামের বাড়ির সামনে। বাড়ি বলতে মাটি আর খড় দিয়ে তৈরি একটা ঘর। সেখানেই কোরিনার বসবাস তিন সন্তান নিয়ে। পাশেই তার শ্বশুরবাড়ি। কিছু অর্থ জোগাড় করার জন্য তিনি ২০০৮ সালের শরৎকালে চেক রিপাবলিকের অ্যাসপারাগাস খামারে কাজ করতে যান। সেখানে তার স্বামী এবং দেবরেরা আগে থেকেই কর্মরত ছিলেন। রোমানিয়াজুড়ে দেশের বাইরে কাজের জন্য শ্রমিক সংগ্রহের একটি সিন্ডিকেটের এক দালাল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে অবশ্য জানা যায়, সেই দালাল চক্রটি দক্ষিণ রোমানিয়ায় বেনসারের চালানো কার্যক্রমের অংশ।

বাসে করে কোরিনা অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে প্রথমে প্রাগে যান। সেখানে ইউক্রেনের কয়েকজন নাগরিক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে তাদের খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোরিনা সেই ভয়ংকর সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমি খামারে পৌঁছে স্বামী এবং তার ভাইদের দেখা পাই। তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাদেরকে কোনো খাবার দেওয়া হতো না এবং মারধর করা হতো। আমাকে রোববার ছুটির দিনেও কাজ করতে হতো। কাজ করতে না চাইলে কপালে জুটত হুমকি আর নির্যাতন।" তিনি আরও বলেন, "যে মাঠে আমরা কাজ করতে যেতাম, সেখানে শটগান হাতে কিছু ইউক্রেনীয় পাহারায় থাকত। কোনো শ্রমিক তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মজুরি দাবি করলে অথবা অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজের বিষয়ে মুখ খুললে তাকে মারধর করত তারা।"

প্রায় ৪০০ নারী-পুরুষ সেই খামারে দিনরাত কাজ করত। তারা গাদাগাদি করে একটা বড় ঘরে ঘুমাত। সেই খামারের পরিচালক কখনো তাদের সেখানকার কসাইখানা অথবা কোনো নির্মাণকাজে না পাঠালে তাদের মাঠের কাজই করতে হতো।

কোরিনার স্বামীর এক ভাই চাকরির চুক্তিতে স্বাক্ষর সময়ে ভেবেছিলেন, তাকে সত্যি সত্যি একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চেক ভাষায় লেখা সেই চুক্তিপত্র ছিল একটি গ্যারেজ ভাড়া নেওয়ার ছাড়পত্র। সেই ব্যক্তি তা পড়তেই পারেনি। ২০০৮ সালের এক রাতে কোরিন, তার স্বামী এবং ভাইয়েরা সেই খামার থেকে পালিয়ে চলে আসেন।

পঞ্চাশ বছর বয়সী কস্টিকা কিরিয়াকও আমাদের একই ধরনের গল্প শোনান। উল্টর রোমানিয়ার গরবেনেস্টি গ্রাম থেকে বিএসকের খামারে কাজের জন্য গিয়ে এই সময়ে শ্রমদাসে পরিণত হন। কয়েক মাস নিদারুণ কষ্টের ভেতর দিয়ে সেখানে বিনা মজুরিতে কাজ করার পর

তিনিও পালিয়ে আসেন। বিএসকের খামারের সেই নারকীয় পরিবেশে কিরিয়াকের সঙ্গে তার মেয়েও কাজ করত। ২০০৮ সালের মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তারা সেখানেই ছিলেন। পালিয়ে আসার রাতে তারা অন্ধকার পথ ধরে ছয় ঘণ্টায় দৌড়ে ৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন। কিরিয়াক বলেন, "ভয় আমাদের দৌড়াতে সাহায্য করেছিল। ওই তিন মাস কাজের জন্য আমি এবং আমার মেয়ে কোনো মজুরি পাইনি। আমাদের খেতে দেওয়া হতো রুটি আর সেদ্ধ আলুবোখারা। তাদের নিযুক্ত পাহারাদারেরা দ্রুত কাজ করার জন্য আমাদের প্রহার করত। আহত অবস্থায় রাতে আমরা ঘুমাতেও পারতাম না।"

কিরিয়াকের শঙ্কা ছিল মেয়েকে নিয়ে। ওই খামারের পরিচালক তার মেয়েকে এক চীনা পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে রাতে ঘুমানোর জন্য বাধ্য করত। তার কথা ছিল, কিরিয়াকের মেয়ের উচিত চীনা শ্রমিককে বিয়ে করা। তাতে ওই ব্যক্তি রোমানিয়ার নাগরিকত্ব এবং পাসপোর্ট পেয়ে যাবে। এই কাজের জন্য চীনা শ্রমিকটি খামারের পরিচালককে অর্থ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিরিয়াক এবং তার মেয়েকে অর্থের লোভ দেখিয়ে চেক রিপাবলিকে নিয়ে যায় তাদেরই এক আত্মীয়। সেই আত্মীয় তাদের আরেক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই ব্যক্তি পরে বেনসার অপরাধী চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হয়। কিরিয়াক পরে জানতে পারেন, দালালরা প্রাগে সরবরাহ করা প্রতি শ্রমিকের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ ইউরো পেত।

প্রাগে রোমানিয়ার একজন কূটনীতিক সেখানে শ্রমিকদের নিয়ে কী ঘটছে জানতে চাওয়ার পর বিএসকের খামারে আটকে পড়া কিছু শ্রমিক পালানোর সুযোগ পায়। রোমানিয়ার দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা ইউলিয়ান গর্গিউ আমাদের জানান, ২০০৭ সালের মার্চ মাসে ওই খামারে আটক থাকা একজন শ্রমিক দূতাবাসে ফোন করে। সেই শ্রমিক তার দুরবস্থার কথা তাদের জানায়। সে প্রাগের কাছাকাছি একটা খামারে বন্দি আছে এবং খামারের পাশেই একটা রং করা দেয়াল আছে– এটুকু তথ্য ছাড়া সে আর কিছু জানাতে পারেনি। দূতাবাসের পক্ষ থেকে তখন চেক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বন্দি শ্রমদাসদের সেখান থেকে পালানোর কৌশল শিখিয়ে দেয়। পুলিশের শেখানো কৌশল অবলম্বন করে খামার থেকে ৬৭ জন শ্রমিক পালাতে সক্ষম হয়। তবে তাদের পরিচয়পত্র ও টাকা সেখানেই রয়ে যায়। সেই ঘটনার পর থেকে দফায় দফায় শ্রমিকেরা পালিয়ে চলে আসতে থাকে রোমানিয়ার দূতাবাসে।

দেশটির পুলিশ ২০০৭ সালে এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ পেলেও চলতি বছরে এসে তারা সেই খামারে অভিযান চালাতে সক্ষম হয় এবং ৩৬ জন শ্রমিককে মুক্ত করে। বিদেশি শ্রমিকেরা আইনগত জটিলতার ভয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলত। ইউক্রেন ও মলদোভার শ্রমিকদের ইইউভুক্ত দেশে কাজ করার কোনো অধিকারই ছিল না এবং রোমানিয়ার শ্রমিকদের কাজ করার জন্য যথাযথ ছাড়পত্র ছিল না। রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মলদোভা ও ইউক্রেনের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষাকারী কর্মকর্তা ডেভিড রোডার চেক পুলিশের বিরুদ্ধে ধীরগতিতে কাজ করার অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, "এই চক্রের শিকার শ্রমিকেরা আমাদের যথেষ্ট তথ্য দিতে পারেনি। ফলে আমরাও এ ধরনের চক্রের প্রকৃত সদস্যদের আটক করতে পারিনি। এই শ্রমিকেরা চেক ভাষাও জানে না।"

রোমানিয়ার ন্যাশনাল এজেন্সি অ্যাগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন পারসনের (এএনআইটিপি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৭ সালের মধ্যে চেক রিপাবলিক রোমানিয়ার নাগরিকদের পাচার করে আনা এবং শ্রমদাসে পরিণত করার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশটি ২০০৬ সালে মানব পাচারের জন্য করা কালো তালিকায় দশম স্থান দখল করে। কিন্তু ২০০৭ সালে এএনআইটিপির প্রতিবেদনে দেখা যায়, চেক রিপাবলিকের নাম তৃতীয় স্থানে চলে এসেছে। কারণ, তত দিনে রোমানিয়া ইইউভুক্ত দেশের খাতায় নাম লিখিয়েছে এবং সে দেশের নাগরিক ইইউতে অবাধ চলাচলের সুবিধা লাভ করেছে।

ইউক্রেনের মাফিয়া নেতা

রোমানিয়ার 'ডাইরেক্টরেট ফর ইনভেস্টিগেটিং অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড টেররিজম' (ডিআইআইসিওটি) ২০০৭ সালের মার্চ মাস থেকে তাদের দেশে এ ধরনের দাস শ্রমিক সংগ্রহকারী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। তারা উত্তর ও দক্ষিণ রোমানিয়ায় দুটি চক্রের ওপর নজর রাখতে শুরু করে। এই দুটি চক্রের প্রধান হিসেবে বেন্টসার নাম উঠে আসে। ৩১ বছর বয়সী ইউক্রেনের নাগরিক বেন্টসার ডান হাত ছিল ৩৭ বছর বয়সী ভলদিমির দুবলেনিচ। তার আরেকজন সহযোগী মিখাইলো জাভাৎস্কি। এদের সবাইকে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাগ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মানব পাচার এবং সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়।

বেন্টসা বিয়ার লগিং সি জেড এসআরও নামে একটি ভুয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। এই কোম্পানির মাধ্যমেই সে চেক রিপাবলিকের অ্যাসপারাগাস চাষাবাদের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করত। এই কোম্পানির প্রধান শাখার সন্ধান পাওয়া যায়

মেলনিক শহরের ২৭২৩ স্পোর্টোভিনি স্ট্রিটে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ৯ তলায়। সেই কার্যালয়ে পাঁচজন নিবন্ধিত কর্মচারী ছিল। এখন অবশ্য ভবনটির ঢোকার মুখে একটি লেটারবক্সে হাতে লেখা কোম্পানির নামটাই পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ইউক্রেনের সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায়, বেন্টসা ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলের ক্রাইসোভো নামে একটি গ্রামের বাসিন্দা। তার অথবা ডাবলিনের নাম ইউক্রেনের পুলিশের খাতায় ছিল না। তাদের নামে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও নিবন্ধিত ছিল না।

ওই অঞ্চলে ক্রাইসোভো এবং আশপাশের ছোট ছোট গ্রামে চেক রেজিস্ট্রেশন প্লেটসহ গাড়ি চোখে পড়ে। এসব এলাকাতে চেক রিপাবলিকে চাকরির বিজ্ঞাপনও দেখা যায় প্রকাশ্যেই। বেন্টসার আত্মীয়স্বজন নিশ্চিত করেছে যে বেন্টসা চেক রিপাবলিকে শ্রমিক সরবরাহ করত। আমরা বিদেশে শ্রমিক সরবরাহকারী হিসেবে তার বাড়িতে উপস্থিত হই। বেন্টসার বাবা বারবারই আমাদের বলছিলেন, তার ছেলে নিরপরাধ। সে পূর্ব ইউক্রেনে কাজ করে।

উত্তর ও দক্ষিণের চক্র

রোমানিয়ার দক্ষিণ অংশে প্রাহোভা কাউন্টিতে এই প্রক্রিয়ার শিকার অন্তত ২০ জন আমাদের জানিয়েছেন, ২০০৮ সালে কিছু লোক তাদের এলাকায় এসে বুখারেস্ট এবং প্রাগে কাজ দেওয়ার জন্য বেকার মানুষজনের খোঁজ করে। ৩৮ বছর বয়সী গ্যাব্রিয়েল নিতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সে-ই ছিল দক্ষিণ অংশের চক্রের মূল নেতা। তার নামে দুটি কোম্পানি নিবন্ধিত ছিল। তার নামে আদালতে মামলা চললেও ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে ছাড়া পায়। তার আইনজীবী ইয়োনুত মাতেস্কু আমাদের বলেন, তার মক্কেল একটি চেক কোম্পানির হয়ে বাসচালকের কাজ করে। সে রোমানিয়া থেকে প্রাগে শ্রমিকদের বাসে পরিবহন করে। কারণ, সে চেক ভাষায় কথা বলতে পারে। তার ভাষায়, "মাত্র ৩৬ জন ভুক্তভোগীর জবানবন্দি আমার মক্কেলকে সাজা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।"

রোমানিয়ার সরকারি পক্ষের আইনজীবী দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় ৫০ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করে। তাদের মধ্যে ১৬ ও ১৭ বছর বয়সী কিশোরও ছিল।

রোমানিয়ার উত্তরাঞ্চলের বতোশান কাউন্টির অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকায় আমরা ১০ জন ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নিই। তারা আমাদের জানায়, লরেন্তিউ দ্রাঙ্গা নামের এক ব্যক্তি তাদেরকে কাজের জন্য নির্বাচিত করে। ৪৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তিই ছিল চক্রের উত্তরাঞ্চলের নেতা। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে পুলিশ তাকে বটোসানি শহর থেকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে ১২০ জন শ্রমিককে বেন্টসার কাছে সরবরাহ করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় যে আইনজীবীরা তার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা কেউ আর এখন সক্রিয় নন। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য সম্প্রতি মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সরকারি কৌঁসুলিপক্ষের হাতে থাকা অপরাধী চক্রের তালিকায় নার্দি আন্তায়েভের নামও রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের চক্রের সদস্য এই ব্যক্তি। ট্রান্সনিস্ট্রিয়ায় শ্রমিক পাচারকারী হিসেবে তার নাম সেখানকার ভুক্তভোগীরা উচ্চারণ করেছে। তারা জানান, এই ব্যক্তিই তাদের অ্যাসপারাগাস খামারে কাজ করার জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু তারা সেই জায়গা অথবা কোম্পানির নাম জানতেন না। ৫২ বছর বয়সী সাশা তোরিদকা আমাদের বলেন, এই আন্তায়েভ এবং মধ্য বয়সী নারী ওকসানা গলুবেভা মিলে নিজেরাই একটি দাস ব্যবসার চক্র খুলে বসেছিল। গলুবেভার ভাইও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং ভুক্তভোগীদের তার মাধ্যমে প্রথমে ওডেসা এবং পরে চেক রিপাবলিকে পাচার করা হয়।

আন্তায়েভ ও গলুবেভার নাম ট্রান্সনিস্ট্রিয়া এবং মলদোভার কর্তৃপক্ষের কাজে অজানা ছিল। আমরা এদের খোঁজে ইউক্রেনের শহর ওডেসাতে যাই। সেখানে আমরা গলুবেভার বড় ভাইকে খুঁজে বের করি। তার কাছে বোনের ব্যবসা সম্পর্কে জানতে চাইলে লোকটি আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন এবং গুলি করার হুমকি দেন।

কী ঘটেছে, আমরা কিছুই জানি না

মে মাসে আমরা যখন হোস্টিন ইউ ভোয়কোভিচে বিএসকের অ্যাসপারাগাসের খামার পরিদর্শন করি, তখন সেটা পরিত্যক্ত। এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। তারা ১২৯ হেক্টর জমিতে অ্যাসপারাগাসের চাষাবাদ করত। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি, পশুদের জন্য ঘাস অথবা ফসল রাখার জন্য কিছু শূন্য ঘর আর কয়েকটি ট্রাক্টর রয়েছে।

সেখানে একজন প্রহরীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তার কাছে মিখাল সারভেঙ্কার বিষয়ে জানতে চাইলে সে কিছুই বলতে পারেনি। সারভেঙ্কা বিএসকের একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং চেক রিপাবলিকের টেসকো নামক সুপারস্টোরে তাদের অ্যাসপারাগাস সরবরাহের বিষয়ে পত্রপত্রিকায় বহু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এই বিজ্ঞানী। ২০০৬ সালে চেক রিপাবলিকে একটি কৃষিবিষয়ক ওয়েবসাইটে তিনি জানান, বিএসকে খামারের প্রায় ২০০ শ্রমিকের সবাই বিদেশি নাগরিক। তাদের বেশির ভাগই এসেছে পূর্ব ইউরোপ থেকে। এই খামারের চাষাবাদের কাজ সমন্বয় করেন ডেনমার্কের বিশেষজ্ঞ। আমরা সারভেঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সেই প্রহরী কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানায়, তাকে পাওয়া যাবে না। তার কাছ থেকে সারভেঙ্কার ফোন নম্বরও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

এরপর আমাদের গন্তব্য ছিল হল্যান্ডের হেলডেনে বিএসকের মূল অভিভাবক প্রোসিন্টের প্রধান কার্যালয়ে। আমরা সেখানে গিয়ে প্রোসিন্টের কোনো সাইনবোর্ড দেখতে পাইনি। পরিবর্তে তেবোজা হোল্ডিং নামের অন্য একটি কোম্পানির নাম সেখানে চোখে পড়ে। তেবোজা এবং প্রোসিন্টের মূল মালিক আসলে উইল তিউওয়েন। এই দুটি কোম্পানি নির্বাহী সভাপতি ছিলেন তিনি। এই দুই কোম্পানি ছিল অ্যাসপারাগাসের বড় সরবরাহকারী। প্রেসিন্ট কোম্পানির আরেকজন নির্বাহী ছিলেন ৭০ বছর বয়সী ফার্নান্দো মোরা ফিগুয়েরা ডমেক। স্পেনের নাগরিক ডমেক কৃষিপণ্যের এক সাম্রাজ্যের মালিক। তার কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'গ্রুপো ক্যারিজিয়েলো ইনভেস্টমেন্ট', 'কম্পালিজো এগ্রিকোলা', 'ইনভেরসোরা ওয়াই কমেরসিয়াল এসএ' এবং 'এগ্রিকোলা কনাগ্রালসা এস.এল'। তার কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম স্পেন থেকে নেদারল্যান্ডস হয়ে ব্রিটেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

তেবোজার ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অ্যামস্টারডামে পাঁচ তারা হোটেলসহ বেশ কিছু নামি রেস্তোরাঁ তাদের পণ্যের গ্রাহক। ২০০৯ সালে এই কোম্পানি জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। তেবোজা ডাচ ফুটবল লিগে দুটি ফুটবল দলকে অর্থায়নও করে।

প্রোসিন্ট কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। তাদের প্রধান ব্যবসাই ছিল অ্যাসপারাগাস রপ্তানি। ২০০৫ সালে তারা ৮ লাখ ইউরো মূল্যের অ্যাসপারাগাস বিক্রি করে। আমরা হেলডেনে পৌঁছে তিউওয়েনকে না পেলেও তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে দেওয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রমিকেরা যাতে খামারে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারেন। এতে উৎপাদনও ভালো হয়।" তার কাছে আমরা বেন্টসা এবং দুবলেনিচের গ্রেপ্তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, এই দুই ব্যক্তি বিএসকের কার্যালয়ে এসে বিয়ার লগিং কোম্পানির সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে এই দুজনের সঙ্গে কখনোই তার সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের কোম্পানি শ্রমিকদের সঙ্গে কখনোই সরাসরি কোনো যোগাযোগ করে না। এখানেই বিয়ার লগিংই ছিল সূত্র। তিনি বলেন, "আমরা কখনোই সহযোগী কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাই না। তাদের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায় বহন করে ব্যবস্থাপকেরা।" তার বক্তব্য অনুযায়ী, বিয়ার লগিং কোম্পানিই শ্রমিকদের আবাসনের বন্দোবস্ত করত। তাদের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র ছিল চেক রিপালিকের নাগরিক এক ব্যবস্থাপক। তিউওয়েন চেক রিপাবলিকের দুই নাগরিকের গ্রেপ্তারের ঘটনা শুনে বলেন, "পুলিশ অভিযান চালানোর আগে এ বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আমরা তদন্তের স্বার্থে সব নথিপত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহ করেছি।"

লন্ডনে টেসকো সুপারমার্কেটের একজন মুখপত্র জানান, তারা কখনোই বিএসকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করেননি। তবে তিনি বলেন, "আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, অতীতে চেক রিপাবলিকে আমাদের দুজন সরবরাহকারী বিএসকের সঙ্গে বাণিজ্য করত। আমরা বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলছি।"

কিরিয়াকের মতো সাবেক শ্রমদাসেরা তাদের এই বিপর্যয়ের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পাননি। কিরিয়াক চেক রিপাবলিকে যাওয়ার জন্য তার পোষা ছাগলগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমি এখন জীবনটাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমি আর কখনোই বাড়ি ছেড়ে বিদেশে কাজ করতে যাব না।" কিরিয়াক আকাশে অদৃশ্য ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, "আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন আমি চাই আমার মেয়ে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি থেকে মুক্তি পাক। ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন।"

পরিশিষ্ট

আড্রিয়ান মোগস

একটি ঘটনার ব্যাপারে ২০০৭ সালে 'ন্যাশনাল এজেন্সি অ্যাগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন পারসন্স'-এর এক কর্মকর্তার সঙ্গে অফ দ্য রেকর্ড কথা বলার সময় এই স্টোরি করার পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার চোখে পড়ে, সেই কর্মকর্তার মাথার ওপর চেক রিপাবলিকে মানব পাচার বিষয়ে একটি কালোতালিকা ঝুলছে। আমি বেশ অবাক হই। কারণ, রোমানিয়া থেকে পাচার হওয়া মানুষদের শেষ ঠিকানা ইতালি, স্পেন ও জার্মানি বলেই আমি জানতাম। সেখানেই আমি দেখতে পাই, শ্রমদাস পাচার পরিসংখ্যানের দিক থেকে যৌন ব্যবসার চেয়েও এগিয়ে আছে। গবেষণা পর্যায়ে আমার সহকর্মীরা অন্য কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও আমি এই স্টোরি করার ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকি। এই স্টোরির প্রতিক্রিয়াও হয়েছে অনেক বেশি।

এ ধরনের একটি স্টোরি করার ক্ষেত্রে অর্থ একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠে। ২০০৭ সালে আমি সাংবাদিকতাবিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে তারা প্রত্যাখ্যান করে। ২০০৯ সালে আমি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সহায়তা পেয়ে যাই। অর্থ জোগাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তখন আমি স্টোরির জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। এই স্টোরিতে আমার সঙ্গে গবেষণার কাজে যারা ছিলেন, তারা আমাদের গণমাধ্যম ইনস্টিটিউশনে নিয়মিত কাজের ফাঁকেই গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। এ কারণেই স্টোরির কাজ শেষ করতে আমাদের ছয় মাস সময় লেগেছে। তবে রোমানিয়ায় আমাদের সম্পাদক কাজ নিয়ে আমাদের ওপর কোনো চাপ দেননি।

আমি পুরো কাজটার একটা পরিকল্পনা করে ফেলি এবং পুরো দলের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দিই। প্রতি পাঁচজন সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ বরাদ্দ করা হয়। প্রতিবার অনুসন্ধান শেষে যে উপাত্ত সংগৃহীত হতো, তা আমরা একটি ফাইলে জমা করতাম। প্রতিটি সাক্ষাৎকারের জন্য পৃথক ফাইলে তারিখ এবং জায়গার নাম উল্লেখ করা থাকত। কাজ করার সময় যখনই সমস্যা তৈরি হতো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতাম। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, একটি বড় সুপারমার্কেট কোম্পানির নাম অনুসন্ধানে উঠে আসার পর আমি তাদের ই-মেইল পাঠিয়ে প্রতিক্রিয়া জানার অনুমতি নিতাম।

আমরা পাচারের সঙ্গে অভিজ্ঞ লোকদের বৈধ ব্যবসার সন্ধান করছিলাম। আর তাতে করে অনুসন্ধানে কোম্পানির রেকর্ডপত্র, তাদের গতিপথ, অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং অভিযুক্ত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। আমরা বেলারুশ, ট্রান্সনিস্ট্রিয়া অথবা জর্জিয়া থেকে একই ধরনের নথিপত্র সংগ্রহ করতে চেয়েও সব সময় তা পারিনি। রোমানিয়ায় ৫৪৪/২০০১ নামে একটি আইন আছে, যা তথ্যের অবাধ অধিকারকে নিশ্চিত করে। তবে এই আইনের বলে চলমান বিচারিক প্রক্রিয়ার নথিপত্র পাওয়া যায় না। তবে আমরা স্টোরিতে দাপ্তরিক উপাত্ত এবং গ্রাফিকস ব্যবহার করেছি, যা ভালো ফল দিয়েছে।

আমাদের একজন সহকর্মীকে শটগান হাতে হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল অপরাধীরা। ইউক্রেনে সংঘবদ্ধ অপরাধী দলকে সবাই ভয় পেয়ে চলে। তবে আমাদের ভাগ্য যে সে সমস্যাও মোকাবিলা করা গিয়েছিল। আমাদের জন্য আরেকটি ভালো দিক ছিল ভুক্তভোগীদের কথা বলার বিষয়টি। অনেকে তখনো ভয়ে গুটিয়ে ছিল; কারণ, অপরাধীদের আইনজীবীরা তাদের হুমকি দিচ্ছিল। একজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং আইনজীবী আমাদেরকে তাদের তদন্তের কিছু তথ্য জানিয়ে দিয়ে সহায়তা করেছিলেন ভীষণভাবে।

আপনারা কখনোই কোনো অপরাধী বা বিশাল শিল্পমালিককে কোনো প্রশ্ন করতে ভয় বা দ্বিধা করবেন না। আপনার গবেষণালব্ধ সব তথ্য স্টোরি প্রকাশের পরেও নিজের কাছে রাখুন। ভবিষ্যতে এসব তথ্য আপনাকে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, অসাধু ব্যক্তি আর তাদের কোম্পানির বিষয়ে যতটা সম্ভব অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। কারণ, আপনি জানেন না, হঠাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে চলে আসবে।

যেহেতু আমরা এই কাজে প্রত্যেকে আলাদাভাবে কাজ করেছিলাম, তাই আমাদের স্টোরির প্রথম খসড়ার পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০। সেটি অনেকগুলো স্টোরির একটি সমন্বিত আকার নিয়েছিল। আমি সহকর্মীদের মূল ভাবনাগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসি এবং বাকি তথ্য হাতে রেখে দিই। আমি আমার সব স্টোরিতেই এই কৌশল ব্যবহার করি। এতে অনাবশ্যক তথ্যের ভারে স্টোরি কখনো নিমজ্জিত হয় না।

আমরা আমাদের স্টোরি রিজিওনাল নেটওয়ার্ক অব জার্নালিস্টস'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করি। আমাদের সেখানে সহায়তা করে অর্থায়নকারী সংগঠনগুলো। স্টোরিটি নিয়ে আমি আংশিকভাবে সন্তুষ্ট হলেও তা প্রকাশের পর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু রোমানিয়ার পুলিশ আমাদের স্টোরির ওপর নির্ভর করে অন্যান্য তদন্ত শুরু করে এবং বিচারাধীন দুটি মামলার রায় ঘোষণা হয়। আমার মনে হয়, আমরা যদি আরও আগে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে আরও ভালো ফল এবং পুরো চক্রটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে আনতে পারতাম।

৩.

আমাদের ভেতরের তালেবান

সেই সব "সমান্তরাল সংসদে" খুন, ধর্ষণ আর নির্বাসন দণ্ড নিত্যকার বিষয়

নেহা দীক্ষিত

ভূমিকা

বেশির ভাগ অনুসন্ধানী স্টোরির একটি অন্তর্নিহিত কৌশল থাকে। নরথ্রপ ফ্রাইয়ের ভাষায়, সেখানে প্রেমমূলক বিবরণ থাকে, কিন্তু তা একটি প্রেমের গল্প হয়ে ওঠে না কখনোই। সেসব স্টোরি আপাতশান্ত এবং উজ্জ্বল পৃথিবীর ছবির আড়াল থেকে হিংসা, দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের ছবি তুলে আনে। নেহা দীক্ষিত এমন এক যাত্রার কাহিনি উন্মোচন করেছেন, যেখানে গোষ্ঠীর আইন সংবিধানের চেয়ে শক্তিশালী। বেশির ভাগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, তা হচ্ছে নিজেরই মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এক প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে। প্রতিক্রিয়াটি তৈরি হয় এমন একদল মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে, যারা এই পৃথিবীটাকে বিপন্ন করে তুলতে চায়। এই ক্ষেত্রে বিপদটা মানসিক ও শারীরিক– উভয় ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আর এ কারণেই তাকে ছদ্মপরিচয় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। প্রেমমূলক বিবরণের মতো দীক্ষিত তার লেখায় একবার নরকে প্রবেশ করে আবার বের হয়ে এসেছেন। প্রেমমূলক বর্ণনায় সাধারণত স্থিতিশীল অবস্থা পুনঃস্থাপিত হয় এবং পৃথিবী আরেকবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু সাংবাদিকেরা কথাশিল্পীদের মতো নন। তারা তাদের কাহিনিতে মধুর সমাপ্তি টানতে পারেন না। দীক্ষিত তার স্টোরিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আলবার্ট লন্ড্রেস যেমন তার স্টোরির অন্তিমে লিখেছিলেন, "আমি শেষ করলাম। এবার সরকারকে শুরু করতে হবে।"

প্রথম প্রকাশ : তেহেলকা, ১৫ আগস্ট, ২০০৯

আমাদের রাজধানী থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এমন এক শক্তিশালী গোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়, যা সদম্ভে আমাদের দেশের সংবিধান ও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চলেছে। এই গোষ্ঠী ভালোবেসে বিয়ে করার অপরাধে এক দম্পতির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, তাদের বিধান অমান্য করায় পিতা-মাতার কাছ থেকে সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার অপরাধে সন্তানদের মায়েদের শাস্তি হিসেবে গণধর্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। নারীরা কেবল ছেলেসন্তানের মা হতে পারবে, এমন বিধানও এই গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষ এমনিতেই স্ববিরোধিতার দেশ। তার মধ্যে আরেকটি স্ববিরোধিতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জি ৮ সম্মেলনে গিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছেন, অথচ আমরা লক্ষই করছি না রাজধানীর খুব কাছে অন্য একটি তালেবানি গোষ্ঠী অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২৩ জুলাই জি ৮ সম্মেলনে ঘোষণা দেন, ভারত তালেবান আগ্রাসন প্রতিরোধে সর্বাত্মক সহায়তা দেবে। আর সেই একই দিনে হরিয়ানা রাজ্যের জিন্দ জেলার সর্ব খাপ পঞ্চায়েতের নির্দেশে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ ছিল, তার স্ত্রী ছিল একই গোত্রের। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে, একই গোত্রে বিয়ে হওয়াটা অনাচার। স্থানীয় কয়েকটি এনজিও সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, একই গোত্রে বিয়ে করার অপরাধে খাপ পঞ্চায়েত গত ছয় মাসে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া এবং উগ্রবাদী সর্ব খাপ পঞ্চায়েত গোত্রভিত্তিক আরও কয়েকটি পঞ্চায়েতেরই একটি অংশ। তারা নিজেদেরকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে এবং জাতীয় সংসদের মতো আচরণ করে।

ভারতে এই খাপ পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তারা তখন থেকেই দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে থেকে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুরক্ষার প্রয়োজনে তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীও ছিল। খাপ আসলে একটি এলাকার একক। ঐতিহ্যগতভাবে ৮৪টি গ্রাম এবং একই গোত্রের মানুষ নিয়ে খাপ গঠিত হয়। হরিয়ানা রাজ্যে সর্ব খাপের অধীনে রয়েছে ৩০০টি খাপ। প্রকৃতপক্ষে তারা হরিয়ানা, পাঞ্জাব, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের ২৫ হাজার গ্রামের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

বিগত পাঁচ বছরে এই খাপ পঞ্চায়েত সাংবিধানিক আওতাবহির্ভূত একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিকশিত হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নির্দেশ জারি করে চলেছে। খাপ পঞ্চায়েত খুন, ধর্ষণ, মানব পাচার, তাদের নির্যাতনের শিকার মানুষদের সম্পত্তি দখল এবং খেয়ালখুশি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো কর্মকাণ্ডের জন্যই সুপরিচিত। গোষ্ঠীর সম্মান এবং গৌরব সমুন্নত রাখার ছদ্মাবরণে তারা এসব কাজ করে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাপের ইচ্ছার সামনে মাথা নত করে।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

মিশার এক হাতে ধরা ছিল হাইকোর্টের আদেশ, অন্য হাতে তিনি আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনারা সবাই নপুংসক। আপনারা তাদের কিছুই করতে পারবেন না; তারা আপনাকেও মেরে ফেলবে। তাদের আইন মেনে আমাদের বাঁচতে এবং মরতে হবে।" তার ২৬ বছর বয়সী সন্তান বেদ পাল পেশায় একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। এ বছরের মার্চ মাসে বেদ পাল তাদের ইচ্ছার বাইরে ২২ বছর বয়সী সোনিয়াকে বিয়ে করে পালিয়ে গেছে। সোনিয়ার গ্রামের নাম সিংওয়ালা। তাদের গ্রাম বানাওয়ালা খাপের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা এই খবর শোনার পর এক আদেশে সেই বিয়েকে অপবিত্র ঘোষণা করে দেয়। তাদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু বর-কনে একই গোত্রের এবং তাদের মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক আছে, তাই বিয়েটা বৈধ নয়। তারা অনাচার করেছে এবং পুরো গোষ্ঠী অপমানিত হয়েছে। তাই খাপ তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্য আদেশ দেয়।

সেই আদেশ জারি হবার দুই মাসের মাথায় অর্থাৎ মে মাসের ২২ তারিখ তারা ধরা পড়ে এবং তার স্ত্রীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বেদ পাল ন্যায়বিচারের জন্য সোজা চলে যায় হরিয়ানা হাইকোর্টে। কোর্ট তার সুরক্ষার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। ২৩ জুলাই সকাল ৯টায় হাইকোর্টের ওয়ারেন্ট অফিসার বলবন্ত সিং পুলিশের একটি ছোট দল নিয়ে বেদ পালের মাতাউর গ্রামের বাড়িতে আসে। সেখান থেকে তারা বেদ পালকে নিয়ে সিংওয়ালা গ্রামের দিকে যাত্রা করে, যেখাসে সোনিয়াকে তার অভিভাবকেরা জোর করে আটকে রেখেছে। কিন্তু সেই গ্রামে পৌঁছামাত্রই বেদ পাল আক্রান্ত হন। তাকে ধরে টানতে টানতে সোনিয়ার বাড়ির বারান্দায় নিয়ে ফেলা হয় এবং তার জামাকাপড় খুলে ফেলা হয়। সেখানে তাকে বেধড়ক পেটানো হয় এবং ধারালো কাস্তে দিয়ে গলায় ও কাঁধে আঘাত করা হয়। বিস্ময়করভাবে ওই ঘটনা ঘটার সময় ১৫ জন পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বেদ পালের মা বলেন, "আমার ছেলের শরীরের একটি হাড়ও অক্ষত ছিল না। সে মারা যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা ওই প্রাণহীন শরীরে আঘাত করতেই থাকে।" বেদ পালের গ্রাম সিংওয়ালা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ১৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর তার পরিবারের লোকেরা ঘটনাটা জানতে পারে। তাদেরকে বেদ পালের পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের কপিও দেওয়া হয়নি। ওই ঘটনার জন্য বলবন্ত সিংকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ঘটনার সময় থেকে সোনিয়াও উধাও হয়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তার এক বন্ধু জানান, সোনিয়াকে তার পরিবারের লোকেরা ইট দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। সোনিয়ার কাকা সুরৎ সিং জানান, সোনিয়াকে আবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে নতুন সংসারে সুখে আছে। তার সম্পর্কে অন্যদের মুখ বন্ধ করার জন্যই কাজটা করা হয়েছে। সোনিয়াকে তারা ভয়ও দেখাতে চেয়েছিল।

হরিয়ানা রাজ্যের কার্নাল জেলার বাল্লা গ্রামের ওম প্রকাশ এবং তার নয়জন সঙ্গী গত বছর থেকে জেলে আছেন। ২০০৮ সালের ৯ মে ওম প্রকাশ এবং অন্যরা তার ২৩ বছর বয়সী গর্ভবতী মেয়ে সুনীতা এবং তার স্বামী জসবীরকে হাত-পা বেঁধে ঘর থেকে বের করে এনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। তারপর তাদের ওপর দিয়ে ট্রাক্টর চালিয়ে দেওয়া হয়। পরে দুজনের প্রাণহীন শরীর সুনীতার বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অন্য তরুণ-তরুণীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে। ওম প্রকাশের স্ত্রী কমলের মন্তব্য ছিল, "এ রকম সন্তানকে এ ছাড়া আর কী করা যেত?"

সুনীতা ও জসবীর ছিলেন একই গোত্রের সদস্য। কালীরমন খাপ এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই খাপের একজন সদস্য জগৎ সিং তেহেলকাকে বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, যারা একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে করে, তারা জারজ সন্তান। বেরাদরি বা গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষার জন্য ভিন্নমতাবলম্বীদের খুন করাটাই রীতি।" এই খাপের আরেক সদস্য জয় সিংয়ের মত হচ্ছে, "গ্রামের মানুষরা এই খুনের ঘটনাকে

মন্দের ওপর ভালোর বিজয় বলেই দেখে। এ ধরনের সন্তানের পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে নিঃশব্দে হত্যা করা। গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য এর চাইতে ভালো সুযোগ আর নেই।"

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তার জন্যই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। একটি বর্বর এবং মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা গোষ্ঠীগত সম্মান রক্ষার ধুয়া তুলে খুন এবং গণপিটুনিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শৈথিল্যের কারণে। এদের সামনে সংবিধান, আইন, প্রশাসন– সবাই অসহায়। খুনের মামলার একজন সাক্ষী জসবীরের বোন আদালতকে সব জানাতে চেয়েছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন তেহেলকাকে জানান, "খাপের পক্ষ থেকে জসবীরের পরিবারকে বলা হয়, তারা যদি মামলা প্রত্যাহার না করে, তাহলে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের একঘরে করে দেওয়া হবে এবং গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।" এই মামলার অভিযুক্তরা শিগগির ছাড়া পেয়ে যাবে এবং আরেকবার বর্বরতা স্থানীয় মানুষের সমর্থন লাভ করবে। বানাওয়ালা খাপের আরেকজন সক্রিয় কর্মী অজিত সিং বলেন, "গোষ্ঠীর জন্য খাপ জীবনধারার কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। এখানে প্রেমের বিয়ের কোনো অনুমতি নেই। আমাদের গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠরা এসব আইন প্রয়োগ করে গেছেন, আমরাও একই পথে চলব।"

গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে, খাপের কাছ থেকে খুনের নির্দেশ আসাটা খুবই জানা একটি বিষয়। এ ধরনের খুনের ঘটনা পুলিশ অথবা গণমাধ্যমের কাছে চেপে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, সামাজিকভাবে বর্জনের শিকার হওয়ার ভয়।

'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' (এনসিআরবি) এ ধরনের তথাকথিত সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড নথিবদ্ধ করে না। তাদের কাছে খুনের কোনো পরিসংখ্যানও নেই। খাপ নির্দেশিত এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান না থাকায় বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না।

পরিসংখ্যান না থাকার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, খাপ পঞ্চায়েতের শাসনকাঠামোতে ভ্রাতৃত্ববোধ। গ্রাম ও পঞ্চায়েতের সম্মান রক্ষার জন্য তাদের নির্দেশ এবং তা বাস্তবায়নের বিষয়গুলো গোপন রাখা হয়। খুব কম ঘটনাই থানায় এজাহারভুক্ত হয়।

নারী বিলোপ

নারীবিদ্বেষীরা সাধারণত নারীদের কর্মকাণ্ড নিজেদের সুবিধার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য যুক্তির আড়াল নেয়। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা আর পশ্চাৎমুখী ভাবনা নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত হরিয়ানা রাজ্যের লৈঙ্গিক অনুপাত কম রাখার বিষয়ে বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে লৈঙ্গিক অনুপাত অন্য রাজ্যের তুলনায় সর্বনিম্ন। খাপ পঞ্চায়েত সব সময় বংশধর হিসেবে পুত্রসন্তানকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ২০০৪ সালে তেভাতিয়া খাপ দুলাইপুরে একটি সম্পত্তি বিরোধের মীমাংসায় বসে। সেখানে তারা আদেশ জারি করে যে পরিবারে কমপক্ষে দুটি পুত্রসন্তান থাকবে না, তারা কোনো ধরনের সম্পত্তি বিরোধ বিষয়ে খাপের কাছে মীমাংসার জন্য উপস্থিত হতে পারবে না। তাদের মতে, সেই পরিবারগুলো হতভাগ্য, যারা পুত্রসন্তানের মাধ্যমে পিতৃপরিচয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই কন্যাসন্তানদের অর্জন কম হওয়াই উচিত।

এই আদেশের প্রতিক্রিয়া হলো ভয়াবহ। পরিবারগুলো পুত্রসন্তান লাভের জন্য সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিল (কন্যাসন্তানদের খুন করা)। 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স' (এআইআইএমএস)-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, তেভাতিয়া খাপের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরিদাবাদের বল্লভগড় অংশের ২৮টি গ্রামে লৈঙ্গিক ভারসাম্য নেই বললেই চলে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্তানের লৈঙ্গিক পরিচয় নিরূপণের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা এবং কন্যাসন্তানের ভ্রূণ নষ্ট করার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সন্তানের আগাম লৈঙ্গিক পরিচয় নিরূপণ গোটা ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হরিয়ানা রাজ্যের আদালত সন্তানের আগাম লৈঙ্গিক পরিচয় নির্ধারণ পরীক্ষা চালানোর দায়ে আটক কিছু চিকিৎসককে খালাস দিতে বাধ্য হয়।

বল্লভগড় এআইআইএমএস-এর গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ২০০৬ সাল থেকে কর্মরত একজন চিকিৎসক বলেন, "এই প্রতিবেদনে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, যেসব পরিবারে পুত্রসন্তান নেই, সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান হিসেবে কন্যাসন্তান আর জন্ম নিচ্ছে না। এ ধরনের সমস্যা সামাজিক হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়।"

তেভাতিয়া খাপ ২০০৪ সালে লৈঙ্গিক অনুপাতের সূচক চমকে ওঠার মতো হ্রাস পাওয়ার একটি ব্যাখ্যা দেয়। ওই খাপের সদস্য কান্তা সিং এক কন্যাসন্তান ও তিন পুত্রসন্তানের পিতা। তাদের মধ্যে কন্যাই বড়। তিনি বলেন, "পুত্রসন্তানেরা পুরুষের জন্য মূল্যবান সম্পদ। তারা

আমার নামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমার খামারকে আরও বড় করবে। এই অর্থে কন্যাসন্তানের বিয়ের যৌতুক দেওয়া হবে।" কন্যাসন্তানের সংখ্যা কমে গেলে তার ছেলেরা বিয়ের পাত্রী কোথায় পাবে এমন প্রশ্নে কান্তা সিং ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, "তারা প্রচুর আয়-রোজগার করে। এ নিয়ে তাদের ভাবতে হবে না।" ভারতের হরিয়ানা রাজ্য বৃহৎ 'পাত্রী বাজার'-এর জন্য কুখ্যাত। সেখানে পাচার হয়ে আসা নারীদের বিক্রি করা হয় বিয়ের জন্য। পরবর্তী জীবনে তারা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। কান্তা সিং হয়তো সেই বাজারের ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

কন্যাশিশু হত্যার মধ্য দিয়েই শুধু খাপের নারীবিদ্বেষী চরিত্র প্রকাশিত নয়। তারা পুরো একটি পরিবারকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ধর্ষণের মতো প্রাচীন কৌশলকেও বেছে নেয়। ২০০৪ সালে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের ভবানীপুর গ্রামের ২০ বছর বয়সী চেতন পিঙ্কিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। পিঙ্কি ছিল ওই গ্রামের প্রভাবশালী যাদব পরিবারের সন্তান। চেতন ছিল নরসুন্দর গোত্রের। সেই ঘটনার বিচার করতে গিয়ে তেভাতিয়া খাপ আদেশ দেয়, চেতন ও পিঙ্কিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত যাদব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা চেতনের মা সিয়া দুলারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করবে। চেতন যাদব পরিবারকে অসম্মান করায় এই শাস্তির আদেশ দেয় তারা। চেতনের কাকা রাজনারায়ণ বলেন, "তারা শুধু দুলারীকে ধর্ষণ করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা সকল প্রমাণ নষ্ট করতে তাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারে। পুলিশ সব জানার পরেও কিছুই করেনি।" সেখানকার কিছু সক্রিয় সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপে অপরাধীদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও পরে তারা জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়।

নিষিদ্ধ নাচ ও ক্রিকেট খেলা

আফগানিস্তানের তালেবানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে রুহাল খাপ রোহতাকে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে ডিজে নাচ এবং গান বাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কারণ হিসেবে গৃহপালিত প্রাণীদের সমস্যার কথা বলা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত কারণ হচ্ছে, নাচের আসরে নারীদের প্রবেশ বন্ধ করা। দ্রুত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে আরও তিনটি খাপ। ফলে রোহতাকের প্রায় ৮৩টি গ্রামে বন্ধ হয়ে যায় বিয়েবাড়িতে নাচ-গানের আনন্দ। ওই পঞ্চায়েতের সদস্য পঙ্কজ রুহাল বলেন, "তরুণ-তরুণীরা মদ্যপান করে উচ্চ স্বরে গান বাজিয়ে নাচে। এতে আমাদের গরুরা রাতে ঘুমাতে পারে না। ফলে পরদিন সকালে তাদের দুধ দোয়ানোতে সমস্যা হয়। তা ছাড়া যে নারীদের ঘরে থাকার কথা, তারা প্রকাশ্যে এসে নাচ-গান করবে, এটা আমাদের ঐতিহ্য নয়।"

তালেবানরা ২০০১ সালের মে মাসে ঘোষণা করে, মুসলমান দেশগুলোতে ক্রিকেট খেলা বন্ধ করা উচিত। এই ঘোষণার ছয় বছর পর ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে দাদান খাপের প্রধান তেওয়া সিং ঝিন্দ জেলার ২৮টি গ্রামে ক্রিকেট খেলা এবং টেলিভিশনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা নিষিদ্ধ করার আদেশ দেন। ওই খাপের সাধারণ সম্পাদক যোগী রাম বলেন, "ক্রিকেট খেলা তরুণ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের কাবাডি, খো খো এবং কুস্তি খেলতে বলা। ক্রিকেট আসলে কোনো খেলাই নয়।" তারা ঘোষণা দেয়, এই আদেশ অমান্য করলে সাত পুরুষ ধরে জরিমানার অর্থ গুনতে হবে। একটি অসমর্থিত সূত্র জানায়, কারনাল জেলার কাছে একটি খাপের পক্ষ থেকে টেলিভিশন ও রেডিওর ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

সহজ উপার্জনের পথ

একই গোত্রে বিয়ে করার কারণে খুন এই ঐতিহ্যের রক্ষকদের কাছে খুব সাধারণ বিষয়। তারা রক্ষাকর্তার ভূমিকাকে লাভজনক করে তোলার জন্যও নানান ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হরিয়ানা রাজ্যের কারনাল জেলার কাটলেহরি গ্রামে পবন ও কবিতা দম্পতি আসে। পরের দিন কবিতা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। সন্তান জন্মের ১০ দিন পর বোম্বাক খাপের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, যেহেতু এই দম্পতির সমগোত্রীয় বিয়ে হয়েছে, তাই তাদের সন্তানটি অবৈধ। এই সন্তান তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। কবিতার বোন উমা জানায়, খাপের প্রতিনিধিরা তাদের কাছ থেকে জোর করে বাচ্চা ছিনিয়ে নেয়। পঞ্চায়েতের বিচার সভায় আদেশ দেওয়া হয়, কবিতাকে তার স্বামীর হাতে রাখি পরিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা ভাইবোন হয়ে যায়। কবিতা এই আদেশ না মানা পর্যন্ত তাকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। খাপের পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়, বাচ্চাটিকে তারা এক নিঃসন্তান মায়ের কোলে তুলে দিয়েছে, কিন্তু পবনের মায়ের ভাষ্য হচ্ছে, তারা ৫০ হাজার রুপির বিনিময়ে কবিতার সন্তানকে ওই দম্পতির কাছে বিক্রি করে দেয়। অনেক অনুনয় করার পর খাপ ৬৫ হাজার রুপির বিনিময়ে সন্তানটি আবার ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। এই দম্পতি এখন মুম্বাইতে বসবাস করছে। তারা আর কোনো দিন নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে না।

খাপ সদস্যরা তাদের সম্মানকে সব সময় বিশাল গুরুত্ব দিলেও তারা চোখের পলকে মূল্যবান সামগ্রী সম্মানের বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারে। এবারও ঘটনাস্থল সেই হরিয়ানা রাজ্যের ঝাঝর জেলার ধারানা গ্রাম। ওই গ্রামের ২২ বছর বয়সী রবীন্দ্র এবং তার ১৫ সদস্যের পরিবারকে খাপের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় এবং গ্রামছাড়া হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। তাদের অপরাধ? রবীন্দ্র গেহলাওয়াত গোত্রের এবং সে বিয়ে করে কাদিয়ান গোত্রের শিল্পাকে। সেখানেও কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু খাপের নেতারা আবিষ্কার করেন, রবীন্দ্রের পরিবার কাদিয়ান গোত্রের গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। তাই তাদের বিয়েটা অকার্যকর। কাদিয়ান খাপের নেতা চত্তর প্রধান রবীন্দ্রের পরিবারকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম থেকে চলে যেতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদের হত্যা করারও হুমকি দেওয়া হয়। রবীন্দ্রের ৯০ বছর বয়সী মাতামহ বিরনা তেহেলকাকে বলেন, "এই জমিতে আমি দিনরাত পরিশ্রম করেছি। এখন আমি কোথায় যাব?" রবীন্দ্রের আরেক দাদি কমল বলেন, "তারা রবীন্দ্র আর শিল্পাকে বহিষ্কার করতে পারত। কিন্তু সবাইকে কেন চলে যেতে বলল?" শেষে পুলিশের সহায়তাও না পেয়ে রবীন্দ্রের পরিবারকে ওই গ্রাম ত্যাগ করতে হয়। তারা চলে যাওয়ার পর তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পাথর ছুড়ে গবাদিপশুগুলোকে আক্রমণ করা হয়।

তেহেলকা প্রতিনিধি যখন শেষবারের মতো এই পরিবারের দেখা পায়, তারা তখন রোহতাক জেলার জুগনা গ্রামের দিকে যাচ্ছে। পুলিশ এই ঘটনায় কোনো সমস্যা খুঁজে পায়নি। বেরি থানার পুলিশ কর্মকর্তা পুরণ সিং বলেন, "তারা পাশের গ্রামে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।" এই পরিবারটির ৫৩ একর জমি দেখভালের দায়িত্ব চলে যায় খাপের হাতে। সেখানকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান জয়বীরও এই ঘটনায় পরিবারটির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তার বক্তব্য হচ্ছে, "সমাজ যদি তাদের বহিষ্কার করে এবং তাদের সম্পত্তি আটক করার নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাহলে আমার কিছু করার নেই। কারণ, আমি সমাজ নিয়ে বসবাস করি। ওই পরিবারকে নির্দেশ মেনে চলতে হবে।"

বহিষ্কৃত পরিবারের সম্পদের কী হবে– এই প্রশ্নের জবাবে 'অখিল ভারতীয় জাত মহাসভা'-এর সভাপতি পরমজিৎ বানাওয়ালা বলেন, "তাদের অর্থসম্পদ মন্দির এবং নতুন গোশালায় দান করে দেওয়া হবে।" এই অর্থ কাদের পকেটে ঢুকবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "অবশ্যই খাপের সদস্যদের পকেটে।"

খাপের রাজনৈতিক প্রভাব নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা তখন তাদের পছন্দের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন এবং সবাই সেই প্রার্থীকেই ভোট দেয়। এ বছরের লোকসভা নির্বাচনের সময় ঝিন্দ নারওয়ানা জেলার ৪৬টি খাপ সম্মিলিতভাবে হিন্দু বিবাহ আইন প্রত্যাখ্যান করে। সেখানে প্রচার চালাতে আসা রাজনৈতিক নেতাদের তারা একই গোত্র এবং একই গ্রামে বিয়ে নিষিদ্ধ করে নতুন আইন করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করে। খাপের শক্তি এবং প্রভাব বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন বেদ পালকে মারা হয়েছিল, তখন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুদাও হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি। তিনি তখন বলেছিলেন, "এটা সামাজিক বিষয়। সমাজেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।"

খুন এবং বিভিন্ন আদেশের সঙ্গে খাপের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোনো একটি রাজনৈতিক দল পদক্ষেপ নেয়নি। আসান্ধে একজন সক্রিয় সমাজকর্মী রাজ সিং চৌধুরী বলেন, "এ ধরনের ঘটনায় পুলিশকে এগিয়ে আসার কথা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ, তারাও খাপ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে।" আর এ ধরনের মানসিকতার কারণে খাপের নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধেনি। পঞ্চায়েত রাজের সাবেক মন্ত্রী মনি শঙ্কর আইয়ার বলেন, খাপ অবৈধ সংগঠন। এরা নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর নেতা সেজে বসে আছে এবং কালের যাত্রায় এ ধরনের কাঠামোগুলো শক্তিও অর্জন করেছে। এদের মুখোমুখি মোকাবিলা করা কঠিন হলেও এ ধরনের কাঠামোগুলোকে বাতিল করা উচিত।" ২৮ জুলাই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে সম্মান রক্ষার্থে খুন বিষয়ে বলেন, "লজ্জায় আমাদের মাথা নত করা উচিত।"

রণবীর সিং একজন সমাজবিজ্ঞানী। দীর্ঘদিন ধরে হরিয়ানায় কাজ করেছেন তিনি। সেখানে খাপের এই প্রভাব কেন তৈরি হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তিনি। গবেষণাপত্রে তিনি বলেন, "জাঠ নামক গোষ্ঠীর মানুষ প্রান্তিক চাষি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুধু যে তাদের এড়িয়ে গেছে, তা-ই নয়, এ প্রক্রিয়ায় তারা অনেক বেশি উপেক্ষিতও হয়েছেন। আর এ কারণেই তারা তাদের ক্ষুদ্র জমির মালিকানা নিয়ে সবুজ বিপ্লবের সুবিধা নিতে পারেননি। তারা লেখাপড়ার অভাবে কোনো ধরনের আধুনিক পেশা যেমন বেছে নিতে পারেননি, তেমনি জাত্যভিমানের কারণে অন্য যেকোনো পেশা গ্রহণ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। উদারনীতি, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে তাদের ভাগ্য আরও জটিল অবস্থানে চলে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়ে মোহমুক্তি ঘটায়ও এই দরিদ্র কৃষকেরা এগিয়ে চলার পরিবর্তে শুধু পেছনে দৃষ্টিপাত করেছেন।"

তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার আবির্ভাব ঘটার আগেই আইনের উচিত এই ক্ষতিকর উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া। তা না হলে খাপ পঞ্চায়েত অপরাধ, অজ্ঞতা এবং ধর্মান্ধতার সম্মিলনে বিষাক্ত পানীয় তৈরি করতেই থাকবে।

পরিশিষ্ট

নেহা দীক্ষিত

উত্তর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। ২০০৭ সালে দুই মাসে অন্তত এ ধরনের ৪৮টি ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী তরুণ-তরুণীরা তাদের গোষ্ঠী এবং জাতের বাইরে এসে বিয়ে করলে খাপ পঞ্চায়েত নামে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাদের খুন করছে।

আমরা ঘটনার ভুক্তভোগী এবং এ অদ্ভুত আদালতের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু করি। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছে, ওই অদ্ভুত আদালতের সদস্যদের মূল লক্ষ্য বিয়েতে আটকে থাকা নয়; বরং তারা গোটা এলাকায় জনগোষ্ঠীর জীবনের ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েমে বেশি আগ্রহী। খাপ পঞ্চায়েত উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় গান, ক্রিকেট খেলা এবং টেলিভিশন নিষিদ্ধ করেছে। গ্রামবাসী অন্ধের মতো তাদের আইন অনুসরণ করে এবং তারা খাপের নির্দেশে নিজেদের সন্তানকেও হত্যা করতে পিছপা হয়নি। এই খাপ পঞ্চায়েত তাদের এলাকায় নারী ভ্রূণ হত্যার নির্দেশ দিয়েছে লৈঙ্গিক অনুপাত কমানোর জন্য। কোনো কোনো এলাকায় তারা এই অনুপাত প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ৩৩৬ জন নারীতে নামিয়ে আনতে চেয়েছে।

এই স্টোরিতে আমার হাতে তেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত ছিল না। কারণ, খাপ পঞ্চায়েত খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে এবং তাদের আদেশ-নির্দেশও নথিবদ্ধ করা হয় না। তাই এখানে তথ্যের অবাধ অধিকার আইনটি কোনো কাজে আসেনি। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র কাছেও এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কোনো খতিয়ান পাওয়া যায়নি।

নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে টানা ১০ দিন কথা বলার পর আমি খাপ কীভাবে কাজ করে, তারা কতটা শক্তিশালী এবং তারা ওই সব এলাকায় কতটা ক্ষমতা ভোগ করে, তা কিছুটা অনুমান করতে সক্ষম হই। তারপর আবার আমি আমার কার্যপদ্ধতির একটি মানচিত্র তৈরি করি। কারণ, খাপ পঞ্চায়েতের শিকড় সাংস্কৃতিকভাবে গভীরে প্রোথিত। তাদের কেউই সাধারণ অপরাধী নয়; বরং তারা একটি সামাজিক সমস্যা, যা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তাই সেই সংস্কৃতির সূত্রপাতের চালচিত্র বোঝাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূল বিষয়গুলো হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা, জাতপাতের ভেদ, গোষ্ঠীর সম্মান এবং রাষ্ট্র ও সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা।

খাপ পঞ্চায়েতের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় আমাকে পরিচয় গোপন করতে হয়েছে। তারা তালেবানদের মতো করেই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তারা ভীষণভাবে পিতৃতান্ত্রিক, উগ্রবাদী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তাদের কাছ থেকে কথা বের করার জন্য আমাকে তাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে হয়েছে। তাদের সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্যও আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। তাই আমি তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই সংঘাতে জড়াইনি। তাদের কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্য কৌশলী অবস্থান থেকে আমাকে প্রশ্ন করতে হয়েছে। স্থানীয় ভাষা জানা থাকায় আমার কাজ করতে সুবিধা হয়েছে।

স্টোরির অনুসন্ধানের কাজটা ছিল পাহাড়সম। পাশাপাশি স্টোরি শেষ করতে লম্বা সময় লেগে যাওয়ায় সম্পাদককেও বোঝাতে হয়েছে। তাই আমি ওই অঞ্চল থেকে ছোট ছোট বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলাম, যাতে পুরো কাজটা শেষ করার জন্য হাতে সময় পাওয়া যায়। কাজ করতে গিয়ে কখনো আমি শারীরিক হুমকির সম্মুখীনও হয়েছি। তখন স্থানীয় এনজিও কর্মীরা আমাকে সহায়তা করেছে এবং আশ্রয় দিয়েছে।

পাঠকদের কাছে পুরো বিষয়টাকে সহজ করে আনার জন্য আমি পুরো অনুসন্ধান কর্মটিকে চারটি প্রধান অংশে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিই। এই ভাগগুলো করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাপ নেতাদের জারি করা আদেশের ওপর ভিত্তি করে। আমার মনে হয় বড় একটি বিষয়কে বোধগম্য এবং সহজ করে তোলার জন্য কয়েক ভাগে ভাগ করে নেওয়া ভালো। তাতে বিষয়টি উপলব্ধি করা এবং কেস স্টাডিগুলো বোঝা পাঠকের জন্য সহজ হয়।

লেখার ক্ষেত্রে আমার মূল কৌশল হচ্ছে পুরো গবেষণাকে তিন থেকে চারটি অংশে ভাগ করে ফেলা এবং সে অনুযায়ী অংশগুলোতে আমার ভাবনাকে প্রোথিত করা। আমি লেখায় হালকা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। লেখায় বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গি বজায় থাকলে পাঠকের পক্ষে ব্যাখ্যা

করা সহজ হয়। আমি কখনোই স্টোরিতে কোনো একটি অবস্থান নিয়ে ফেলায় বিশ্বাস করি না। স্টোরি লেখার সময় সেখানে জড়িত সব মহলের বক্তব্য সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করাটাও আমার একটি কৌশল।

স্টোরিটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমি সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের কাছে কপি পাঠাই। কারণ, সংবিধানবহির্ভূত এ ধরনের একটি কাঠামোর অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে সবার অবগত হওয়া প্রয়োজন।

পাঠকদের মাঝে স্টোরির মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। মূলধারার পাঠকেরা স্টোরির অনেক প্রশংসা করেন। অনেকে পত্রিকা অফিসে চিঠিও লেখেন। খোদ রাজধানী থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে তালেবান ঘরানার একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা জেনে তারা বিস্মিত হন। অন্যদিকে জাট সম্প্রদায় ইন্টারনেটে আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে। তারা স্টোরিটিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করে আমি তাদের সম্প্রদায়কে অসম্মানিত করার চেষ্টা করেছি। আমাকে টেলিফোনে শারীরিকভাবে আক্রমণ করার হুমকিও দেওয়া হয়।

তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বিষয়টি স্বীকার করে নেন। তার নির্দেশেই পুলিশের কার্যক্রম বাড়ানো হয়। বানাওয়ালা খাপের নির্দেশে মনোজ ও বাবলী নামে এক তরুণ দম্পতিকে খুন করে সেচ খালে ফেলে দেওয়া হয়। আমার স্টোরি প্রকাশের পর মামলাটি আদালতে আবার সচল হয়। সেই প্রথম আদালত খাপ নেতাদের সাজার উদ্যোগ নেয় এবং পাঁচজন খাপ সদস্যের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

৮

অষ্টম অধ্যায়

পাতানো খেলাঃ খেলা নিয়ে অনুসন্ধান

১.

আফ্রিকায় খুন হচ্ছে ফুটবল

ফিফা যত দিন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের সুরক্ষা দেবে, তত দিন আফ্রিকায় ফুটবলের মানের কোনো উন্নতি হবে না।

মুগাবে ফুটবলে দুর্নীতির তদন্ত করতে চেয়েছিলেন, তাকে আটকায় ফিফা;

ক্যামেরুনের ফুটবলাররা কম বেতন নিয়ে অভিযোগ তুললে তাদের বলা হয়, তারা যথার্থ দেশপ্রেমিক নয়

ফোরাম অব আফ্রিকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স (এফএআইআর)

ভূমিকা

আফ্রিকায় অনুসন্ধানী স্টোরির মান বিবেচনায় এটি একটি মাইলফলক। প্রথমবারের মতো গোটা মহাদেশের সাংবাদিকেরা যৌথভাবে এই স্টোরিতে কাজ করেছেন। কারণ, একটি শক্তিশালী মহল তাদের বাধা দিচ্ছিল। তারা পৃথিবীর এমন এক মহাদেশে বসে কাজ করেছেন, যেখানে তথ্যের স্বাধীনতা আইন তাদের সহায়তা দিতে পারেনি। তারা কাজ করেছেন এমন এক জায়গায়, যেখানে প্রশ্ন তোলার কারণে আপনি বিপদাপন্ন হতে পারেন এবং যেখানে নথিপত্র পাওয়া দুরূহ। কারণ, কোনো তথ্যই নথিবদ্ধ করা হয় না। এফওআই অথবা আরটিআই আইন শুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়, সব নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটাও সত্যি যে, সঠিক কাজ করে খুন হতে পারেন এমন ভাবনায় উদ্বিগ্ন হওয়াটাও একজন সাংবাদিকের নিয়তি নয়। এ প্রসঙ্গে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ মনে করেন, সঠিক কাজ করতে গেলে আরও বেশি সংখ্যায় সাংবাদিকের মৃত্যু ঘটতে পারে। হয়তো তার কথাটা সত্যি। কিন্তু এ রকম ঘটুক, সেটা নিশ্চয়ই অ্যাসাঞ্জ কখনোই চান না। একটি অনুসন্ধানী স্টোরি করার জন্য একজন সাংবাদিককে সব সময় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই স্টোরি পাঠ করার সময় বিবেচনা করতে হবে যে, একজন সাংবাদিক তার হাতে থাকা উপায়গুলো দিয়ে সর্বোচ্চ কতটা খনন করতে পেরেছেন এবং তা দরিদ্র থেকে ধনী দেশের সীমানা টপকে দুর্নীতির মডেলের সঙ্গে কতটা জুড়ে যেতে পেরেছে। এই স্টোরি সামান্য সংশোধন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য। তাতে অবশ্য স্টোরির শক্তি এতটুকুও খর্ব হয়নি।

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১০
এফএআইআর ও আফ্রিকার বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায়

আফ্রিকার ফুটবল প্রশাসনের সার্বিক অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে ২০১০ সালের বিশ্বকাপে দেশটির হতাশাব্যঞ্জক ফল মোটেও বিস্ময়ের উদ্রেক করেনি (ব্যতিক্রম ঘানা)। আফ্রিকার ফুটবলে এই পরিস্থিতির পেছনে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ফিফা কোনো জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অনুমোদন দেয় না। কিন্তু কোনো দেশ যখন তাদের ফুটবল দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করতে যায়, তখন ফিফা দেশটিকে বহিষ্কার করে বা বহিষ্কারের হুমকি দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে আফ্রিকার ফুটবলকে শ্বাসরোধ করছে ব্যাপক দুর্নীতি। সেখানকার ফুটবল প্রশাসনের উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তারা দেশে ফুটবলের মান উন্নয়নের চেয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মাঠে প্রতিশ্রুতিশীল ফুটবলারদের বিক্রি করতেই বেশি উৎসাহী।

আফ্রিকার আটটি দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানকার ফুটবল প্রশাসন কোনো ধরনের অর্থনৈতিক অনুদান, দান অথবা স্পন্সর পাওয়ার পর জবাবদিহি করে না। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, আইভরি কোস্ট, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া ও জাম্বিয়া। এ ধরনের বিষয় নিয়ে সাংবাদিকেরা তথ্য চাইলে পাথুরে নীরবতা ছাড়া তারা কিছুই পায়নি। তাদের এই নীরবতার কারণটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যখন দেখা যায়, আইভরি কোস্টের ফুটবল কর্তারা দামি হোটেলে পার্টিতে মশগুল, যখন ক্যামেরুনের ফুটবল সংগঠন ফেক্যাফুট নিজেই দেশটির শীর্ষ দশ ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে। কেনিয়ার ফুটবল প্রশাসনের কর্মকর্তারা যখন বিমানের প্রথম শ্রেণিতে আমেরিকা ভ্রমণে যান আর অর্থের অভাবে জাতীয় দল পার্শ্ববর্তী দেশ উগান্ডায় ম্যাচ খেলতে যেতে পারে না, তখনো কারণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাইজেরিয়ার ফুটবলের হর্তাকর্তারা এ বছর ২১ মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপের সময়ে নাইজেরিয়ার জাতীয় দলের ঠাঁই হয়েছে সস্তা মানের হোটেলে।

ক্যামেরুনে ফুটবলাররা রদবদলের পণ্য

ক্যামেরুন ঐতিহ্যগতভাবে ফুটবলের দেশ। এই দেশেই কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের (সিএএফ) সভাপতি ইসা হায়াতুর বাড়ি। তারপরও ফুটবল স্টেডিয়াম কেন দর্শকশূন্য জানতে চাইলে ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সহকারী মহাসচিব প্রিন্স এনদোকি মুকেতে বলেন, "জনপ্রিয় খেলোয়াড়েরা মাঠে না থাকলে দর্শকেরা কেন খেলা দেখতে আসবে?" তিনি বলেন, "ক্যামেরুনে ফুটবল খেলায় দর্শক এবং জনপ্রিয় খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতির কারণ হলো রদবদল। আমাদের ফুটবল কর্মকর্তারা কোনো খেলোয়াড়ের মাঝে সম্ভাবনা দেখলেই তাকে রদবদলের জন্য অস্থির হয়ে যান। কারণ, এই রদবদল থেকে আসে অর্থ।"

এই ঘন ঘন রদবদলের প্রভাবে খেলোয়াড়েরাও বুঝে যায়, জাতীয় দলে খেলার চেয়ে বাইরের দেশের মাঠে তাদের দাম বেশি। ২৯ বছর বয়সী স্যামুয়েল ইতো ক্যামেরুনের প্রখ্যাত ফুটবলার। আফ্রিকার ফুটবলারদের মধ্যে তিনি বিদেশেও সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হয়েছেন। ১৬ বছর বয়স থেকে তিনি ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ, মালোরকা, বার্সেলোনা এবং ইন্টারনাজিওনালে ফুটবল খেলছেন। ক্যামেরুনের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়ের ইতিহাসটাও একই। আফসোসের সুরে মুকেতে বলেন, জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য তাদের কমই পাওয়া যায়। আর খেললেও খুব একটা ভালো খেলতে পারেন না।" তিনি বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ফুটবলের গুণমান ধরে রাখা উচিত। দর্শকশূন্য স্টেডিয়াম কখনো ফুটবলের উন্নতি ঘটাতে পারে না।"

ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান অবস্থা অনেকটাই ভিন্ন। আবাসন ব্যবসায় শীর্ষ দশ কোম্পানির তালিকায় তারা অন্যতম। তারা ক্রীড়াসামগ্রী কোম্পানির এজেন্ট, আইনজীবী সরবরাহকারী (যারা খেলোয়াড়দের দলবদলের আয়োজন করে), পরিবহন ও হোটেল ঠিকাদার এবং গণযোগাযোগবিষয়ক দালাল সরবরাহকারী। ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের যেকোনো বৈঠক মানেই ভুয়া বিল আর সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে বাড়তি অর্থ পাইয়ে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের ছোটাছুটি। আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স খেলতে আসা মালাওবি দলের চলাচলের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাডো গাড়ি ব্যবহারের কথা কাগজপত্রে উল্লেখ করে বাড়তি অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। পরে দেখা যায়, ওই দলটিকে দেওয়া হয়েছিল জীর্ণ টয়োটা গাড়ি।

এফএআইআরের কাছ থেকে পাওয়া আদালতের নথিপত্র থেকে জানা যায়, ফুটবল ফেডারেশনের একজন কর্মকর্তা ক্যামেরুন জাতীয় দলে নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক এক ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ নিতেন। সেই অর্থ সরাসরি তার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যেত। এই অর্থ ফেডারেশনের অ্যাকাউন্টে প্রদর্শিত হতো না। বাড়তি অর্থ না দেওয়ায় আরেক পৃষ্ঠপোষকের চুক্তিই বাতিল হয়েছিল।

এফএআইআরের হাতে থাকা আরও কিছু নথিপত্রে খেলোয়াড়দের রদবদলের চুক্তিপত্রে তাদের জন্মতারিখ বদলে দিয়ে তাদের বাজার বাড়ানোর তথ্যও পাওয়া যায়। জানা যায়, খেলোয়াড়দের ক্লাবে নথিভুক্ত হওয়ার কাগজপত্র অদলবদল করে কথিত কিছু ক্লাব মালিক

রদবদলের চুক্তির সময় বাড়তি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এ ধরনের রদবদল চুক্তিতে কিছু কিছু খেলোয়াড় বিপদেও পড়েছেন। বড় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলতে না পেরে তাদের ঠাঁই হয়েছে ইন্দোনেশিয়া, চীন অথবা মেক্সিকোর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ক্লাবগুলোতে।

সম্প্রতি সরকারি হিসাব নিরীক্ষণের এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রস্তুতির সময় ফেডারেশনে সরকারের প্রতিনিধি জঁ ল্যাম্বার্ট ন্যাং ফেডারেশনের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। তবে অপরাধীদের সাজা হবে এমনটা পর্যবেক্ষকেরা কখনোই ভাবেননি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "তারা কিছুই করতে পারবে না। কারণ, সবাই এই দুর্নীতির অংশ।"

এই ডামাডোলের মধ্যে ক্যামেরুনের ফুটবলারদের স্বার্থই চাপা পড়ে যায়। সাংবাদিকেরা জানান, খেলোয়াড়েরা তাদের অল্প বেতনের বিষয়ে অভিযোগ করলে কর্মকর্তারা উত্তরে বলেন, তারা যথেষ্ট পরিমাণে দেশপ্রেমিক নন। এফএআইআরের একজন সদস্য সিএএফ সভাপতি ইসা হায়াতুর সম্পদ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চাইলে তাকেও 'দেশবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে যাওয়া সাংবাদিককে প্রথমে হুমকি এবং পরে মারধর করা হয়। সেই সাংবাদিক এ বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পলাতক জীবন যাপন করছেন।

আইভরি কোস্টের উৎসব

আইভরি কোস্টের কফি ও কোকো শিল্প সেখানকার ফুটবল ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতা করা নিয়ে প্রতিযোগিতা করে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি 'অরেঞ্জ কোতে দে'আইভোরি'-এর সঙ্গে। ফেডারেশনের অন্য বড় পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় আছে ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম অপারেশন কোম্পানি (পিইটিআরওসিআই) এবং পেট্রোলিয়াম স্টক ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (জিইএসটিওসিআই)। এই পৃষ্ঠপোষকদের দেওয়া অর্থের প্রকৃত অঙ্ক কখনোই প্রকাশ করা হয় না। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, এই অঙ্ক বছরে ৪০ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

এত অর্থ লাভের কথা শোনা গেলেও বিপরীতে দেশটির জাতীয় দল তেমন ভালো ফল করতে পারেনি। দ্রগবার মতো আন্তর্জাতিক তারকা ফুটবলার থাকার পরেও দলটি সমন্বয়ের অভাবে ভুগেছে এবং বিশ্বকাপের আসর থেকে প্রথম পর্বেই ছিটকে গেছে। অন্যদিকে ফুটবল কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে টিকিট বিক্রিতে জুয়াচুরি করে এবং ভবন নির্মাণের নাম করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। ৩৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষম আবিদজান স্টেডিয়ামটি তৈরি হয় ১৯৪৫ সালে। বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মালাওবির সঙ্গে ম্যাচে আসনের অতিরিক্ত টিকিট বিক্রি করা নিয়ে এক বিরাট প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়। ওই ম্যাচে অতিরিক্ত দর্শকের চাপে পদদলিত হয়ে মারা যায় ২০ জন দর্শক, আহত হয় ১৩৫ জন।

আইভরি কোস্ট ফুটবল ফেডারেশন গোটা ঘটনাটিকে "অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা" হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা অনায়ামা, করহোগো ও বুয়াক্লের মেয়রকে নিজস্ব স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। বলা বাহুল্য, এই স্টেডিয়ামগুলো কখনোই আর নির্মিত হয়নি। একইভাবে আবিদজান স্টেডিয়াম কেলেঙ্কারিতে নিচু পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু প্রখ্যাত ও পুরস্কৃত সাংবাদিক আন্দ্রে সিলভার কোনান বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানে নেমে বলেন, "ছোট মাছ শাস্তি পেয়েছে। বড় মাছগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।"

আইভরি কোস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ফুটবল ক্লাব প্রেসিডেন্টসের (এপিসিএফসিআই) সভাপতি এরভি সিয়াবা বলেন, "দেশের ফুটবল ফেডারেশনের প্রচুর অর্থ অপব্যয় হয়েছে। আর এর বড় একটি কারণ হচ্ছে, এখানে যারা কাজ করেন, তারা ফুটবলের কিছু বোঝেন না এবং খেয়ালখুশিমতো কাজ করে আমাদের ফুটবলের রক্ষক আইনের ক্ষতিসাধন করছেন।" ফেডারেশনের কর্তাদের সাক্ষাৎকার চেয়ে বহু টেলিফোন করা হয়েছে। চিঠি এবং ই-মেইলেও সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ রাজি হননি। এই অনুসন্ধানকাজের একজন প্রদায়ক তাদের কাছ থেকে সাক্ষাতের সময় পেয়ে দপ্তরে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছেন।

ফেডারেশনের চেয়ারম্যান এবং সভাপতি জ্যাকুইস অনুমার প্রতি বহুবার পদত্যাগের আহ্বান জানানো হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "তারা যতবার খুশি আমাকে আহ্বান জানাতে পারে।"

প্রশাসকেরা ঘুরে বেড়ান, খেলোয়াড়েরা স্থবির

চলতি বছরের মে মাসে কেনিয়ার ফুটবল কর্মকর্তারা ফেডারেশনের খরচে আমেরিকা ভ্রমণে গেছেন। আর তখন কেনিয়ার ফুটবল দল অর্থের অভাবে উগান্ডায় ম্যাচ খেলতে যেতে পারেনি। কেনিয়ার সরকারকে ১০ হাজার ডলার ব্যয় করে ফুটবল দলকে আফ্রিকান নেশন্স

কাপ খেলার জন্য নিয়ে যেতে হয়। এর পুরোটাই করদাতাদের দেওয়া অর্থ থেকে নেওয়া। একইভাবে বিশ্বকাপের সময় নাইজেরীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের দলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র ১০০ ডলার দামের সস্তা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। অথচ ফিফা সেখানে প্রতি খেলোয়াড়ের জন্য ৪০০ ডলার বরাদ্দ করেছিল। এরপরেও ফেডারেশন তাদের জন্য মানসম্মত হোটেলের ব্যবস্থা করতে পারেনি। জনগণের করের অর্থ ব্যয় করে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী নাইজেরিয়ার জাতীয় দলকে উদ্ধার করেন। অবশ্য নাইজেরিয়ার ফুটবলাররা এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত। সেখানকার গার্ডিয়ান পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে, খেলোয়াড়েরা তাদের প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা এবং মহার্ঘ ভাতাও পাচ্ছেন না।

নাইজেরীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিভিন্ন চুক্তি নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ইংল্যান্ডের সাবেক কোচ গ্লেন হোডলকে নাইজেরীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগের জন্য মনোনীত করা হয়। তার পারিশ্রমিক ধার্য করা হয় ১ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ফেডারেশনের একশ্রেণির কর্মকর্তা তাকে বলেন, তার বেতন ১.৫ মিলিয়ন ডলার বলে ঘোষণা দেওয়া হবে এবং পরে তারা সবাই মিলে অর্থ ভাগাভাগি করবেন। হোডল তাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে চুক্তি বাতিল করে দেন।

নাইজেরিয়ার ফুটবল ফেডারেশন ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় প্রচুর অর্থ লাভ করেছিল। ফিফার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল ৯ মিলিয়ন ডলার। গ্লোবালকম নামে একটি টেলিভিশন কোম্পানির কাছ থেকে তারা পায় আরও ৭ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ কোথায় গেল, সেটাই এক রহস্য। এই অর্থ নাইজেরীয় ফুটবল ক্লাবগুলোর উন্নয়নে ব্যয় হওয়ার কথা। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছায় এই অর্থের মাত্র ১০ শতাংশ। বাকি অর্থ কোথায় গেছে, কেউ তা জানে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। এই লিগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রয়েছে প্রখ্যাত এবিএসএ ব্যাংক, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ বিয়ার উৎপাদনকারী কোম্পানি এসএবি মিলার, সুপারস্পোর্ট চ্যানেল এবং আরও কিছু ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান। ২০০৭ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরেই এই লিগে তাদের অনুদানের পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৮ সালেই এই লিগের সভাপতি আরভিন খোজা ৮৩.৩ মিলিয়ন ডলার লাভ করেছেন।

বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল কর্মকর্তাদের ফিফার পক্ষ থেকে একটি মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার কথা ছিল। সোয়েটান নামে একটি দৈনিক পত্রিকার অনুসন্ধানে জানা যায়, স্থানীয় একটি সাংগঠনিক কমিটির উপপ্রধান হিসেবে খোজা বিশ্বকাপ থেকে লাভের অর্থের ১০ শতাংশ (১৩০ মিলিয়ন ডলার) সেই কমিটির সদস্যদের দেওয়ার জন্য ভোট দিয়েছেন। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে তারা লাভের অর্থ থেকে ৫ শতাংশ (৬৫ মিলিয়ন ডলার) দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। উল্লেখ্য, খোজা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনেরও একজন সদস্য।

কিন্তু অর্থের এত প্রবাহ থাকার পরেও দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল উন্নতি করতে পারেনি। তাদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ, তাদের খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তাদের অবস্থা ক্যামেরুনের অবস্থার বিপরীত। ফুটবলাররা বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন ক্লাব ফুটবলে অংশ নেবে এবং দেশে ফিরে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করবে, এটাই একটি আদর্শ পরিস্থিতি হওয়ার কথা। একটি দেশ বিদেশের বাজারে নিজ দেশের খেলোয়াড়দের বিক্রি করে দেবে বা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করবে–এই দুটি পদক্ষেপের কোনোটিই সঠিক নয়।

বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজনের সময় দেশের মানুষকে ফুটবল উদ্দীপনায় যুক্ত করার চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা এবং তাদের বন্ধুরা মিলে বিভিন্ন ভবন এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। জিমি মোলালা ছিলেন নেলসপ্রুট সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা। তিনিই মোবমবেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। ২০০৯ সালে তাকে হত্যা করা হয়।

তরুণ ফুটবলারদের অনুদানের চিত্রটিও বিশৃঙ্খল

আফ্রিকার ফুটবলে আজকের অব্যবস্থার পেছনে একটি প্রধান কারণ, তরুণ ফুটবলার গড়ে তোলার জন্য তহবিলের অর্থ নিয়ে দুর্নীতি। আফ্রিকার ছোট ছোট বালক জীবনে বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই বালক ও কিশোরদের বিভিন্ন জায়গায় ধূলিধূসরিত পথে প্লাস্টিকের বল দিয়ে ফুটবল খেলতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আঞ্চলিক ফুটবলের উন্নয়নের জন্য অনুদানের অর্থ কখনোই তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

আইভরি কোস্টে ন্যাশনাল অয়েল রিফাইনারি কোম্পানি (এসআইআর) স্থানীয় ফুটবল ক্লাবগুলোর উন্নয়নের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেয়। কিন্তু এই অনুদানের অর্থ ক্লাবগুলোর কাছে পৌঁছায় না। নিজস্ব অনুসন্ধানে এই তথ্য জানার পর ২০০৭ সালে তারা অনুদান বন্ধ করে দেয়।

২০০৩ সালে জিম্বাবুয়েতে রাষ্ট্রপ্রধান রবার্ট মুগাবের ভাইয়ের ছেলে লিও মুগাবেকে দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি ফিফার কাছে তরুণ ফুটবলার উন্নয়ন প্রকল্পে ৬১ হাজার ডলারের হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু দুর্নীতির আবর্জনা এখানেই শেষ হয়নি। ২০০৭ সালে দেশটিতে এলাকাভিত্তিক তরুণ ফুটবলার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খেলার সামগ্রীর চালান খুঁজে পাওয়া যায় একজন ফুটবল কর্মকর্তার গ্যারেজে। সাংবাদিকেরা এই ঘটনা প্রকাশ করার পর ওই গ্যারেজ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তিন কর্মকর্তা এফএআইআরকে জানান, আসোসিয়েশনের সভাপতি কাথবার্ট দুবে তাদের প্রত্যেককে ২ হাজার ডলার দেন নির্বাচনে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য। দুবের পূর্বসূরি ওয়েলিংটন ন্যাতাঙ্গা এখনো কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের একজন সংগঠক। তিনি ফিফার অ্যাসোসিয়েশন কমিটিরও সদস্য।

ফুটবল দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানে ফিফার বাধা

আফ্রিকার দেশগুলো যখন তাদের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে যায়, দেখা গেছে, তখনই ফিফা তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ২০০৪ সালে কেনিয়ার সরকার তহবিল তছরুপের দায়ে তাদের ফুটবল ফেডারেশনকে বরখাস্ত করে। এ ঘটনার পর ফিফা হস্তক্ষেপের পাল্টা অভিযোগ তুলে কেনিয়াকে বহিষ্কার করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার মূল কারণ ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার ডলার ঋণের দায়। অথচ তিন বছর আগে তারা যখন দায়িত্ব নেয়, তখন ২ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।

কেনিয়ার সরকার ফেডারেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করে নতুনভাবে কাজ শুরু করলেও ফিফা এখন সমর্থন দিচ্ছে নবগঠিত 'ফুটবল কেনিয়া লিমিটেড' নামে একটি সংগঠনকে। তারা বলছে, এই সংগঠন সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত।

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে ২০০৪ সালে ফিফা চাদ, ইথিওপিয়া ও মাদাগাস্কারকে বহিষ্কার করে। আফ্রিকার বেশির ভাগ জাতীয় দল চলে সরকারি অর্থায়নে। কিন্তু যখন এই সরকারি তহবিল তছরুপের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন সেটা ফিফার কাছে হয়ে যায় নাক গলানো।

জাম্বিয়ার জাতীয় দলকে ২০০৮ সালে বহিষ্কারের হুমকি দেয় ফিফা। দেশটির সরকার তাদের ফুটবলার ইমানুয়েল মাউকার ইসরায়েলে খেলার রদবদল বিষয়ে তদন্ত করার ঘোষণা দিলে ফিফা এই হুমকি দেয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, যে কোম্পানি এই রদবদলে মধ্যস্থতাকারী ছিল, তাদের প্রচুর শেয়ারের মালিক জাম্বিয়ার ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান কালুসা বাওয়ালিয়ার স্ত্রী। সেই হুমকি আসার পর তদন্ত থেমে যায়। এফএআইআরের সাংবাদিক অগাস্টিন মুকোকা এ বিষয়ে বাওয়ালিয়াকে প্রশ্ন করলে তিনি ওই সাংবাদিককে চড় মারেন। জাম্বিয়ার সরকার ফিফার হুমকি পেয়ে তদন্ত বন্ধ করে দিলেও জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে কিন্তু তাদের ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করেননি। ২০০৬ সালে তিনি ফেডারেশনের প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য আদেশ জারি করেন।

ফিফার বহিষ্কারের হুমকির সর্বশেষ শিকার নাইজেরিয়া। গত বিশ্বকাপে নাইজেরিয়া দল বাজে ফল করায় প্রেসিডেন্ট গুডলাক জোনাথন দুই বছরের জন্য ফিফা ও সিএএফ আয়োজিত যেকোনো খেলায় তাদের জাতীয় দলের অংশগ্রহণ বন্ধের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি জাতীয় ফুটবল দলের জন্য বরাদ্দ করা নাইজেরীয় মুদ্রায় ৯০০ মিলিয়ন নাইরা ব্যয়ের বিষয়ে তদন্তেরও নির্দেশ দেন। নাইজেরিয়ার রিভার স্টেটের প্রশাসক রোতিমি অ্যামেচি বলেন, "আমরা বিশ্বকাপে গিয়ে নিজেদের সমস্যাগুলো টের পেয়েছি। তাই এখন আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে।" কিন্তু ঘটনা এখানেই থেমে যায়নি। ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হলে নাইজেরিয়াকে বহিষ্কার করা হবে। ফিফার গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক নিকোলাস মেইনগট জানান, ফিফার এই বহিষ্কারাদেশ শুধু জাতীয় দল নয়, তাদের ক্লাব ফুটবল, আফ্রিকায় যেকোনো ফুটবল প্রতিযোগিতা ও রেফারিদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। ফিফা তাদের অর্থ বরাদ্দও বন্ধ করে দেবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের চেয়ে আফ্রিকায় ফুটবল কেলেঙ্কারিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি

লন্ডনে বসবাসকারী আফ্রিকাবিষয়ক বিশ্লেষক রিচার্ড হাল মনে করেন, কম উন্নয়নের জায়গায় দুর্নীতি উন্নত জায়গার দুর্নীতির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তার মতে আফ্রিকার অর্থনীতি নবজাতকের মতো। তারা যেমন যেকোনো ধরনের সংক্রমণে ঝুঁকিতে পড়ে এবং অসুস্থ হয়ে মারা যায়, আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য দুর্নীতি ঠিক তেমনই। আমেরিকা, জাপান অথবা যুক্তরাজ্য বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা সহজেই সামলে নিতে পারে। কিন্তু আফ্রিকার অর্থনীতিতে গভীরতা, স্থিতিশীলতা এবং সক্ষমতা কম থাকায় তার পক্ষে এ ধরনের ঘটনা হজম করা কঠিন হয়।

জো কাডেঙ্গে একজন খেলোয়াড়, দলের ম্যানেজার এবং কোচ হিসেবে ১৯৫০ সাল থেকে কেনিয়ার ফুটবলের সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, "আমাদের উচিত ফিফার এসব হুমকি উপেক্ষা করা। আমাদের দেশে ফেডারেশনে নীতিমান মানুষেরা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সরকারের উচিত ফুটবল ফেডারেশন নিয়ন্ত্রণ করা।"

আফ্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিকতার অঙ্গনকেও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। এফএআইআরের অনুসন্ধানী দলের একজন সদস্য স্থানীয় সাংবাদিকের কাছে প্রমাণ আছে, স্থানীয় এক সাংবাদিক ফুটবলের একটি ঘুষ-দুর্নীতির প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও ঘটনাটি রিপোর্ট করেননি; বরং তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অর্থ দাবি করেছিলেন।

পরিশিষ্ট

এভেলিন গ্রোনিঙ্ক ও চার্লস রুকুনি

ফোরাম ফর আফ্রিকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স (এফএআইআর) সংগঠনটি আফ্রিকার ৪০টি দেশে কাজ করে। এই সংগঠনে ১৮০ জনের বেশি সাংবাদিক, সম্পাদনা কর্মী, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রশিক্ষক আছেন। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ৬৫ জন সাংবাদিক পেশাদার অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং তাদের স্টোরি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তহবিলের অভাব, কখনো সম্পাদকের অসহযোগিতা আবার কখনো হুমকির মুখোমুখি হয়েও তারা নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। আরও গভীরতর অনুসন্ধান করার জন্য এফএআইআরের সাংবাদিকেরা আন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে দলগতভাবেও অনুসন্ধানের কাজ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসার পর এফএআইআরের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য জাস্টিন আর্নেস্টাইন সাংবাদিকদের বিশ্বকাপ বিশেষ করে আফ্রিকার ফুটবলার রদবদল এবং এ থেকে আফ্রিকার দেশগুলোর ফুটবল কর্মকর্তাদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার পরামর্শ দেন। এফএআইআরের সাংবাদিকেরাও একমত হন যে, আফ্রিকায় বিশ্বকাপের বছরে ফুটবলবিষয়ক অনুসন্ধানী স্টোরি ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। তারা ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে আফ্রিকার ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের অর্থ লুটপাট এবং ঘটনার সঙ্গে কখনো খোদ ফিফার যোগসাজশের বিষয়েও নজর দেন।

অনুসন্ধান চালানোর জন্য আমরা এফএআইআরের সদস্য এবং উইকলি পোস্টের সাংবাদিক ডেভিড আইউককে ক্যামেরুনে পাঠাই। আইইউক ক্যামেরুনের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ফিফার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ইসা হায়াতুর সম্পদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করলে মাস্তানেরা তার ওপর হামলা চালায়। আমরা এই হামলার জবাবে 'ফুটবলের উন্নয়নের অর্থ চুরি' শীর্ষক একটি স্টোরি করার সিদ্ধান্ত নিই। বিভিন্ন দেশের এক বিশাল অনুসন্ধানী সাংবাদিক বাহিনী এই কাজে আমাদের সহায়তা করে। স্টোরিটি প্রকাশের পর আক্রমণকারীরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারে, "একজন সাংবাদিককে পেটানো যায়, কিন্তু স্টোরি বন্ধ করা যায় না।" স্টোরিটি আফ্রিকাজুড়ে যথেষ্ট আলোচিত হয়।

আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে কাজ করা আমাদের অনুসন্ধানী দলের সদস্যদের একটি প্রশ্নের তালিকা সরবরাহ করে দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তারা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে উত্তর সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন এবং আমরা সেগুলোর সমন্বয় করে একটি স্টোরি তৈরি করতে পারব। আমরা আমাদের দলের সদস্যদের নির্দিষ্টভাবে বলে দিইনি, কোথায় তারা তথ্য পাবেন আর কোথায় উপাত্ত। তারা প্রত্যেকেই ক্রীড়া সাংবাদিকতায় দক্ষ। তারা জানতেন, কোত্থেকে এসব সংগ্রহ করা যাবে। একটি গবেষণা পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার জন্য আমরা 'স্টোরিনির্ভর অনুসন্ধান' নির্দেশিকার সহায়তা নিই।

আমরা দুটি জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রথমত, এফএআইআরের উপাত্ত ভাণ্ডার থেকে এবং দ্বিতীয়ত, সম্পাদক চার্লস রুকুনি অনলাইনে আমাদেরকে ফুটবলসংশ্লিষ্ট অর্থের প্রবাহ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং ব্যয়বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আদালত এবং ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেয়েছি। যেসব ব্যবসায়ী ফুটবলের ওপর বিনিয়োগ করে দেখেছেন, তাদের বিনিয়োগ বিফলে যাচ্ছে, তারাও আমাদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফুটবলের অবকাঠামোগত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয় (যা শুরুতে অনেক কম ছিল) বিষয়ক তথ্য আমাদের জানান দেশটির অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা।

আফ্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন। সেখানে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত শকুনদের উন্মোচন করতে সাংবাদিকদের গোপনীয়তার আবরণে কাজ করতে হয়। আইভরি কোস্টে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ ছিল। সেখানে আমরা পরিচিত সূত্রকে ব্যবহার করে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে নথিপত্র জোগাড় করেছি। তাতে কাজটা সহজ হয়েছে। ক্যামেরুন ও জিম্বাবুয়েতেও সৌভাগ্যবশত আমরা একটি সূত্র পেয়ে যাওয়ায় অনেক তথ্য হাতে চলে এসেছিল।

আফ্রিকার গণমাধ্যম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দিতে পারে না। কোথাও কোথাও গণমাধ্যমের কর্তারা অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহীও হন না। তবে আমাদের দলের বেশির ভাগ সদস্যই অন্য গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা চালিয়ে গিয়ে অর্থের সংকট মোকাবিলা করেছেন।

আমরা এই স্টোরির কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও এসব দুর্নীতির সঙ্গে ফিফার কিছু কর্মকর্তার যোগাযোগও খুঁজে পেয়েছি। তারা এখনো আফ্রিকায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন এবং আফ্রিকার ফুটবলকে হুমকি দিচ্ছেন শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য।

বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য এবং স্টোরি আসায় সেগুলোকে একটি সমন্বিত অবয়ব দিয়ে লেখার কাজটা করা বেশ কঠিন ছিল। এই কারণে স্টোরিটি একাধিকবার লিখতে হয়েছে।

স্টোরির বহুল প্রচারের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়ে সাফল্য পেয়েছি। আফ্রিকা ছাড়াও বিশ্বের ১২টি দেশে এটি প্রকাশিত হয়। আমরা চেয়েছিলাম বিশ্বকাপের আয়োজন শেষ হওয়ার পর স্টোরিটি প্রকাশ করতে। ক্যামেরুনে এই স্টোরি নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। আইভরি কোস্টে প্রথমবারের মতো সমাজের উঁচু মহলের ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য হন। নাইজেরিয়াতে আগেই তাদের ফুটবল দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোনো মহল থেকেই স্টোরির কোনো প্রতিবাদ পাওয়া যায়নি। উইকলি পোস্টে এই স্টোরি ছাপা হওয়ায় পর সরকার বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আটকে যায় তাদের বকেয়া পাওনাও। এভাবে তাদের ব্যবসায়িক লাইসেন্সও বাতিল করা হয়।

২.
কীভাবে একটি ম্যাচ পাতানো হয়

ডেক্ল্যান হিল

ভূমিকা

ডেক্ল্যান হিল একই সঙ্গে অপরাধবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী, অন্যদিকে খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের (মাদকাসক্তি, ম্যাচ পাতানো) বিরুদ্ধে একজন অক্লান্ত যোদ্ধা। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি আমি যখন সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দিই, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থায় যোগাযোগ করে খেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে তার কৌশলগুলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। তারা তার প্রস্তাব গ্রহণও করেছে। কোনো কোনো সাংবাদিক অবশ্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে, হিলের পদ্ধতি কার্যকর হলে তাদের আবিষ্কৃত তথ্য উপযোগিতা হারাবে। হিল মনে করেন, পাঠক বা দর্শকেরা সাংবাদিকদের কাছে বস্তুনিষ্ঠতার চেয়ে স্বচ্ছতা বেশি আশা করে।

'দ্য ফিক্স' নামে তার বহুল আলোচিত বইটিতে খেলার মাঠে সংঘটিত অপরাধ চিহ্নিত করার বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তার কাজকর্ম প্রায় গোয়েন্দা কাহিনির মতোই। বইটিও পাঠকের কাছে অপরাধকাহিনির মতোই মনে হবে।

দ্য ফিক্স : ফুটবল ও সংগঠিত অপরাধ, ডেক্ল্যান হিল
(ম্যাকক্লেইভ অ্যান্ড স্টুয়ার্ট-২০০৮)

২৬ নভেম্বর, শনিবার, ২০০৫
ব্যাংকক, সকাল ৮টা

এক মাস ধরে আমি পাতানো খেলার এক জুয়াচোরের অনুসন্ধান করছি। এশিয়ায় জুয়াড়ি মহলে এই ব্যক্তি খুবই পরিচিত। বিগত দশকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাতানো ম্যাচের পেছনে তার সংশ্লিষ্টতা আছে। কিন্তু এই মানুষ সব সময় পর্দার আড়ালে থাকেন। আমি তার নাম দিয়েছি লি চিন।

আমাকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে শহরের বাইরে একটি গলফ ক্লাবে যেতে বলা হয়েছে। সেখানে ১১০৪ নম্বর রুমে প্রবেশ করে কয়েকজন মানুষকে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা দুই ব্যক্তি ছাড়াও ছিল চিনের একজন সহকারী। আরেকজন সুন্দরী নারীকে চোখে পড়ে যে বিছানায় শুয়ে সিনেমা দেখছিল।

১৯৯৯ সালে এক জুয়াড়ি নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই ব্যক্তি তাকে এশীয় জুয়াড়িদের একটি চক্রের কথা বলে, যারা আন্তর্জাতিক ফুটবল ও ক্রিকেটে ম্যাচ পাতানোর ব্যবস্থা করে। ফ্লেমিং জানতে পারেন, এই চক্রের সঙ্গে ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার ও টেনিস খেলোয়াড়েরা জড়িত আছেন। চিন আমাকে এই একই তথ্য জানান। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, তিনিই এই চক্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছেন এবং সারা পৃথিবীতে তার ১৬ জন সহকারী একান্তভাবে তার জন্যই কাজ করছে।

চিনের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, কোনো বড় খেলার আসরে ম্যাচ পাতানোর পেছনে তার অবদান ছিল? চিন পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোনটা বড় আসর– বিশ্বকাপ ফুটবল, না অলিম্পিক? তারপর বলেন, ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে তিউনিসিয়া ও পর্তুগালের ম্যাচটার পেছনে তার কারসাজি ছিল। তিউনিসিয়ার কয়েকজন ঘুষ নিয়ে ম্যাচে হেরে যায়। তিনি আমাকে জানান, এমন খেলোয়াড় কমই আছেন, যার সঙ্গে পাতানো ম্যাচের জন্য যোগাযোগ করার পর তিনি রাজি হননি। চিন তার রুমে উপস্থিত সেই মেক্সিকান নারীকে তিউনিসিয়ার একজন খেলোয়াড়ের কাছে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেন। এ জন্য সেই নারীকে দিতে হয় ৫০ হাজার ডলার। আর তিউনিসিয়া পর্তুগালের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায়।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চিনের ফোন বেজে ওঠে। কয়েক মিনিট ফোনে অচেনা ভাষায় কথা বলার পর চিন জানান, জার্মানির ফুটবল লিগে আজকে হ্যানোভার দলটি ২-০ গোলে জয়লাভ করবে। পুরো ঘটনাটা সাজাতে তাকে মাত্র ২০ হাজার ডলার ব্যয় করতে হয়েছে। চিনের কাছ থেকেই জানতে পারি, পাতানো ম্যাচের জন্য খেলোয়াড়দের প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়। একজন খেলোয়াড় যদি সপ্তাহে ৫০ হাজার ডলার পকেটে ঢোকান, তাহলে চিন তাকে ৯০ মিনিটের জন্য দেন দেড় লাখ ডলার। সেদিন মধ্যরাতের পর আমি চিনের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আরেকটি ফোন আসে। চিন জানান, হ্যানোভার দলটি ৫-২ গোলে জয়লাভ করেছে। পরের মাসে ২০০৬-এর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে কীভাবে ম্যাচ পাতানো হবে, তা দেখার জন্য চিন আমাকে আমন্ত্রণ জানান।

২৫ মে, ২০০৬, ব্যাংকক

উত্তর ব্যাংককের একটি অখ্যাত কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের দোকানে বসে তারা বিশ্বকাপে পাতানো ম্যাচের ব্যবস্থা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চার ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন সুঠামদেহী। বাকি তিনজনের একজন স্বয়ং চিন এবং তার দুজন চীনা সহকারী। সেদিন তারা সেখানে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে আলোচনা করেন। ১০ মিনিট পর সেখানে অবিন্যস্ত পোশাকে এক দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ প্রবেশ করেন। তার মোবাইল ফোনটি ঠিকভাবে কাজ করছিল না। সেই লোকটিই ছিলাম আমি।

চিন আমাকে পরে জানান, সেই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি পাতানো ম্যাচের একজন দালাল। সে চিনকে জানিয়েছিল, একটি দলের কয়েকজন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা ম্যাচ ছেড়ে দিতে রাজি আছে। কিন্তু তারা সেদিন আগাম দেওয়ার জন্য যে অর্থ দাবি করছে, চিনের কাছে তা ছিল না। তাই তিনি অন্য চক্রের হাতে কাজটা দিয়ে দিতে চাইছিলেন। তারা আলোচনা শেষে চিন ফোন করে সেদিন জানালেন, ম্যাচ পাতানোর জাল বিছানো হয়ে গেছে। দলটি হচ্ছে ঘানা।

উজবার্গ, জার্মানি, জুন, ২০০৬

উজবার্গ ব্রাজিল ও ঘানার মধ্যে ২৭ জুন অনুষ্ঠেয় ম্যাচের আগে আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। ঘানা জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা খুবই দামি একটি হোটেলে ছিলেন। আমি ওই হোটেলেই একটি রুম ভাড়া নিয়ে এক কর্মকর্তার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি। আমার সন্ধানী মন তাদের আচরণে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। চেক রিপাবলিক ও যুক্তরাষ্ট্রকে হারানোর পর সেই ম্যাচ নিয়ে চারদিকে ছিল ব্যাপক উত্তেজনা। আমি ঘানা দলের ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও কথা বলি। স্টিফেন আপ্পিয়া আমাকে বলেন, তারা রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। তবে ঘানা নির্ভর করবে পাল্টা আক্রমণের ওপর। আমার মনে হয়েছিল, জয়ের লক্ষ্যে স্থির এই অধিনায়ক খুবই কুশলী এবং তার অনেক অর্থ আছে। তিনি এশিয়ান জুয়াড়িদের ফাঁদে পা দেবেন না।

হোটেলের পরিবেশ একদম স্বাভাবিক ছিল। আমি হোটেলের লবিতে বসে অনেক ছবি তুলি কিন্তু ছবিতে কোথাও কোনো সন্দেহজনক এবং পরিচিতি চেহারা দেখিনি। একপর্যায়ে আমার মনে হয়েছিল, কোনো ধরনের পাতানো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টাই কল্পনা। কিন্তু পরদিন রোববার সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে আসার সময় হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম, হোটেলের একটি কক্ষের জানালায় খুবই সুন্দরী এক জার্মান যৌনকর্মী খোলামেলা পোশাকে বসে আছেন। সেই নারী যে তলায় বসে ছিলেন, সেখানেই ঘানা দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড় অবস্থান করছিলেন। আমি হোটেলের লবিতে ঘানা দলের খেলোয়াড়দের তাদের জন্য বরাদ্দ ম্যাচের টিকিট বিক্রি করতে দেখেছিলাম।

সেই ম্যাচের দুদিন আগে অর্থাৎ ২৫ জুন চিন এবং আমার মধ্যে ফোনে সংলাপগুলো ছিল এ রকম:

চিন: তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটতে চলেছে।

হিল: ব্রাজিল জিতবে?

চিন: না, ঘানা হারবে। বিষয়টা নিশ্চিত হয়েছে।

হিল: নিশ্চিত?

চিন: এক শ ভাগ নিশ্চিত। তারা ব্রাজিলের খেলায়ই বাণিজ্য করতে চায়।

ডর্টমুন্ড স্টেডিয়াম, জার্মানি, ২৭ জুন, ২০০৬

ডর্টমুন্ড স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। অদ্ভুত এক আবেগে মাঠে প্রিয় দলের খেলা দেখতে আসা দর্শকদের জন্যও কেঁদেছিলাম। সেদিন তিন গোলে ব্রাজিলের কাছে হেরেছিল ঘানা। তাদের খেলায় কোনো সমন্বয় ছিল না। আমি চিনের কাছ থেকে আগেই জানি, ম্যাচটা পাতানো। তবু হয়তো মনের মধ্যে আশা ছিল, অলৌকিক কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু সেদিন তেমন কিছুই ঘটেনি। খেলা শেষে আমি কান্না সামলে নিয়ে চিনকে ফোন করেছিলাম অভিনন্দন জানানোর জন্য। আমি আগে তাকে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

আক্রা, ঘানা ২০০৭

এক বছর পর আমি ঘানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সেদিন জার্মানিতে সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল, সেটা জানার তীব্র ইচ্ছা থেকে ঘানায় যাই। আমি আপ্পিয়াকে খুঁজে বের করি। ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচের বিষয়ে জানতে চাইলে আপ্পিয়া খুব সহজ কণ্ঠে জানান, "আমরা ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের সক্ষমতা বুঝতে ভুল করেছিলাম।" তারপর আমি তার কাছে জুয়াড়িদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বিস্ময়কর কিছু কথা বলেন।

আপ্পিয়া: ২০০৪ সালে আমরা যখন অলিম্পিকে খেলতে যাই, তখনো এই ব্যক্তি আমাদের ২০ হাজার ডলার দিয়ে বলেছিল, ম্যাচটা জিততেই হবে। আমি সবার সঙ্গে সেই অর্থ ভাগ করে নিয়েছিলাম এবং আমরা ২-১ গোলে জয়লাভ করেছিলাম।

হিল: গত বিশ্বকাপে তারা কী করল?

আপ্পিয়া: সেই ব্যক্তিই এসে বলল, চেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে ম্যাচটা জিততেই হবে। আমি আর তাদের সঙ্গে কথা বলিনি।

একজন আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার স্টিফেন আপ্পিয়া নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করেন যে বিশ্বকাপে তার সঙ্গে জুয়াড়িরা যোগাযোগ করেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, এসব তথ্য বইতে ব্যবহার করলে তারা তাকে খুন করতে পারে। পরমুহূর্তে অবশ্য মজা হিসেবে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমি বহু ফোন এবং ই-মেইল চালাচালির পর জুরিখে যাই ফিফার প্রধান সেপ ব্ল্যাটারের সঙ্গে কথা বলতে। আমি তাকে এশীয় জুয়াড়ি এবং পাতানো ম্যাচের বিষয়ে প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বলেছিলেন, "আমার মনে হয় না, এগুলো সত্য। আর তেমন কিছু যদি ঘটেও থাকে, আমার মনে হয় না তা চূড়ান্ত ফলকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। ৩০ বছর ধরে আমি ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। সবার কাছে এই খেলাকে নিয়ে যেতে চাইছি। এই খেলা আমার কাছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়, জীবনের পাঠশালা; বলা যায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও। এটা আনন্দও। তারপর কিছু ঘটলে সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা।"

তিনি আমাকে অনুসন্ধানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তারপর উঠে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বের হয়ে যান।

পরিশিষ্ট

ডেক্ল্যান হিল

এই বই লিখতে গিয়ে আমি খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ক্রীড়া কর্মকর্তা, পুলিশ, আইনজীবী, জুয়াড়ি এবং পাতানো খেলার কারিগর মিলিয়ে ২২০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমি ভেবে বিস্মিত হয়েছি, খুব কমসংখ্যক সাংবাদিক কেন কখনো পাতানো খেলার কারিগরদের সাক্ষাৎকার নেননি।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার নানান কৌশল আছে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময় বলি, ভালো সাক্ষাৎকার নিতে হলে আগে নিজের মনের ভাবনাকে স্থির করতে হবে এবং লেখার কাজটা নির্ভুলভাবে করতে হবে। মনের ভাবনার জায়গায় স্থির থাকা খুবই সহজ এবং কিছু নীতির ওপর নির্ভর করে। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আপনি যদি ভেবে নেন, কে ভালো, কে মন্দ আপনি জানেন, আপনার কাজ হচ্ছে, টেপ রেকর্ডার চালিয়ে তার কথাগুলো ধারণ করা, তাহলে বলব, সেটা ভুল ভাবনা। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আপনাকে অসংখ্য প্রশ্ন করতে হবে। এমনকি যখন আপনার মনে হবে, স্টোরিটার বিষয়ে সব কিছু জানা হয়ে গেছে, তখনো প্রশ্ন করতে হবে। কারণ, যখনই আপনি ধরে নেন, আপনার সব জানা হয়ে গেছে, তখনই ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আপনার চারটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে:

১. ধারাক্রম: এখানে ধারাক্রম অর্থ হচ্ছে একটি তালিকা, যেখানে কে, কোথায় এবং কখন কী করেছে তার বিবরণ থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কখনো এ ধরনের তালিকা ১৫০০ পৃষ্ঠাও হতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এই তথ্যগুলো আপনাকে প্রশ্ন করতে সাহায্য করবে। তথ্যের এই ধারাক্রম তৈরি করতে গিয়ে আমি পাতানো খেলার ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছি। সেখানেও বিস্ময়কর সব তথ্য পেয়েছি। জানতে পেরেছি বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য বা রোমান সম্রাট ক্যালিগুলাও পাতানো খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গবেষণাকাজে ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রশ্নের তালিকা: সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে আপনি কী কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, তার একটি তালিকা তৈরি করে নেওয়া ভালো। দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে এক ঘণ্টা সময় নিয়ে প্রশ্নগুলো তৈরি করে লিখে রাখুন। প্রশ্নগুলো খুব সহজ এবং শিশুসুলভ মনে হলেও সেগুলো লিখে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। যেমন, পাতানো খেলার আয়োজক কারা? পাতানো খেলা কী? সব খেলাতেই কি এ ধরনের ঘটনা ঘটে? আপনার গবেষণার বিষয় নিয়ে অন্যদের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোও লিখে রাখা উচিত।

৩. মানুষের তালিকা: যেসব মানুষের সঙ্গে স্টোরির প্রয়োজনে কথা বলা উচিত, তাদের নামের তালিকা তৈরি প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি ক্যাথলিক চার্চ নিয়ে কোনো স্টোরি করেন, সেখানে পোপের সঙ্গেও কথা বলা প্রয়োজন। তার নামটাও আপনি তালিকায় রাখুন। এ ধরনের তালিকা আপনার কাজের বিস্তৃতি সম্পর্কেও একটা ধারণা দেবে।

৪. স্টোরির বিষয়: আপনার স্টোরির মূল বিষয়টি এক লাইনে লিখে রাখুন। লাইনটি হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তা আপনাকে জানাবে, স্টোরির মূল বিষয় হচ্ছে পেশাদার ফুটবলে পাতানো খেলা। এটি খেলায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বা ক্রীড়াবিদদের যৌন নিপীড়নবিষয়ক স্টোরি নয়। মনে রাখতে হবে, স্টোরি করতে গিয়ে অসংখ্য তথ্যের ভিড়ে কখনো আপনি স্টোরির মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারেন। দিন শেষে এই একটি লাইন আপনাকে স্টোরির মূল গতিপথে ফিরে আসতে সহায়তা করবে।

৩.

তারা এখনো ২০০৬ সালের বিশ্বকাপের লভ্যাংশ বুঝে পায়নি

অ্যান্ড্রু জেনিংস

ভূমিকা

অ্যান্ড্রু জেনিংস ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে নিরীহ ধরনের স্টোরিতে নিজেকে আটকে রাখেননি। তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে খেলার জগতের স্ববিরোধিতা এবং দুর্নীতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তার লেখা বই 'দ্য সিক্রেট ওয়ার্ল্ড অব ফিফা: ব্রাইব, ভোট রিগিং অ্যান্ড টিকিট স্ক্যান্ডাল' (২০০৬) অথবা 'লর্ড অব দ্য রিং: পাওয়ার, মানি অ্যান্ড ড্রাগস ইন মডার্ন অলিম্পিক' (১৯৯২) যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছে। জেনিংসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই স্টোরিও সংক্ষিপ্ত অথচ ভীষণ ধারালো স্টোরির দৃষ্টান্ত। স্টোরির মূল বিষয় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলে দেশে ফিরেও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর খেলোয়াড়েরা তাদের লভ্যাংশের অর্থ বুঝে পাননি। আপিল করার পর ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে আদালতের রায় তাদের পক্ষে যায়। এখন তারা আদালতের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় আছেন। এই স্টোরির রচনাশৈলী চমৎকার। অনেক তথ্যও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখায় তিনি ক্রোধ এবং বিদ্রূপাত্মক একটি ভঙ্গিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি ক্রীড়া-বাণিজ্যের শিকার মানুষদের প্রতি তার সহানুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে। স্টোরির গঠন কৌশলের জন্য যদি আপনি জেনিংসের স্টোরিকে অনুসরণ করেন, তাহলে আপনার স্টোরি লেখার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

গ্লাসগো হেরাল্ড
২০ নভেম্বর, ২০০৮

২০০৬ সালের বিশ্বকাপ থেকে লাখ লাখ ডলার আয় হয়েছে। কিন্তু ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর জাতীয় দলের ফুটবলাররা তাদের লভ্যাংশের ন্যায্য পাওনার একটি পয়সাও বুঝে পাননি। তারা বলছেন, তাদের সঙ্গে এই প্রতারণা করেছেন ফিফার ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যাক ওয়ার্নার।

একটি সালিস শুনানিতে ওয়ার্নার হেরে যাওয়ার পরেও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের এই ছোট্ট দেশের খেলোয়াড়েরা স্পন্সর এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া লাভ থেকে ২৮ মাস পরেও তাদের পাওনা অংশ বুঝে পাননি।

ত্রিনিদাদ বিশ্বকাপের জন্য মনোনীত হওয়ার পর থেকেই ওয়ার্নার এবং তার পরিবার ফুটবল-বাণিজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজস্ব ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে পিতার প্রভাব খাটিয়ে ওয়ার্নারের ছেলে ডেরিয়ান ৫ হাজার টিকিট হাতে নিয়ে ৩ মিলিয়ন ডলার বাণিজ্য করে ফেলে। তার আরেক পুত্র ডেরিয়েল জার্মানিতে 'লোকাল অর্গানাইজিং কোম্পানি জার্মানি ২০০৬' নামে কোম্পানি খুলে তাদের সঙ্গে বিশ্বকাপে স্পন্সর হতে আগ্রহী বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে ফি হিসেবে প্রচুর অর্থ তুলে নেয়।

ওয়ার্নার রাতারাতি ত্রিনিদাদ ফুটবল ফেডারেশনের "বিশেষ উপদেষ্টা" বনে যান এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে সরাসরি তাদের লভ্যাংশ নিয়ে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে ত্রিনিদাদের রাজধানীর সবচেয়ে দামি হোটেলে ওয়ার্নার খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই হোটেলে খেলোয়াড়েরা স্পন্সরদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ, টেলিভিশন চ্যানেল কত দেবে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ার্নার তাদের প্রতিটি পাই পয়সা বুঝিয়ে হিসাব দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু সেই হিসাব খেলোয়াড়দের হাতে আর পৌঁছায়নি। এমনকি প্রথম সুইডেনের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে গোলরক্ষক সাকা হিসলোপ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে ওয়ার্নার যথারীতি এড়িয়ে যান।

সেই ম্যাচে ত্রিনিদাদ ড্র করলে তাদের স্পন্সরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। খেলোয়াড়েরা কিন্তু তাতে লাভবান হননি। কারণ, তারা আজও জানেন না সেই অর্থের পরিমাণ। একজন খেলোয়াড় জানান, তার সতীর্থদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝারি মানের বিদেশি লিগে খেলে থাকেন। তারা কেউই খুব বেশি অর্থ আয় করেন না। তাদের সবারই লক্ষ্য ছিল, বিশ্বকাপের মাধ্যমে অবসর ভাতা বন্দোবস্ত করা এবং খানিকটা সম্মান নিয়ে বাঁচা। ওয়ার্নার যখন দেখেন, খেলোয়াড়দের শান্ত না করতে পারলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে নামানো যাবে না, তখন তিনি তাদের লাভের ৫০ শতাংশ দেওয়ার ঘোষণা দেন। সেই ম্যাচে ত্রিনিদাদ ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়।

আরও কয়েক মাস পর খেলোয়াড়দের কাছে সেই হিসাবের নথিপত্র এসে পৌঁছায়। সেখানে বিস্ময়করভাবে অনেক কাগজপত্র ছিল অনুপস্থিত। অর্থের হিসাব দিতে গিয়ে বলা হয়, স্পন্সররা প্রথমে যে পরিমাণ অর্থ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা বাস্তবে দেয়নি। আরও বিস্ময়করভাবে খেলোয়াড়দের পাওনার এক-তৃতীয়াংশ ২০১০ সালের বিশ্বকাপের তহবিল গঠনের জন্য রাখা হয়েছে। তবে শেষ সংবাদ হচ্ছে, ওয়ার্নার খেলোয়াড়দের দিয়ে মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করলেও তাদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হয় ৪৯৪ ইউরো।

আদালতে মামলা হওয়ার পর ওয়ার্নারের ধামাধরা ত্রিনিদাদের ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিচার্ড গর্ডন খেলোয়াড়দের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "তাদের আচরণ অপরাধমূলক। তাদের উদ্দেশ্যও সম্মানজনক নয়।" ওয়ার্নার এই মন্তব্যের সঙ্গে নিজের কথা জুড়ে দিয়ে বলেন, "খেলোয়াড়েরা লোভী।"

ছয় মাস পর ওয়ার্নার তার কর্মকর্তাদের খেলোয়াড়দের ব্ল্যাকমেল করার মানসিকতাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তাদের দাবি যৌক্তিক নয়। তারা যদি আদালতে মামলা প্রত্যাহার না করে, তাহলে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাদের দূরে থাকতে হবে।"

খেলোয়াড়দের চুক্তিপত্র তৈরি করে দেওয়া আইনজীবী টয়েনবি বিষয়টি নিয়ে ফিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফিফা উত্তরে জানায়, এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ বিষয়ে জ্যাক ওয়ার্নের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ত্রিনিদাদের খেলোয়াড়দের মামলা ত্রিনিদাদের আদালত থেকে শুনানির জন্য লন্ডন পর্যন্ত গড়ায়। চলতি বছরের এপ্রিলে রায় ঘোষণার কথা থাকলেও ৯ মে দুই পক্ষই গোপন রায়ের কপি হাতে পায়। রায়ে খেলোয়াড়দের দাবিই জয়যুক্ত হয়। রায় ঘোষণার দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিনিদাদ গার্ডিয়ান পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়ে যায়। পত্রিকাটির সম্পাদক ওয়ার্নারের অর্থে তারই জীবনী লিখছিলেন। ফলে এখানেই আইনগত সুবিধা পেয়ে যান ওয়ার্নার। তিনি প্রকাশিত হওয়া মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আস্থাহীনতার অভিযোগ তুলে তা অবৈধ ঘোষণার দাবি জানান। এখানে জল আরও ঘোলা হয়। ওয়ার্নার খেলোয়াড়দের কিছু অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। পরের বছরের জানুয়ারি মাসে শুনানির রায়ও বাতিল হয়ে যায়। খেলোয়াড়েরা তাদের পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হন।

ত্রিনিদাদ দলের স্পন্সর কোম্পানি অ্যাডিডাস, কেএফসি, ইবে, কারিব বিয়ার এবং ব্রিটিশ গ্যাস বিষয়টি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। অথচ তারা এই খেলোয়াড়দের ঝরানো ঘাম থেকেই উপার্জন করেছে।

৯

নবম অধ্যায়

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

১.

গোয়েন্দাবৃত্তির কারখানা: আমেরিকা কীভাবে শত্রুদের উধাও করে দেয়

পেত্রা বার্তোশেভিজ

ভূমিকা

একটি অনুসন্ধানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে, যা কখনোই জানা যাবে না, তা নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি। বিষয়টির সঙ্গে নৈতিকতার একটি দিক জড়িয়ে আছে। আমরা কি আমাদের অজ্ঞতাকে আড়াল করে অন্য কিছু দিয়ে তা ভরাট করব? ভান করব, সেখানে তা নেই? বাস্তব প্রশ্নটি হচ্ছে, কেউ যদি কিছু না জানে এবং জানার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বিষয়টি নিয়ে সে কীভাবে লিখবে? পেত্রা বার্তোশেভিজের স্টোরিতে এই প্রশ্নই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যা নেই এবং যা জানা যাবে না, তার অনুসন্ধানের প্রাপ্তি সেগুলোকেই আরও পোক্ত করে তুলেছে। তিনি আমাদের এমন এক পৃথিবীর ছবি দেখিয়েছেন, কেউ জানে না সেখানে কী ঘটছে এবং এই অজ্ঞতার বিষয়টাও কেউ স্বীকার করছে না। পরিবর্তে অজ্ঞতার ওপর ভর করে একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আবার এই ব্যবস্থাই শত্রুমিত্র তৈরি করছে। আমি মার্ক শাপিরোকে ধন্যবাদ জানাই এই স্টোরি নির্বাচন করার জন্য। বার্তোশেভিচের অন্যান্য স্টোরির জন্য তার ওয়েবসাইটে সন্ধান করা যেতে পারে। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ওয়েবসাইট থাকা প্রয়োজন।

হারপার'স ম্যাগাজিন
নভেম্বর, ২০০৯

আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অভিযোগ হচ্ছে, তিনি একদল মার্কিন সেনাসদস্য এবং এফবিআই এজেন্টকে হত্যার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত। আফিয়া এখন ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে আটক আছেন। অভিযোগপত্রে তাকে এত জটিলভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে আমি অনুমান করেছিলাম, তিনি নির্দোষ। অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালের ১৭ জুলাই কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ সদস্য আফগানিস্তানের গজনি শহরের একটি জনবহুল এলাকায় সন্তানসহ ঘুরতে দেখে তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে 'জীবাণু উপকরণ ব্যবহার করে অস্ত্র' তৈরির নির্দেশিকা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে তখন কিছু বোতল ও শিশিতে রাখা অজানা রাসায়নিক বস্তুও পাওয়া যায়। আফিয়া এমআইটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন স্নায়ুবিজ্ঞানী। ১১ বছর আমেরিকায় থাকার পর তিনি চলে যান নিজের দেশ পাকিস্তানে। তারপর ২০০৩ সালে সেখান থেকেও তিনি উধাও হয়ে যান। তার তিন সন্তানের মধ্যে দুজন মার্কিন নাগরিক। তিনি পাকিস্তান থেকে কেন পাঁচ বছরের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিলেন এবং কেনই-বা তিনি গজনিতে ঘোরাঘুরি করছিলেন– অভিযোগে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তিনি আল-কায়েদার উচ্চপর্যায়ের সক্রিয় কর্মীর স্ত্রী। ওই ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেনের হীরা সরবরাহকারী এবং আমেরিকায় সন্ত্রাসী প্রবেশের পথপ্রদর্শক।

কিন্তু তার সম্পর্কে গুজব রয়েছে যে উধাও হয়ে থাকার পাঁচ বছরে তিনি আসলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কোনো গোপন সেনা কারাগারে আটক ছিলেন। সেখানে তথ্যের জন্য তার জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে। তারপর এমনভাবে তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তার পুরো গল্পটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

অবশেষে ৫ আগস্ট আফিয়াকে ম্যানহাটনের একটি আদালতে হাজির করা হয়। তিনি কথা বলা বা নড়াচড়া করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। যে সেনাসদস্যকে হত্যাচেষ্টার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তারই একটি গুলি আফিয়ার পাকস্থলীতে লেগেছিল। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, সিআইএ এবং এফবিআই বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আফিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে দেখছে। বিষয়টি ছাড়া আফিয়াকে নিয়ে আছে প্রচুর গুজব এবং সেসব গুজবের বিরুদ্ধে ভিন্ন বক্তব্যও। এই ধোঁয়াশাময় পরিস্থিতিতে আমরা সত্যি সত্যি জানি না, অথবা হয়তো জানা সম্ভবও হবে না, আফিয়াকে আটক রেখে যুক্তরাষ্ট্র কতটা নিরাপদ হবে।

আফিয়া সিদ্দিকীর গ্রেপ্তার নিয়েও নানান প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগে কখনোই বলা হয়নি তিনি এফবিআইয়ের 'ওয়ান্টেড' তালিকায় আছেন বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বরং একটি জনবহুল জায়গায় সন্দেহজনকভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে দেখেই তাকে স্থানীয় পুলিশ আটক করে। দেশটির ভাষা না জেনে তিনি কেন ওই রকম একটি স্থানে ঘোরাঘুরি করবেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। কেন তিনি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে পুলিশের নজরে পড়ে যাবেন– এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর মেলেনি। পরে অনুসন্ধান করার জন্য আমি আফগানিস্তানের এক সাংবাদিকের সাহায্য নিই। সেই অনুসন্ধানে বিপরীতমুখী তথ্য বের হয়ে আসে। যে পুলিশ সদস্য আফিয়াকে আটক করেছিলেন, তার বয়ান অনুযায়ী ভদ্রমহিলার কাছে একটি বাক্স ছিল। কিন্তু ওই জায়গায় একজন দোকানদার ফারহাদ জানান, পুলিশ আফিয়ার কাছ থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করে। আরেক পথচারী হেকমতউল্লাহ জানিয়েছে, সেদিন সেই ভদ্রমহিলা কেউ কাছে গেলেই তাকে আক্রমণ করছিলেন। এই বিবরণগুলো আফিয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে ছিল না। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা একটি বিষয়ে একমত যে, অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছিল, একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী মসজিদের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ এসে আফিয়াকে সন্তানসহ আটক করে। আফিয়ার কাছে পাওয়া সন্দেহজনক বস্তুগুলোও নিকটবর্তী মার্কিন সেনাছাউনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগে বলা হয়, সেই দিন গজনি পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, একজন ওয়ারেন্ট অফিসার, দুজন এফবিআই এজেন্ট এবং সেনাবাহিনীর দুজন দোভাষী উপস্থিত হন। একটি ঘরে হলুদ রঙের পলিথিন দিয়ে আড়াল করা একটা জায়গায় আফিয়াকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পর্দার এ পাশে সেনা কর্মকর্তারা বসেন। ওই সময়ে ওয়ারেন্ট অফিসারের পায়ের কাছে রাখা বন্দুকটা আফিয়া টেনে নেন এবং সেটা নিয়ে বের হয়ে এসে গালাগাল করতে করতে দুটি গুলি ছোড়েন। গুলি কারও গায়ে লাগেনি। কিন্তু ওয়ারেন্ট অফিসার তার পিস্তল থেকে গুলি ছুড়লে গুলি আফিয়ার পেটে লাগে। তিনি মেঝেতে পড়ে যান।

গোলাগুলির বিষয়ে আফিয়া সিদ্দিকী এবং গজনির প্রশাসক ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেন। ওসমান ওসমানীর বক্তব্য হচ্ছে, মার্কিন সেনারা আফিয়াকে তাদের হেফাজতে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কাউন্টার টেররিজম বিভাগের অনুমতি ছাড়া তিনি আফিয়াকে সেনাদের হাতে তুলে দেননি। তিনিই ফয়সালা হিসেবে সেনাসদস্যদের ডেকেছিলেন আফিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তখন এ রকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু আরেকজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা জানান, মার্কিন সেনারা আফিয়াকে নিয়ে যেতেই এসেছিল। কিন্তু পুলিশ রাজি না হওয়ায় তারা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিতে চায়। সেই সময়ে দৃশ্যে আফিয়ার আগমন ঘটে। সেনাসদস্যরা মনে করেছিল, আফিয়া আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছে। তাই তারা গুলি করে।

আফিয়া সিদ্দিকীর বলা গল্পটা আরও সহজ। তিনি জানান, তিনি কখনো বন্দুক ব্যবহার করেননি এবং কাউকে গুলিও করেননি। সেদিন তিনি শুধু পর্দার ফাঁক থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, বাইরে কারা আছে। সৈন্যরা তাকে মুক্ত অবস্থায় দেখে ঘাবড়ে যায় এবং গুলি করে।

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে তার মামলা আদালতে ওঠে। সেখানে সন্ত্রাসের দায়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করে গুলির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সেখানে তার হারিয়ে যাওয়া বছরগুলো সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ব্যাখ্যা নেই তার দুই সন্তানের আজও নিখোঁজ থাকার বিষয়েও। শুধু জানা যায়, মার্কিন সরকারের কাছে ২০০৩ সালে তিনি ওয়ান্টেড ছিলেন। ২০০৮ সালে আবারও তাই হয়েছেন। কিন্তু কেন, তার কোনো উত্তর নেই।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের রাজনৈতিক ক্ষুধা 'অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্সের' পণ্যায়ন ঘটিয়েছে, যা আফিয়া সিদ্দিকী নামে মানব বন্দিদের পরিণত করেছে একটি পণ্যে। এই নতুন ধারণার কোনো শারীরিক অস্তিত্ব নেই, নেই কালিক অবয়ব। এ ধরনের গোয়েন্দা অন্তর্জালের চাহিদারও কোনো সীমা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসের প্লটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে কম। তাই এ ধরনের গোয়েন্দাবৃত্তির ধারণা ঘটনায় আটক বন্দিদের সংখ্যাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তাই আমেরিকা এখন বিশ্বায়নের সুবিধা ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দিদের ধরে নিয়ে আসে। এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তান তাদের বড় সহায়ক দেশ। দেশটির ভেতরকার রাজনৈতিক অবস্থা তাদের বন্দি সরবরাহে বাধ্য করে।

সিআইএ এবং এফবিআই এই বিষয়কে চাহিদাপত্র দেওয়ার মতো মনে করলেও অন্যদের কাছে তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিতর্ক। এই পথে লাতিন আমেরিকার কারাগারে হাজার কয়েক বন্দি সন্দেহভাজন অপরাধী, গণশত্রু উধাও হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অভাবের প্রতিফলন।

মাহের আরার, বিনইয়াম মোহাম্মদ অথবা সাউদ মেমনের নাম উল্লেখ করা যায়, যাদের বিভিন্ন সময়ে আটক করে সিআইএ। তাদের কারও স্থান হয় কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগার অথবা সিরিয়া, মরক্কোর অজ্ঞাত সেনানিয়ন্ত্রিত কারাগারে। তাদের সবার কপালে জোটে নির্মম নির্যাতন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের নামে অপহৃত এবং কারাবন্দি নারী-পুরুষের সঠিক সংখ্যা এখানে বলা সম্ভব নয়। ইরাক ও আফগানিস্তানের বাইরে পাকিস্তান এ ধরনের 'ভৌতিক আসামি' সরবরাহের তালিকায় এগিয়ে রয়েছে। সিটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে গুয়ানতানামো কারাগারে আটক বন্দিদের দুই-তৃতীয়াংশই পাকিস্তানে ধরা পড়েছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সংগঠনটি তাদের অনুসন্ধানে দেখেছে, ২০০১ সালের আগে থেকেই পাকিস্তানে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমেরিকার কাউন্টার টেররিজম অভিযান তুঙ্গে ওঠার সময়ে পাকিস্তানে নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বন্যার পানির মতো। আর ওই সময়ের মধ্যবর্তী তিন বছরে পাকিস্তানে মার্কিন সহায়তা ৪.৭ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.১ বিলিয়নে দাঁড়ায়। দুটি ঘটনার মাঝে সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন। তবে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কয়েক লাখ ডলারের বিনিময়ে পাকিস্তান ৩৬৯ জন সন্দেহভাজন আল-কায়েদা বন্দিকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে।

এভাবে কারাগার থেকে আসামি উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা সহজে প্রমাণ করতে না পারার বড় একটি কারণ হচ্ছে প্রমাণের অভাব। পাকিস্তানে এ ধরনের ঘটনায় যাদের আটক করে নিয়ে যায় বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের গাড়িও হয় লাইসেন্স প্লেটহীন। পাকিস্তানের হিউম্যান রাইটস কমিশনের মহাসচিব আবদুর রহমান জানান, কিছুদিন আগে এমনই এক ব্যক্তিকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলা হয়, এক ঘণ্টা পর ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্তু পরে তারা জানায়, গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তাকে ইসলামাবাদে নিয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি আর কখনোই বাড়ি ফিরে আসেননি। তার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে নিখোঁজ মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন, এভাবে আটক ব্যক্তিদের বড় অংশকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সোপর্দ করা হয়। তাদের শেষ ঠিকানা হয় গুয়ানতানামো কারাগার অথবা বাগরাম বিমানঘাঁটি। বাকিদের হয় পাঠিয়ে দেওয়া হয় উজবেকিস্তানে অথবা তারা পৃথিবী থেকেই উধাও হয়ে যায়। কখনো কেউ কেউ প্রশাসনিক জটিলতায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরে আসে অথবা মারা গেলে মৃতদেহ ফেরত পাঠানো হয়।

এ ধরনের আটক এবং নিরুদ্দেশ নাটকের সঙ্গে জড়িত পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)।

আফিয়া সিদ্দিকীর পরিবার করাচিতে সুপরিচিত। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া আফিয়া সিদ্দিকীর বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তার ভাই হিউস্টনে স্থাপত্যবিদ এবং বোন হার্ভার্ডে প্রশিক্ষণ নেওয়া স্নায়ুরোগ চিকিৎসক। তিনি নিজেও বিদেশে লেখাপড়া করেছেন। পাকিস্তানের গণমাধ্যম ধরেই নিয়েছে, ২০০৩ সালে তাকে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা অপহরণ করেছে। করাচিতে আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা কেউই বিশ্বাস করেন না যে, আফিয়া লুকিয়ে আছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, গোয়েন্দা সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে তার পক্ষে পাঁচ দিন লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আমি পাকিস্তানে যাওয়ার কিছুদিন আগে আফিয়ার সাবেক স্বামী আমজাদ খান পাকিস্তানের ডেইলি নিউজ পত্রিকার সাংবাদিকের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, আফিয়া উগ্রপন্থী। তার বোন ফৌজিয়া সংবাদ সম্মেলন ডেকে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, আমজাদ নিজেই একজন নারী নির্যাতনকারী। আমজাদ খান আমাকে জানান, আফিয়ার স্বভাব পরের দিকে উগ্র হয়ে উঠেছিল।

২০০২ সালে এফবিআইয়ের কয়েকজন এজেন্ট এই দম্পতির সঙ্গে দেখা করে। তারা আফিয়ার বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সৌদি দূতাবাসের একজন ৭০ হাজার ডলার কেন পাঠিয়েছে, তা জানতে চায়। তারা আফিয়ার কাছে বিশেষ ধরনের নাইটভিশন গ্লাস এবং বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং কিছু সামরিক পুস্তক কেনার কারণ জানতে চায়। আমজাদ খান তাদের জানান, অর্থ এসেছে হিউস্টনে তাদের ফ্ল্যাটের ভাড়া হিসেবে। আর জ্যাকেট ও ভিশন গ্লাস কেনা হয়েছে শিকারের জন্য। সামরিক পুস্তিকাগুলো আমজাদ খান তাদের ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। আমজাদ আমাকে জানান, তাদের বিবাহবিচ্ছেদের পাঁচ মাস পর আফিয়া নিখোঁজ হয়ে যায়। তিনি জানেন না, তার সন্তানেরা কোথায় আছে।

বিবাহবিচ্ছেদের দুই মাস পরে ২০০২ সালে আফিয়া আমেরিকার মেরিল্যান্ডে চলে যান এবং হাসপাতালে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেন। তিনি সেখানে মজিদ খান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যৌথভাবে একটি পোস্টবক্স ভাড়া নেন। মজিদ খানকে তিনি তার স্বামী হিসেবে উল্লেখ

করেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন গোয়েন্দারা পাকিস্তান থেকে খালেদ শেখ নামের এক ব্যক্তিকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ঘটনার মূল হোতা হিসেবে আটক করে। খালেদের কাছ থেকে পাওয়া তার সহযোগীদের নামের তালিকায় মজিদ খানের নাম ছিল। খালেদ জানান, তিনি আল-কায়েদার কাছে বড় অঙ্কের অর্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য মজিদকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আইএসআই ৫ মার্চ মজিদ খান ও তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে পাকিস্তানে আটক করে। তাকে তিন সপ্তাহ একটি গোপন জায়গায় আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর এফবিআই আফিয়া ও তার সাবেক স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি নোটিশ জারি করে। অবশ্য মজিদ খান তাদের কী বলেছিলেন, তা আর জানা যায়নি। ২৮ মার্চ এফবিআই ম্যানহাটনে উজায়ের পারাচা নামে ২৩ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি তরুণকে আটক করে। সে সদ্য পাকিস্তান থেকে নিউইয়র্কে এসেছিল তার বাবার ব্যবসায় সহায়তা করতে। উজায়ের জানায়, খালেদ শেখ ম্যানহাটনে তাদের অফিসটা বিস্ফোরক আনার জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল। উজায়ের জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, মজিদ খান তার পরিচিত এবং সেই পোস্টবক্সের একটি চাবি তার কাছে আছে। সেই মাসেই আফিয়া নিখোঁজ হয়ে যান। উজায়ের আটক হওয়ার তারিখে পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আফিয়াকে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। সেখানে এফবিআই এজেন্টরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পর আমেরিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবিসি টেলিভিশনকে জানান, আফিয়া পাকিস্তানে আছেন।

পাকিস্তানের গোয়েন্দারা ২৯ এপ্রিল আমার আল বালুচি নামে এক কম্পিউটার অপারেটরকে আটক করে। তাদের সন্দেহ ছিল, এই ব্যক্তি পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত। এফবিআই এবং সিআইএ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, আমর ৯/১১ ঘটনায় বিমান অপহরণকারীদের বড় অংশ অর্থ সরবরাহ করেছে। তারা আটক ব্যক্তির বৃত্তান্ত ঘেঁটে জানতে পারে, আটকের কিছুদিন আগে আমরের সঙ্গে আফিয়া সিদ্দিকীর বিয়ে হয়।

এই আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রচুর তথ্য উঠে আসে। কিন্তু সেসব তথ্য কতটা কার্যকর ছিল, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা মেলেনি। খালেদ শেখ পরে আমাকে বলেছেন, জেরার সময় তিনি গোয়েন্দাদের প্রচুর ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন। তারা যা শুনতে পছন্দ করবে, এমন তথ্যই তিনি তাদের দিয়েছেন। আবার উজায়েরও গোয়েন্দাদের পরস্পরবিরোধী তথ্য দেন। আমর বালুচি মার্কিন সেনাবাহিনীর বিচার ট্রাইব্যুনালে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও পরে একটি লিখিত বিবৃতিতে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন।

আফিয়া ও আমারের মধ্যে পোস্টবক্স বিষয়টি একেবারে সাধারণ একটি ঘটনা বলেও ধরে নেওয়া যায়। মজিদ খান সামরিক ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে বলেন, করাচিতে থাকতেই তার আমেরিকার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি বন্ধু আমার বালুচিকে বলেন, আফিয়া ও উজায়েরের মাধ্যমে কৌশলে একটি পোস্টবক্স ঠিকানা নিয়ে আমেরিকায় তার উপস্থিতি প্রমাণ করতে। খালেদ ও আমার উজায়েরের শুনানির সময় বলার চেষ্টা করেন, তাদের সঙ্গে আল-কায়েদার যোগাযোগ বিষয়ে উজায়ের কিছুই জানেন না।

এ ধরনের গোয়েন্দা তথ্য অব্যবহারযোগ্য। ২০০৬ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে অনুমানভিত্তিক কার্যক্রমবিষয়ক এক বিশ্লেষণে জেসিকা স্টার্ন এবং জোনাথন ওয়েইনার বলেন, অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা শুধু বিপদ এবং ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তারা বলেন, নীতিনির্ধারকদের উচিত কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের আগে ঝুঁকি পরিমাপের কৌশল ব্যবহার করা। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এফবিআইয়ের কাউন্টার টেররিজম বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেছেন, গত পাঁচ বছরে তাদের সংস্থার ২১ জন এজেন্ট সন্ত্রাসবাদ-সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫ হাজার ঘটনা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, মাত্র ৫ শতাংশ ঘটনা অনুসন্ধানের উপযুক্ত ছিল এবং তারা একটিও সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা বানচাল করতে পারেননি।

আমি করাচি, লাহোর ও ইসলামাবাদে আফিয়া সিদ্দিকীর পরিবারের সদস্য, আইনজীবী ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আফিয়া একজন উগ্রবাদী সন্ত্রাসী। আবার কেউ বলেছেন তিনি নির্দোষ। আবার কেউ বলেছেন, তিনি আমেরিকা ও পাকিস্তানের হয়ে তথ্য সরবরাহ করছেন। ইসলামাবাদে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার একজন অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাকে জানান, তাদের আমেরিকান বন্ধুরা আফিয়াকে তাদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। এ ধরনের ঘটনা কখনো কখনো আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থার জন্য অসম্মানজনক। তবু উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তেই কাজগুলো হয়ে থাকে। আফিয়াকে আটক করার দুই থেকে তিন দিন পরেই সিআইএর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু আফিয়ার মামা শামস উল হাসান ফারুকী আমাকে আরেকটি অদ্ভুত তথ্য দেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আফিয়া হঠাৎ করেই তার বাসায় আসেন। তখন তিনি জানতেন, আফিয়া সিআইএর হাতে আটক রয়েছে। আফিয়ার মুখ প্লাস্টিক সার্জারি করে পাল্টে ফেলা হয়েছে। তিনি কণ্ঠস্বর শুনে তাকে চিনতে পারেন। আফিয়া তাকে জানান, আমেরিকা ও পাকিস্তানের হয়ে তিনি আল-কায়েদার বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষক আলী হাসান আমাকে সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটি বলেন। তার মত হচ্ছে, আফিয়ার বিষয়ে সবাই মিথ্যা বলছে। তার পরিবার থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা– প্রত্যেকেই মিথ্যা বলছে। আর মিথ্যাই সত্যকে আরও বেশি চমকে দেওয়ার মতো করে তুলবে বলে তার ধারণা।

অন্তর্ধানের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলায় ২০০৭ সালে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইফতেখার চৌধুরী নিখোঁজ মানুষদের আদালতে সশরীরে হাজির করার আদেশ দেন। তিনি ১৮৬ জনের একটি তালিকা উল্লেখ করেন, যারা আপাত-নিখোঁজ হলেও তাদের পাকিস্তানের কিছু পরিচিত বন্দিশালায় রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু প্রধান বিচারপতির এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে খোদ প্রশাসনযন্ত্র। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে তাকে পদত্যাগ করার জন্য বলা হয়। তিনি নির্দেশ অমান্য করায় প্রেসিডেন্ট অসদাচরণের অভিযোগ তোলেন।

তার কার্যক্রম স্থগিত করেন। পরে আবার কাজে ফিরে এসে প্রধান বিচারপতি বিষয়টা নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং এই ঘটনার সূত্র ধরে পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকটে পারভেজ মোশাররফকেই পদত্যাগ করতে হয়।

গজনির ঘটনায় মারাত্মক জখম অবস্থায় আফিয়াকে বাগরাম বিমানঘাঁটির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তার শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য জটিল অপারেশন করা হয়। চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি দুই সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যান। তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাতের কারণে তার পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। বাগরাম থেকে আমেরিকা– কোথাও আফিয়ার পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। পাকিস্তানের কোনো আইনজীবীকেও তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি সেই সময়। অদ্ভুতভাবে আফিয়া তখনো এফবিআইয়ের এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। আফগানিস্তানে আটক থাকার সময় আফিয়া তাদের বলেছিলেন, তিনি বোকার মতো কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরের বিবৃতির সঙ্গে তখনকার কথার মিল ছিল না। বিবৃতিতে তিনি আমারকে বিয়ে করা, মজিদ খানকে সহায়তা করার কথা স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন, তার কাছে সোডিয়াম সায়ানাইডের মতো মারাত্মক রাসায়নিক বস্তু ছিল এবং পাঁচ বছর তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। আফিয়া বিবৃতিতে আত্ম-উন্নয়নের জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছেন, এ কথাও স্বীকার করে নেন। আফিয়ার মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য চারজন চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করেন। তাদের কেউ কেউ আফিয়ার মানসিক বিষাদে ভোগার বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেও আদালত তাকে শুনানির জন্য উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত দেয়।

আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী ঘটনার চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়নি। বরং তিনি কোথায় ছিলেন, কারা তাকে অপহরণ করেছিল অথবা তার প্রকৃত পরিচয় কী– এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে বিচারে। হয়তো আফিয়া আমেরিকা অথবা পাকিস্তানের হয়ে কাজ করেছেন অথবা সত্যি সত্যি তিনি হয়তো কাজ খুঁজছিলেন এবং অভিবাসন আইনে তার কিছু গলদ ছিল। একজন এফবিআই কর্মকর্তা ইউএস নিউজ এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের কাছে বলেছেন, "আফিয়া সম্ভবত নির্দোষ। তিনি হয়তো ঘটনার শিকার।" আমরাও মনে করি, হয়তো আফিয়া প্রকৃতপক্ষে কোনো অপরাধেই দোষী ছিলেন না।

পরিশিষ্ট

পেত্রা বার্তোশেভিজ

আফিয়া সিদ্দিকীর বিষয়টি আগাগোড়া রহস্যে মোড়া। আফিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' একজন নারী। তিনি পাঁচ বছর নিখোঁজ হয়ে থাকার পর নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে ফিরে আসেন। আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যদের প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগে তাকে ২০০৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়। তখন থেকে আমি তার মামলাটি অনুসরণ করতে শুরু করি। কথিত আছে, নিখোঁজ থাকার সময়ে পাকিস্তান ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর একটি গোলাগুলির ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার তার আত্মপ্রকাশ। অথচ তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলা হয়নি। আমার মনে হয়েছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে কাজ করার জন্য তার মামলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক গোপন পৃথিবীর জানালা দিয়ে আমি ভেতরে উঁকি দিতে পারব। আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদের মামলাগুলো খুব গোপনীয়তার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে মামলার নথিপত্রগুলো বিচারকেরা বাক্সবন্দি করে রাখেন। এ ধরনের তথ্য জানার জন্য আমেরিকায় 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট' (এফওআইএ) আছে। ১৯৬৬ সাল থেকে কার্যকর আইনটি সাংবাদিক এবং যেকোনো সাধারণ নাগরিকের তথ্য জানার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার। কখনো এ ধরনের নথিপত্র সরবরাহ করতে সংস্থাগুলো অস্বীকৃতি জানালে সাংবাদিকেরা আদালতের আশ্রয় নেন। তবে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের জন্য এ রকম অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপ আছে, যারা আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। আফিয়ার মামলার বিষয়ে আমি অনুমান করেছিলাম, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমি এফওআইএর মাধ্যমে দাবি জানিয়ে পাব না। তবে এই গোপনীয়তার বাতাবরণের মাঝে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলো আমাকে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে আমি বেশ কিছু বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্টিভ কোলের 'গোস্ট ওয়ার', লরেন্স রাইটের 'লুমিং টাওয়ার' এবং জেন মায়ারের 'দ্য ডার্ক সাইড'।

তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট আমাকে প্রচুর সহায়তা দিলেও গ্রন্থাগারিকেরা আমার কাছে পৃথিবীর সেরা তথ্যসূত্র। তারা জানেন, কোথায় কোন তথ্য পাওয়া যাবে। আমার এই স্টোরিতে সাক্ষাৎকার পর্বটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আমি সবার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছি। সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর পুরোটা লিখে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমি সবাইকে প্রশ্ন করতাম– আর কার সঙ্গে কথা বলা যায়?

যেকোনো স্টোরি লেখার আগে তার পরিণতি সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফিয়ার স্টোরির সঙ্গে প্রথাগত অনুসন্ধানী স্টোরির কাঠামোর মিল নেই। এই স্টোরির প্রথম থেকেই যে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজছিলাম, তা হচ্ছে আফিয়ার পরিণতি আসলে কী? আমার সৌভাগ্য, একজন দক্ষ সম্পাদককে আমি পেয়েছিলাম, যিনি এই রহস্যাবৃত স্টোরির গতিকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির অস্পষ্টতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

২.
একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি

আফগানিস্তানে আসলে কী ঘটছে? উদাহরণ হিসেবে কান্দাহার শহরকে বেছে নিলে
দেখা যাবে, সেখানেও আছে অপরাধ, দুর্নীতি এবং জাতিগত সংঘাত।
সাধারণ মানুষ সশস্ত্র শক্তি প্রতিরোধে অক্ষম।
সেখানে শুভ পরিণতি বলে কিছু নেই।

স্টিফেন গ্রে

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মাইকেল হের যুদ্ধকালীন সংবাদদাতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বোঝার জন্য তার বইগুলোর কোনো জুড়ি নেই। স্টিফেন গ্রের লেখা আমাকে মাইকেল হের কথা মনে করিয়ে দেয়। যুদ্ধের আবহ এবং যুদ্ধের ভেতরে বেঁচে থাকার ছবি তার স্টোরিতে গভীরভাবে প্রকাশিত। তার লেখার কৌশলে বাস্তবতাকে ধারণ করে একটি স্টোরি। যুদ্ধের খবর যুদ্ধকে থামাতে পারে না জেনেও গ্রে তা লেখা থেকে বিরত হননি।

প্রথম প্রকাশ লো মঁদ ডিপ্লোমেটিক (ফ্রান্স)
৪ জুলাই, ২০১০

আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরটা ঘুরে দেখার সময় চোখে পড়েছে অস্ত্র হাতে মার্কিন সৈন্য, বিশাল সাঁজোয়া ট্রাক, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বোমার জন্য পুলিশের তল্লাশি, বিভিন্ন জায়গায় এসইউভি পিকআপে ঘুরে বেড়ানো অস্ত্রধারী ব্যক্তি আর মানুষের ভিড়। আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম, তার অর্ধেকটা ছিল ভাঙা। আত্মঘাতী বোমার আক্রমণে হোটেলটি বিধ্বস্ত হয়। আমেরিকার সেনাবাহিনীর কান্দাহার অভিযানের ঘোষণায় হোটেল মালিক তখন ভেবেছিলেন, তার ভাঙা হোটেলে বিপুল সাংবাদিক এসে উঠবেন। কিন্তু পরে মার্কিন বাহিনীর অভিযান "রাজনৈতিক সেনা' অভিযানে রূপান্তরিত হলে তিনি হতাশ হন। মার্কিন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফসের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মুলান নিজেও কান্দাহারকে ইরাকের বাগদাদের মতো জটিল বলে আখ্যা দেন।

আমেরিকান সেনাবাহিনীর অনেকে তালেবানদের সমর্থন করেন। একজন সিনিয়র ন্যাটো কমান্ডার আমাকে বলেছেন, তিনি যদি বয়সে তরুণ হতেন, তাহলে তালেবানদের পক্ষে লড়াই করতেন। কাবুলের অজনপ্রিয় সরকারকে পশতুন জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত শহরের কেউই পছন্দ করে না। তারা বিদেশি-সমর্থিত সরকারের সঙ্গে কাজ করার চেয়ে যোদ্ধার মৃত্যুকে সম্মানজনক মনে করে। যারা সরকারে কাজ করে, সাধারণ মানুষ তাদের ঘৃণা করে।

কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে

কান্দাহারে বিপুল খুন ও অপহরণের ঘটনা ঘটছিল তখন। বোমা বিস্ফোরণের শব্দে শহর কেঁপে উঠছিল। আমার খুব জানার আগ্রহ ছিল কোন পক্ষ কাদের সঙ্গে লড়াই করছে? যেকোনো সাংবাদিক সোজাসাপ্টা তার রিপোর্টে লিখতে পারেন, এসব ঘটনার জন্য তালেবানরা দায়ী। কিন্তু স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পারি, সেখানে ভিন্ন আরেকটি পক্ষ আছে, আছে অপরাধী চক্র আর বিভিন্ন যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী। ন্যাটো জোটভুক্ত সেনাদের জন্য সেখানে যুদ্ধ করাটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। কারণ, জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের হত্যা করার চেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। এই নির্দেশ দেওয়ার জন্য জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল সেনাবাহিনীতে অজনপ্রিয় হয়ে পড়েন। আমি এক অভিযানের সময় সাঁজোয়া যানে বসে একজন সার্জেন্টকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, “আমার লোকেরা বিপদে পড়লে আমি তাদেরকেই বাঁচানোর চেষ্টা করব। জেনারেল বুঝতে পারছেন না এখানে আমরা দুর্বলতা পছন্দ করি না। এভাবে আমরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারব না।”

এখানে কোনো সরকার নেই

সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের মেঠো বক্তৃতা শুনলে মনে হবে, এখানে মার্কিন বাহিনী ও তালেবানরা এক পক্ষে থেকে লড়াই করছে। শত্রু হলেও দুর্নীতি দমনে তাদের সহায়তা করতে হবে– এটাই নীতি হিসেবে তখন প্রচারিত হচ্ছিল। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, হাজার হাজার সৈন্য সেখানে প্রতিপক্ষ তালেবানদের পরাস্ত করতে আগ্রহী ছিল। কারণ, তারা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নৃতাত্ত্বিক অথবা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নয়। কিন্তু তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছিল আফগান সরকারের অনুমতি নিয়ে, যাদের তারা দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করে।

মানবাধিকারকর্মী শাহিদা হুসেইন বলেন, “সরকার এবং ন্যাটো এখানে খারাপ মানুষদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। তালেবানদের দোষ দেওয়াটা সহজ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কেউ কাউকে খুন করার পর সরকার বলছে, তাকে কিছু না করার জন্য। কারণ, সে আমাদের বন্ধু, আমাদের আত্মীয়। আসলে কান্দাহারে কোনো সরকার নেই। বাস্তবে এই অঞ্চলটা চালাচ্ছে মাদকদ্রব্য চোরাচালানিরা। তাদের সহায়তা করছে বিদেশি শক্তিগুলো।”

কান্দাহারে মিলিশিয়াদের প্রভাব বেশি। কোথাও কোথাও মার্কিন সেনাছাউনি অস্ত্র হাতে এই বেসামরিক বাহিনীকেই পাহারা দিতে দেখা গেছে। এই সশস্ত্র মিলিশিয়াদের নেতৃত্ব দেয় হামিদ কারজাইয়ের ভাই আহমেদ ওয়ালি কারজাইয়ের ডান হাত আকতার মোহাম্মদ। আহমেদ ওয়ালি কারজাইয়ের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলে হেরোইনের ব্যবসা পরিচালনা, সরকারি জমি দখল, মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ আছে। গ্রামাঞ্চলে মার্কিন সেনারা যে সংগঠনটিকে ‘লোকাল ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ বা স্থানীয় নিরাপত্তা উদ্যোগ বলে আখ্যা দেয়, সাধারণ মানুষের কাছে এরাই মিলিশিয়া। অভিযোগ আছে, এই বাহিনী জোর করে মানুষজনের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে।

সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ

এই বাহিনীর আকার কমিয়ে আনার বদলে আমেরিকান বাহিনীই আবার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এই আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তালেবানদের খুব একটা তফাত নেই। শুধু এদের লম্বা দাড়ি নেই। তালেবানদের সঙ্গে এদের আলাদা করার জন্য একধরনের হলুদ ফ্লোরোসেন্ট আলোযুক্ত কোমরবন্ধনী দেওয়া হয়েছে। তাদের পোশাক ও অস্ত্রে এক টুকরো লাল কাপড় বাঁধা থাকে। এই বাহিনীর একজন কমান্ডার বলেন, “গ্রামের নিরাপত্তার প্রয়োজন ছাড়া আমরা মার্কিনদের সঙ্গে কাজ করি না। তারা আমাদের বেতনও দেয় না। আমাদের বিষয়ে সাধারণ জনগণের কোনো অভিযোগ নেই। আপনি চাইলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।”

এই বাহিনী আসলে কারা তৈরি করেছে এবং কারা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, তা নিয়ে কান্দাহারে অনেক পরস্পরবিরোধী মত রয়েছে। কারও কারও অনুমান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া অথবা ইন্দোচীনের কিছু দেশে মার্কিন বিশেষ বাহিনী একসময় এ ধরনের আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিল শত্রু দমনের জন্য। আবার কেউ কেউ বলছেন, এদের সঙ্গে কারজাই সরকারের যোগাযোগ রয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ তাহলে কার হাতে

তালেবানদের হাতে যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? এমন প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায় কান্দাহারের বিভিন্ন জায়গায়। মিলিশিয়াদের বিষয়ে অনেক বেশি অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক জাওয়াদ আহমেদ জোজো নামের এক সাংবাদিক প্রাণ হারান। তাকে আমাদের হোটেলের সামনে খুন করা হয়। পুলিশের সঙ্গে মিলিশিয়া এবং মাদকদ্রব্যের সংযোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে খুন হন বিবিসির প্রদায়ক আবদুল সামাদ রোহানী। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাইনি। ২০০৯ সালের জুন মাসে কান্দাহারের পুলিশপ্রধান মতিউল্লাহ কাতেহ খুনের ঘটনার সঙ্গে মিলিশিয়ারা জড়িত কি না, তারও কোনো প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রমতে প্রকাশ্যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল এবং মিলিশিয়াদের সেদিন অস্ত্র, যানবাহন ও পোশাক সরবরাহ করেছিল আমেরিকার বিশেষ বাহিনী। মিলিশিয়ারা আদালতে তাদের এক সহকর্মীর মুক্তির জন্য বিচারকের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যায়। কাবুলে সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার গোলাম রঞ্জবার এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একজন মার্কিন কমান্ডারকে সংশ্লিষ্ট থাকার আভিযোগে আটক করারও নির্দেশ দেন। তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব মিলিশিয়া সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই মার্কিন কমান্ডার সেদিন আটক মিলিশিয়া সদস্যকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মার্কিন বাহিনীর পক্ষ থেকে অবশ্য এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ২৩ বছর বয়সী জানান আবদুল্লাহ নামের এক তরুণ মিলিশিয়া বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। তার স্ত্রী সেই হামলায় চলনশক্তিহীন হয়ে পড়েন। নিহতের পরিবার জানান, মার্কিন সৈন্যরা অভিযান চালালেও গুলি করে মিলিশিয়ারা। তারা মিলিশিয়াদের নিষ্ঠুরতা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহর পরিবারের আরেক সদস্য জানান, তাদেরকে কেন হামলার শিকার হতে হয়েছিল, তারা জানেন না। তারা শুনেছেন, মার্কিন পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গোটা ঘটনাটা ছিল ভুল-বোঝাবুঝি। তবে এ বিষয়ে মার্কিন বাহিনীর কাছে কোনো নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সব জায়গাতেই একজন করে রাজা আছে

শাহিদ হুসাইন নামের এক ব্যক্তি আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেন, সব জায়গাতেই এখন একজন করে রাজা আছে। আর কান্দাহারের রাজা হচ্ছে আহমেদ ওয়ালি কারজাই। তার ভাই দেশের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ওয়ালি কারজাই তার ক্ষমতায় রাজা হননি। তাকে সমর্থন দিচ্ছে আমেরিকান বাহিনী। স্থানীয় মানুষ মনে করেন, কান্দাহারে দুটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ের ক্ষমতার লড়াই ওয়ালি কারজাইকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। পোপালাজাই গোত্র কারজাই পরিবারের অনুসারী আর বারাকাজি গোত্রের নেতা কান্দাহারের সাবেক প্রশাসক গুলাব আগা শেহেরজাই। এই দুটি গোত্রই এখন কান্দাহারে মার্কিন ও যৌথ বাহিনীর হাত ধরে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে সেনাছাউনি প্রহরা এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজও করছে। পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, "এখানে এখন গোত্রের সংঘাত চলছে। মানুষ তালেবানদের সমর্থন দেওয়ার কারণ তারা দেখছে, এই দুটি গোত্র সব দখল করেছে।"

আকতার মোহাম্মদ ওয়ালি কারজাইয়ের ঘনিষ্ঠ। পুলিশপ্রধানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা থাকার পরেও তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়নি কখনোই। মিলিশিয়া বাহিনীর জন্য বন্দুকধারী সংগ্রহের কাজটাও তিনিই করে থাকেন। আকতার মোহাম্মদ ওয়ালি কারজাইয়ের ঘনিষ্ঠ মানুষ– এই তথ্য কান্দাহারে সবাই জানে। কান্দাহারে মার্কিন বাহিনী তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মার্কিন ঠিকাদার এবং বিশেষ বাহিনীর কমান্ডাররা তার বাড়িতে নিয়মিত আপ্যায়িত হন।

ক্ষমতার শূন্যতা

পুলিশপ্রধানের হত্যাকাণ্ডের পর ৪১ জন মিলিশিয়া সদস্যকে আটক করা হয়। তাদের অনেকেরই মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কিন্তু তাদের মুক্তির জন্য ওয়ালি কারজাই তখন সাধারণ ক্ষমার জন্য প্রচারণা চালান। টেলিফোনে তিনি আমার কাছে প্রচারণার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, মিলিশিয়াদের বিষয়ে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কান্দাহার শহরে আইনের শাসন রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

কান্দাহারে ওয়ালি কারজাই বা মিলিশিয়াদের সরিয়ে দেওয়ার ভাবনাটা এক অর্থে অসার। কারণ, তাদের পর ক্ষমতা নেবে কে– এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একদা আমেরিকানরা তার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছে। এখন তারাই আবার এদের সরিয়ে দেওয়ার পথ খুঁজছে। আসলে ওয়ালি কারজাই কোনো সমস্যার নাম নয়। মূল সংকট হচ্ছে, দীর্ঘ সময়ের সংশ্লিষ্টতার কারণে পশ্চিমা শক্তিগুলো এখন এসে এই দুর্নীতিপরায়ণ এবং যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীগুলোর ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কার্যকর পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না।

পরিশিষ্ট

স্টিফেন গ্রে

আফগানিস্তানের যুদ্ধের ওপর আমি খবর লিখছি ২০০৭ সাল থেকে। ফলে সেখানকার বিভিন্ন ঘটনা এবং ঘটনার পেছনের নায়কদের বিষয়ে আমার জানাশোনা আছে। এই অনুসন্ধানের কাজটা আমি শুরু করি আফগানিস্তানে মার্কিন বিশেষ বাহিনী বা স্পেশাল ফোর্সের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে গিয়ে। কাজ করতে গিয়ে সেখানে বিশেষ মিলিশিয়া বাহিনী এবং মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সম্পর্কের বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দিক নিয়ে খুব বেশি স্টোরি প্রকাশিত না হলেও আমার মনে হয়েছে, আফগান যুদ্ধে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই বিশেষ বাহিনীর কার্যকলাপের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কান্দাহার। সেখানে আফগান প্রেসিডেন্টের ভাই এবং মার্কিন সামরিক কর্তাদের যোগাযোগের ভেতর দিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। ফলে স্টোরির আকৃতি বিস্তৃত প্রেক্ষাপট নিয়ে গড়ে উঠলেও লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট। স্টোরির কাজ করতে গিয়ে আমি নথিপত্রের খুব একটা সাহায্য পাইনি। মার্কিন বিশেষ বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে জানার চেষ্টাই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু সে ধরনের নথিপত্র জোগাড় করতে গিয়ে তেমন কিছুই হাতে পাইনি। যুক্তরাজ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহবিষয়ক আইন থাকার পরেও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। ফলে প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাক্ষাৎকারের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে।

এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমি টেলিভিশনের জন্য একটি তথ্যচিত্র এবং স্টোরি লেখার পরিকল্পনা করি। স্টোরিটি প্রথমে সানডে টাইমস ও পরে লো মঁদ ডিপ্লোমেটিকে প্রকাশিত হয়। আমি চ্যানেল ৪ চ্যানেলের কাছ থেকেও স্টোরির জন্য অর্থ বরাদ্দ পাই। ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য, বিভিন্ন উপাত্ত ঘেঁটে মূল সারাংশ কয়েক পৃষ্ঠায় লিখে রাখতাম। এতে করে পরে সম্পূর্ণ স্টোরি লেখার কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমার ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব ছিল সেখানকার মানুষের সঙ্গে। এই দুর্বলতা কাটাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাহায্য নিয়েছি। লন্ডনে বসবাসরত সাংবাদিক নজিবুল্লাহ রাজ্জাক এই কাজে আমার সঙ্গী ছিলেন। তাকে নিয়েই আমি আফগানিস্তানে ভ্রমণ করেছি।

কোনো একটি বিদেশি রাষ্ট্রে এ ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এই সংকট কাটানোর পথ হচ্ছে সেখানে স্থানীয়ভাবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা। এভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে যারা আপনার সঙ্গে কাজ করবেন, তাদের ছোট ছোট রিপোর্ট করার কাজ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় তারা কতটা সক্ষম।

কান্দাহার যেহেতু একটি বিপজ্জনক এলাকা, তাই সেখানে প্রবেশের আগে একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনাও করেছিলাম। নজিবুল্লাহ আমাকে সেই কাজে সহায়তা করেছেন। আমি এ ধরনের বিরূপ জায়গায় কাজের কলাকৌশল শেখার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায়ও যোগ দিয়েছিলাম।

আমি কান্দাহারে ন্যাটোর 'এমবেডেড জার্নালিস্ট' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় নিরাপদে ভ্রমণ করার সুবিধা পেয়েছি। ওই সময়ে আমার পক্ষে প্রবেশ করা কঠিন এমন সব জায়গা ভ্রমণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন সহকর্মী নজিবুল্লাহ।

স্টোরি লেখার সময় বিস্তর তথ্য এবং নোট আমার কাছে থাকলেও একটি সাদা পৃষ্ঠায় স্মৃতি থেকে লিখতে শুরু করি। প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য যাচাই করার জন্য তথ্যের সহায়তা নিই। লেখার এই কৌশল আপনাকে বিষয়ের কেন্দ্রে নিয়ে যাবে এবং আপনার অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে লিখতে সক্ষম হবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে লেখার সময় নিজে কীভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি, তার ওপরে গুরুত্ব দিই। একটি স্টোরি লেখার সময় সাংবাদিককে পাঠকও হতে হয়। কারণ, আপনি যা বলতে যাচ্ছেন, তা একজন পাঠকের কাছে অজানা।

আমার করা টিভি তথ্যচিত্র আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত হয়। প্রেসিডেন্ট কারজাই পর্যন্ত মিলিশিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন। আমার স্টোরির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি।

আমি স্টোরিটি প্রচারের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছি। পুরস্কারের জন্যও অনেক জায়গায় জমা দিয়েছি। স্টোরিটি একটি পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া তৈরি করা আমার মূল লক্ষ্য ছিল না। আমি আসলে সেখানে কী ঘটছিল, সেটাই জানতে চেয়েছি এবং সাংবাদিকতা পেশা আমাকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছে।

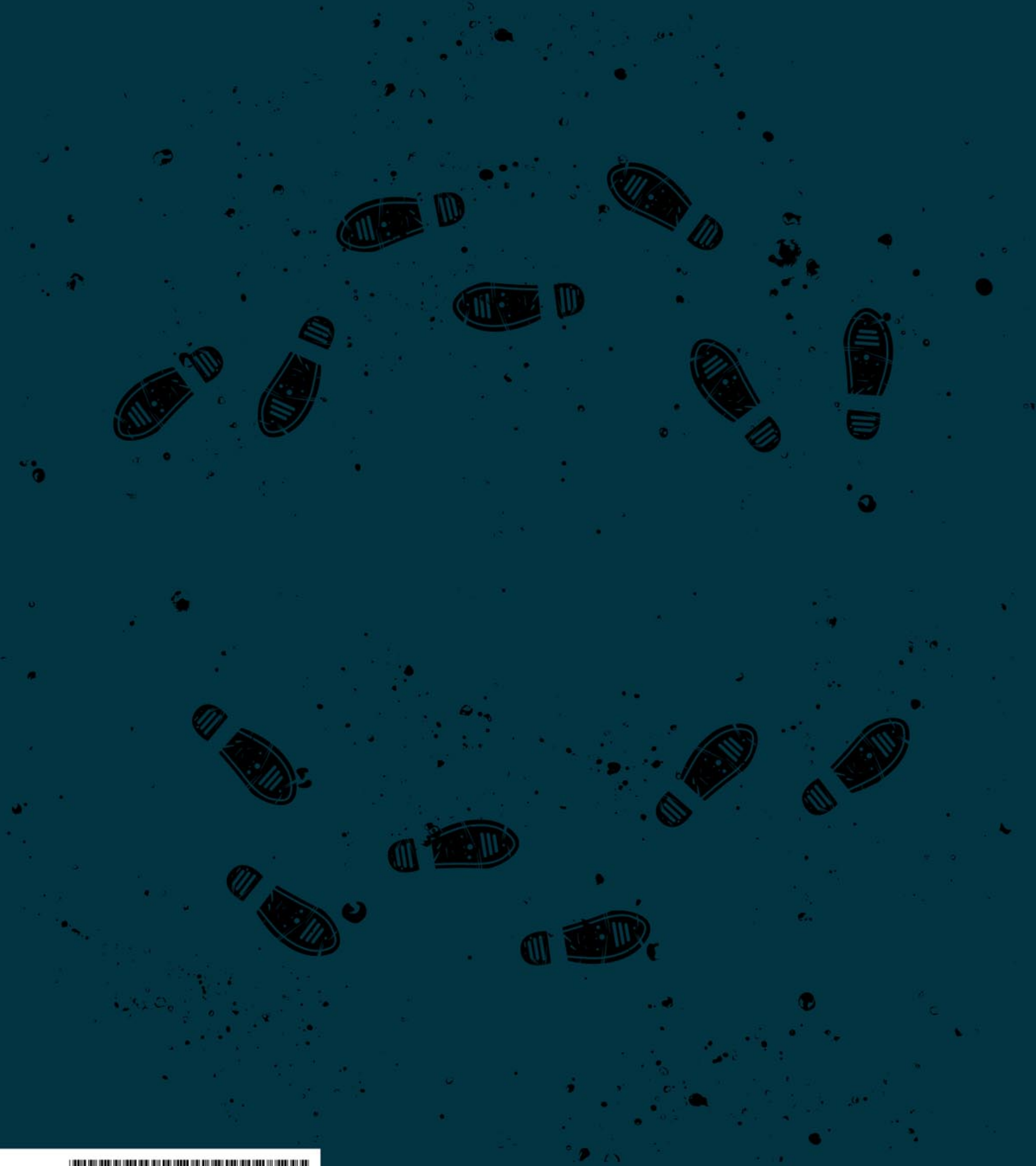

978-984-35-4823-8